RIZON

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

স্মাগলার

কাজী আনোয়ার হোসেন




Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৩৬৩

স্মাগলার

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

একচল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-7363-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-363
SMUGGLER
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-৭৭ *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা *গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু *আবার সোহানা *আরেক গডফাদার *অন্ধপ্রেম মিশন তেল আবিব *ক্রাইম বস *সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা *কালো নকশা কালনাগিনী *বেঈমান *দুর্গে অন্তরীণ *মরুকন্যা *রেড ড্রাগন *বিষচক্র শয়তানের দ্বীপ* মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস *মৃত্যুবাণ *কমান্ডো মিশন শেষ হাসি।

এক

মেয়েটির গায়ে কমলা আগুন। শুধু শাড়ি আর ব্লাউজেই আগুন লাগেনি; ঝুমকো, নেকলেস আর লকেটেও জ্বলজ্বল করছে লাল পাথর। এমনকী সাদা স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপগুলোও ম্যাচ করা, শিখার মত লাগছে। আর রূপ, বলা উচিত যৌবন, একবার তাকালে কার সাধ্য চোখ ফেরায়।

মায়ামি বিচ, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র।

সিআইএ হেডকোয়ার্টার ভার্জিনিয়ার ল্যাংলি থেকে আসছে মাসুদ রানা। মার্কিনিদের এই এসপিওনাজ প্রতিষ্ঠানটির দুষ্কর্ম আর কুখ্যাতির কোনও শেষ না থাকলেও, ওখানে যারা কাজ করে তারা সবাই খারাপ, এমন নয়। ভালদের মধ্যে একজন হলো টিম সেবাস্তিয়ান, রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রায়ই ওরা এসপিওনাজ জগতের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময় করে। সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে দেখা করে সে-ধরনের একটা কাজই সেরে এল ও।

ভার্জিনিয়া থেকে ফ্লোরিডা বেশি দূরে নয়, একটা স্টিমারে চড়ে চলে এসেছে রানা। টেলিফোনে আগেই কথা হয়েছে, পাঁচতারা হোটেল, লাইটহাউসে লরেলির সঙ্গে দেখা হবে ওর।

আমেরিকার প্রায় সবগুলো রাজ্যের বড় অঙ্কের করদাতাদের সঙ্গে গুরুতর কোনও সমস্যা নিয়ে কংগ্রেশনাল কমিটির জরুরি মিটিং বসবে লাইটহাউসের কনফারেন্স রুমে, সেই কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে মিটিঙে সভাপতিত্ব করবে রানার ঘনিষ্ঠ

বান্ধবী কংগ্রেস সদস্যা লরেলি।

রানা গত হপ্তায় কী একটা কাজে আবার আমেরিকায় এসেছে শুনে আনন্দ আর উত্তেজনা বোধ করলেও, সদাব্যস্ত লরেলি ভেবেই পাচ্ছিল না প্রিয় বন্ধুটিকে কীভাবে সময় দেবে। চলতি মাসে কাজের এত বেশি চাপ যে জন্মদিনটাও এবার পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। করদাতাদের সংখ্যা কয়েক শো, তারা অনেকগুলো গ্রুপে ভাগ হয়ে কথা বলবে, তাতে এক মাসের উপরে সময় লেগে যেতে পারে। অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে লাইটহাউসেই রানাকে আসতে বলেছে লরেলি। যেমন করে হোক কংগ্রেশনাল কমিটির ম্যারাথন মিটিঙের ফাঁকে সময় বের করবে ওর জন্য।

মিটিংটা এক হপ্তা আগে শুরু হয়েছে। ঠিক হয়েছে রানার সঙ্গে কাল দুপুরে কোথাও লাঞ্চ খাবে লরেলি।

হাতের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রায় দেড় দিন আগে মায়ামি বিচে পৌঁছে গেছে রানা। সময় কাটানো এখানে কোনও সমস্যা নয়। লাইটহাউসে জিম, সুইমিংপুল, টেনিস কোর্ট ইত্যাদি যা যা থাকার কথা তার সবই আছে, এমনকী ছোট একটা গলফ কোর্সও। আরও উত্তেজক কিছু চাইলে ডিসকোয় ঢুকে পড়া যায়। কিংবা বসে পড়া যায় তাস খেলার আসরে। হোটেলের ঠিক পিছনেই পাখিদের অভয়ারণ্য ফ্লেমিঙ্গো পার্ক, ওই পার্ক সংলগ্ন লনে বিরাট ছাতা ফেলা আছে, তার নীচে তিন তাস খেলা হয়। হোটেলটায় আগেও বেশ কয়েকবার থেকেছে রানা, খেললে কমবেশি কিছু না কিছু জেতেই।

এ-সব ছাড়া সমুদ্র স্নান, সার্ফিং, ওয়াটার স্কি ইত্যাদি তো আছেই।

তবে সময়ের আগে পৌঁছাতে পারার কারণে লরেলিকে একটা সারপ্রাইজ দেওয়ার কথাও ভাবছে রানা। আজ তার জন্মদিন। অনুষ্ঠান না-ই করুক সে, তাকে কিছু একটা প্রেজেন্ট করার ইচ্ছে আছে ওর।

সেই কিছু একটা কিনতেই দোনোভান'স শপিং মলে ঢুকছে রানা। ঢুকছে মানে ঢুকতে যাচ্ছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটাবে, এই সময় চোখ পড়েছে অগ্নিকন্যার উপর।

চোখ একা শুধু রানারই পড়েনি, মেয়েটিরও পড়েছে ওর উপর। যে-কোনও কারণেই হোক, বেশ বড় ধরনের একটা তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে তার ভিতরে, তা না হলে অচেনা একটি মেয়ে কী কারণে একাধারে মুগ্ধ ও ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে ওর দিকে?

কম করেও পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা হবে মেয়েটি। গায়ের রঙটা অবশ্য ফরসা নয়, উজ্জ্বল শ্যামলা। আগুন রঙা শাড়ি-ব্লাউজ পরেছে ঠিকই, তবে বাঙালী না-ও হতে পারে। চেহারায় খানিকটা পুরুষালি ভাব লক্ষ করল রানা। বয়স কত হবে, ছাব্বিশ-সাতাশ শরীরের উথলে ওঠা যৌবন শাড়ি-ব্লাউজ দিয়ে ঢাকা সম্ভব হয়নি।

নীল একটা টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার চালিয়ে এল মেয়েটি। গাড়ির গায়ে বড় বড় হরফে লেখা: 'ন্যাশনাল অডাবন সোসাইটি–১৮৮৬'। গাড়ি থেকে নেমে শাড়ির আঁচল সামলাচ্ছে।

গোটা আমেরিকা জুড়ে ন্যাশনাল অডোবন সোসাইটি একটা বিখ্যাত সংগঠন, জানে রানা। এর সদস্যদের অরনিথলজিস্ট বলা হয়, অর্থাৎ এরা সবাই বার্ড ওয়াচার – পাখি পর্যবেক্ষক। তবে শুধু চাক্ষুষ করাটাই ওদের কাজ নয়। পাখির শারীরিক বৃত্তান্ত, আচরণ বৈচিত্র্য, পরিবেশ সংকট, ক্রম-বিবর্তন ধারার ইতিহাস, শ্রেণী-বিভাগ, বিভিন্ন প্রজাতি চিহ্নিতকরণসহ আরও অনেক কিছুর রেকর্ড রাখতে হয় তাদেরকে।

মেয়েটির ওরকম বুভুক্ষু দৃষ্টি দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল রানা, তারপরে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল শপিং মলে, যাচ্ছে একটা অ্যান্টিকস-এর দোকানে।

প্রথম দোকানটায় এটা-সেটা দেখে মিনিট দশেক কাটাল,

পছন্দ না হওয়ায় লরেলির জন্য কিছু কেনা হলো না। বেরিয়ে এসে আরেকটা অ্যান্টিকস শপ খুঁজছে। তবে হঠাৎ একটা শখ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় এ-দোকান সে-দোকান থেকে নিজের জন্য বেশ কয়েকটা জিনিস কিনে ফেলল: বিনকিউলার, মিনি রেকর্ডার, টেলিফটো লেন্স লাগানো পোলারয়েড ক্যামেরা, এমনকী বার্ড ওয়াচিং-এর উপর লেখা একটা বইও।

এই বইটা কেনার সময়ই রানার চোখে ধরা পড়ে গেল মেয়েটি। নিরাপদ দূরত্ব থেকে ওকে অনুসরণ করছে সে।

কী ব্যাপার? কাকতালীয় কিছু, নাকি...

কীভাবে যেন বুঝে ফেলল সুন্দরী, ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে রানা। ফলে সরাসরি এগিয়ে এল ওর দিকে।

'হাই!' বলল রানা, লক্ষ করল ক্ষুধার্ত ভাবটা এখন আর ততটা স্পষ্ট নয়। তবে এ মেয়ে যে ওকে দেখে সম্মোহিত হয়ে পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিংবা কোনও ধরনের পাগল কি না তাই বা কে বলবে, সারাক্ষণই হয়তো এরকম ঘোরের মধ্যে থাকে।

ভারি সুন্দর ভঙ্গিতে, কপালের কাছে ডান হাত তুলে মৃদু, সুরেলা কণ্ঠে বলল, 'সালাম।' তারপরে চোস্ত উর্দুতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী? তুমি কি পাকিস্তানী?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি মাসুদ রানা বাংলাদেশী। তুমি?'

চেহারা একটু ম্লান হয়ে গেল মেয়েটির। 'আমি পাকিস্তানী, তবে আমার দাদা ছিলেন বাংলাদেশী আমার নাম সাদিয়া, সাদিয়া সিকান্দার।'

'বাহ্, সুন্দর নাম,' বলল রানা 'তা তুমি কিছু বলবে আমাকে?'

'হ্যাঁ... নাহ্,' দ্রুত শুধরে নিল সাদিয়া 'না

অভয় দিয়ে মৃদু হাসল রানা। 'আমার হাতে সময় আছে, সাদিয়া। আমরা কি কোথাও বসে কফি খেতে পারি?'

'না।' রাজি হলো না সাদিয়া। এমনিতেই আমার দেরি হয়ে

গেছে। পাখি দেখতে হলে আরও সকালে ঢুকতে হয় পার্কে। আমার পেরিস্কোপটা মেরামত করতে দিয়েছি, ওটা নিয়েই চলে যাব। তবে... শুকরিয়া।'

'পাখি দেখা আমারও শখ,' বলল রানা। 'মানে, তোমার গাড়িটা দেখার পরে থেকে আর কী! আমাকে একটা জিনিস কিনতে হবে, তুমি যদি দশ মিনিট সময় দাও, আমরা একসঙ্গে যেতে পারি।'

'না,' এবারও রাজি হলো না সাদিয়া। তারপরে হাসল সে। 'পাখি দেখতে হয় চুপচাপ, একা।' থেমে আরেকবার রানাকে খুঁটিয়ে দেখল। 'তারচেয়ে সন্ধ্যার পরে কোথাও দেখা হতে পারে আমাদের। আমি তাজমহলে উঠেছি।'

মায়ামি বিচে তাজমহলের চেয়ে সস্তা হোটেল আর নেই। 'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'যদি সময় করতে পারি। কত নম্বর কামরা?'

'তিন তলা, বিয়াল্লিশ নম্বর,' বলল সাদিয়া। 'তবে সরাসরি ওরা আপনাকে যেতে দেবে না। রিসেপশানে বললে আমাকে ডেকে দেবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা।

'সালাম,' বলে ওর পথ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াল সাদিয়া।

লরেলির জন্য একজোড়া ঝুমকো কিনল রানা, রুপালি-সাদা প্ল্যাটিনামের উপর বসানো সবুজ পান্না। ট্যাক্সি নিয়ে লাইটহাউসে ফিরে এল ও। রিসেপশনিস্ট মেয়েটির কাছ থেকে নিজের সুইটের চাবি চেয়ে নিয়ে হাতের ছোট্ট প্যাকেটটা তার হাতে ধরিয়ে দিল, বলল, এগারোতলার তিনশো বারো নম্বরে পৌঁছে দিতে হবে এটা।

ওটাতেই উঠেছে লরেলি।

নিজের সুইট থেকে সুইমিং ট্রাঙ্ক নিয়ে হোটেলের পুলে চলে এল রানা। শাওয়ারে গা ভিজিয়ে নিয়ে নামল রানা পুলে, এক ঘণ্টা সাঁতরানোর পরে উঠে এল। চেঞ্জিং বুদে ঢুকে কাপড় পরার আগে

শাওয়ারের নীচে দাঁড়াল পাঁচ মিনিট।

সুইটে ফিরে এক মুঠো কাজু বাদাম আর হুইস্কির অর্ডার দিল রানা। ইন্টারকমের সুইচ বন্ধ করে ভাবছে সময়টা কীভাবে কাটানো যায়। হাতঘড়ি দেখল, বারোটা বাজতে এখনও বিশ মিনিট বাকি। ফ্লাস্ক ভর্তি কফি, গোটা তিনেক চিকেন স্যান্ডউইচ, খানিকটা পনির আর কিছু চকলেট নিয়ে পিকনিক করলে কেমন হয়? কিন্তু একা? তাতে সমস্যা কী!

হুইস্কিটুকু গলায় ঢেলে বেরিয়ে পড়ল রানা।

রোদ ঝলমলে নির্জন দুপুর। ফ্লেমিঙ্গো পার্কে লোকজনের কোনও অভাব নেই, তবে তারা না কেউ নড়ছে, না কেউ কোনও শব্দ করছে। এমনকী, তারা যে আছে, কিংবা ঠিক কোথায় আছে, সেটাও অনেক ক্ষেত্রে বোঝা মুশকিল।

চওড়া গাছের মোটা শাখায় খয়েরি কাপড় পরা এক লোক শুয়ে আছে, রঙটা ডালের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় আলাদাভাবে চেনার উপায় নেই তাকে।

একটুর জন্য বিরাট এক গর্তে পা পড়ল না রানার। রীতিমত ছোট একটা খাদ তৈরি করা হয়েছে, তারপরে সেটার উপর গাছের ডালপালা আর পাতা ফেলে ছাদ দেওয়া হয়েছে, নীচে লুকিয়ে আছে বার্ড ওয়াচার, গর্ত থেকে বেরিয়ে আছে শুধু তার যান্ত্রিক চোখ: হয় বিনকিউলার, নয় তো পেরিস্কোপ।

সাবধান হয়ে যাওয়ায় এরকম বেশ কয়েকটা গর্তকে ফাঁকি দিতে পারল রানা। তারপরে এক জায়গায়, একটা ঝোপের আড়ালে, বসে পড়ল নিজেও। সঙ্গে বিনকিউলার আর ক্যামেরা আছে, আছে পাখির শিস রেকর্ড করার জন্য টেপ রেকর্ডার। বসার পরে খেয়াল করল ওর ডানপাশে একটা বড়সড় পুকুর রয়েছে, তাতে কয়েক শো সাদা ফ্লেমিঙ্গো দল বেঁধে সাঁতরাচ্ছে।

কাছাকাছি গাছের ডালে হামিংবার্ড দেখতে পাচ্ছে রানা। একটা

ইউরোপিয়ান নাইটিঙ্গেলকে চিনতে পারল। তোতাও আছে কয়েক জাতের। আর যেসব পাখি আছে, চেনে না ও; আগেও দেখেছে, তবে নাম জানে না।

ধ্যার, এটা ঠিক আমার কাজ নয়! –এরকম একটা ভাব নিয়ে ফ্লাস্ক থেকে কাপে কফি ঢালল রানা। বোকামি হয়ে গেছে, স্বীকার করল ও। একা কখনও পিকনিক হয় না। বিশেষ করে আরও হয় না সদ্য পরিচিতা সুন্দরী এবং নার্ভাস টাইপের সাদিয়ার ল্যান্ড-ক্রুজারটা পার্কের পার্কিং লটে দেখে আসার পর।

খবরদার, নিজেকে চোখ রাঙাল রানা। পার্কে ওর সঙ্গ পরিষ্কার ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছে মেয়েটি। কাজেই কোনও অবস্থাতেই তাকে বিরক্ত করা চলবে না ওর।

লাঞ্চের সময় হয়েছে। ধীরেসুস্থে স্যান্ডউইচ আর পনির খেল রানা। সবশেষে আরও এক কাপ কফি। কোথাও যাচ্ছি না, নিজেকে বলল, শুধু জায়গা বদল করব।

উঠল। হাঁটল। আবার পাখি দেখল। কিছু শিসও রেকর্ড করল। কিন্তু কোথাও থামছে না, অর্থাৎ বসছে না। তারপর হঠাৎ একটা ফাঁকা আর নির্জন জায়গা দেখতে পেয়ে দাঁড়াল রানা। পঞ্চাশ গজ দূরে কাঁটাতারের বেড়া। তারমানে পার্কের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে ও। বাপ্স্, তা হলে তো কম হাঁটা হয়নি!

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে সবুজ গালিচার মত ঘাস দেখা যাচ্ছে। বিরাট একটা লন। তারপর একটা সাদা দালান, ষোলো কি বিশ তলা। আরে, চেনা চেনা লাগে কেন?

বিনকিউলারটা চোখে তুলল রানা। কী সাংঘাতিক! ওর হোটেল, লাইটহাউসের সরাসরি পিছনে চলে এসেছে ও। এই লনও ওর পরিচিত। ওই তো, প্রকাণ্ড ছাতা আকৃতির চাঁদোয়ার তলায় লোকজন বসে রয়েছে।

তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পেরে নিঃশব্দে হাসল রানা। ওর দিকে পিছন ফিরে থাকলেও, কাঁধ আর মাথার আকৃতি, চুলের

কাটিং ইত্যাদি দেখামাত্র লরেলিকে চিনে ফেলেছে ও। তার হাতে তাস রয়েছে।

লরেলির দু'পাশে বসা দুজন লোকের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল রানা। কংগ্রেস সদস্য জিম জেফারসন। আর আনন্দময় কাকতালীয় ব্যাপারটি ঠিক এই মুহূর্তে ঘটছে, যার ফলে খুশি হয়ে হেসে উঠল ও।

জায়গাটা পুরোপুরি নির্জন নয়। এখানেও ডালপালা আর গাছের পাতা দিয়ে ঢাকা খাদ আছে। সেই খাদের ভিতরে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে পেরিস্কোপে চোখ রেখেছে সাদিয়া সিকান্দার। শাড়ি-ব্লাউজের পরিবর্তে এখন তার পরনে জিনসের প্যান্ট ও চেক কাপড়ের ঢোলা শার্ট, পায়ে কেডস ও চোখে সানগ্লাস। হাসির আওয়াজ শুনে অবশ্যই তার প্রতিক্রিয়া হলো; পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল সে, পেরিস্কোপে চোখ রাখা নিষ্প্রাণ একটি মূর্তি।

আর রানার হেসে ওঠার কারণ হলো, লাইটহাউস হোটেলের উর্দি পরা একজন ওয়েটার একটা ট্রে-তে কোরে ওর ছোট্ট প্যাকেটটা নিয়ে এসে লরেলির সামনে ধরেছে। এরই মধ্যে প্যাকেটের গায়ে লেখা ওর নামটা পড়ে ফেলেছে সে। হাসাহাসি করছে চারজনই। হাতব্যাগ খুলে প্যাকেটটা ভিতরে রেখে দিল লরেলি, তারপরে বকশিশ দিল ওয়েটারকে।

রানার চোখ তখন স্থির হয়ে আছে লরেলির সামনে, অর্থাৎ ফ্লেমিঙ্গো পার্কের দিকে মুখ করে বসা অচেনা লোকটির দিকে। অত্যন্ত সুদর্শন আর স্মার্ট। বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। লরেলির কাঁধের উপর দিয়ে এদিকেও যেন একবার তাকাল। রানা ভাবল, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাহায্য করছে? জানে কেউ লক্ষ করছে তাকে?

ক্ষীণ হলেও একটা কাঁটা বিঁধল রানার বুকে। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি লোকটা, লরেলির সঙ্গে ওর বন্ধুত্বে ভাগ বসাচ্ছে?

আবার ওদের খেলা শুরু হয়েছে।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল রানা। ঘুরতে যাচ্ছে, এই সময় পাক খেতে খেতে ঝরে পড়া একটা পাতাকে অনুসরণ করল ওর দৃষ্টি। সেটা সরাসরি সাদিয়া সিকান্দারের মাথায় নামল।

সাদিয়া একচুল নড়ছে না দেখে নিঃশব্দে হাসল রানা। কাঁধের ব্যাগ থেকে ধীরেসুস্থে পোলারয়েড ল্যান্ড ক্যামেরাটা বের করে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল ও, ফ্রেমের ভিতর কী আছে না আছে ভাল করে দেখে নিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। পর পর দু'বার। চারপাশে এত বেশি পাখি ডাকছে, শাটার টানার আওয়াজ শুনতে পায়নি সাদিয়া।

মেয়েটিকে বিরক্ত না করে ওখান থেকে পা টিপে টিপে চলে এল রানা।

সারপ্রাইজ! রিয়েল সারপ্রাইজ! ভাবল ও, দেখা যাচ্ছে এখানে আরেক ওয়ালি আহমেদের আবির্ভাব ঘটেছে!

দুই

সৈকতে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর নিজের সুইটে ফিরছে রানা। রিসেপশান থেকেই জেনে এসেছে কে অপেক্ষা করছে ওর জন্য। ভিতরে ঢুকে দেখল ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ওর প্রেজেন্ট করা ঝুমকো দুটো কানে পরছে লরেলি।

'হাই!' বলল রানা। 'কেমন আছ?'

'মার্ভেলাস! আমিও, তোমার উপহারও, আয়নার ভিতর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল লরেলি। 'থ্যাঙ্কস, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস এগেইন। কিন্তু কী ব্যাপার বলো তো, একা একা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ?'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কী করব বলো, তুমি যদি কাজের ব্যস্ততার কথা বলে আজেবাজে লোকজনের সঙ্গে তাস খেলতে বসে যাও, একা টো টো না করে আমার উপায় কী।'

'কী বললে? আজেবাজে লোক?' হেসে উঠে দ্রুত ঘুরল লরেলি। 'ওরা কারা জানো তুমি?'

'না, শুধু একজনকে চিনি– কংগ্রেসম্যান জেফারসন।'

হঠাৎ লরেলির চোখের তারা কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমি অবাক হয়েছি। দেখি তো, তুমিও অবাক হও কিনা।'

'মানে?'

'আচ্ছা, বলো তো, সবচেয়ে ধনী বাঙালী ব্যবসায়ীর নাম কী?'

'সবচেয়ে ধনী বাঙালী··· আমেরিকায়?'

'আমেরিকায়, ভারতে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, আরব আমিরাতে আর ইংল্যান্ডে।'

'লোকটা এতগুলো দেশে সবচেয়ে বড় ধনী বাঙালী? মানে, বাংলাদেশী?'

'অনেক দেশেরই পাসপোর্ট আছে তাঁর কাছে,' বলল লরেলি। 'কয়েকটা দেশের নাগরিক ভদ্রলোক। তবে হ্যাঁ, জন্মসূত্রে তিনি বাংলাদেশী।'

মাথা নাড়ল রানা। 'জানি না।'

'তাঁর নাম শাহ সৌবর্ণ গালিব।'

'সৌবর্ণ...'

'আগে ছিল মির্জা, তার বদলে এখন সৌবর্ণ ব্যবহার করেন,' বলল লরেলি। 'অদ্ভুত এক মজার মানুষ, বুঝলে। বলছিলেন: "আমার ভেতরে সোনা আছে, আমি সোনা দিয়ে তৈরি, তাই নামটা একটু বদলাতে বাধ্য হলাম"।'

'তুমি প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছ না তো?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা, লরেলি একটা হাত ধরে নিজের পাশে সোফায় বসাল।

'স্টিল মিল, বন্দর ব্যবস্থাপনা, সার কারখানা, মাত্র এই তিনটে ব্যবসার ইনকাম ট্যাক্স পে করেছেন পঁচিশ মিলিয়ন ডলার। এরকম আরও তাঁর এগারোটা ব্যবসা আছে আমেরিকায়। ইংল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি দশজন করদাতাদের একজন। বাংলাদেশে পাঁচজনের একজন। ভারতে পঞ্চাশজনের তালিকায় নাম আছে। তাসের টেবিলে এই ভদ্রলোক আমার মুখোমুখি বসে ছিলেন। তাঁকে তুমি আজেবাজে লোক বলবে?'

চোখ বড় করল রানা। 'সত্যি? এত টাকা? তাই বুঝি তোমার লোভ হলো, যদি কিছু খসানো যায়?'

রানার হালকা বিদ্রূপ গায়ে না মেখে লরেলি বলল, 'থামো, বলছি। একটা সমস্যা হয়েছে, বুঝলে '

'জানি, লোকটা খেলায় চুরি করছে।'

'হোয়াট!' একেবারে হকচকিয়ে গেল লরেলি। 'কী বলছ? কেন বলছ একথা? কীভাবে?'

'শুধু যে জানি, তা নয়,' বলল রানা, ওর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। 'কে কত টাকা হেরেছে বলো, সব আমি ওর কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছি।'

'এই, না!' আঁতকে উঠল লরেলি। 'তাঁর সঙ্গে লাগতে যাওয়াটা একদমই উচিত হবে না তোমার। ভদ্রলোকের যে কী ক্ষমতা, তোমার কোনও ধারণাই নেই।'

লরেলিকে ভাল করে চেনে রানা। যে ভাষায় নিষেধ করছে, তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো সে চাইছে ব্যাপারটায় রানা নাক গলাক। 'কত ক্ষমতা, একটু ধারণা দাও।'

'বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী আইনপ্রণেতা তাঁর পকেটে,' জবাব দিচ্ছে লরেলি, বাড়িয়ে বলছে না একটুও। 'এফবিআই আর সিআইএ-র ডিরেক্টররা তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। আর হাত এত লম্বা যে চেষ্টা করলে হোয়াইট হাউসেরও নাগাল পেয়ে যায়।'

'তারপরেও বলছি, ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি খুলে বলো

আমাকে কার কাছ থেকে কত টাকা চুরি করেছে, সব ফিরিয়ে এনে দেয়ার ব্যবস্থা করছি। চলো, আমিও না হয় খেলে আজ কিছু হেরে নিই, তারপরে ব্যাটাকে ধরব। লোকটা কানে কম শোনে, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু... '

'আমার ওপর আস্থা রাখো, সুন্দরী,' বলে তাকে থামিয়ে দিল রানা, তারপরে দু'হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল।

চল্লিশ মিনিট পর রানাকে নিয়ে তিন তাসের আসরে হাজির হলো লরেলি। নির্দিষ্ট টেবিলটায় একা শুধু বিলিওনেয়ার ব্যবসায়ী সৌবর্ণ গালিব রয়েছে। একটা ম্যাগাজিন পড়ছে সে। রানা লক্ষ করল দুই হাতের বুড়ো আঙুল ছাড়া প্রত্যেকটি আঙুলে একটা করে হিরে বা চুনি বসানো দামি আংটি পরেছে লোকটা।

'মিস্টার গালিব,' রানাকে দেখিয়ে গলা চড়িয়ে বলল লরেলি। 'আমার বন্ধু মাসুদ রানা। ইনিও বাংলাদেশী, অথচ আপনার নাম শোনেননি। তাই পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে ধরে নিয়ে এলাম।'

হিয়ারিং এইড যন্ত্রটা কানে আটকে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে রানার দিকে ডান হাতটা বাড়াল গালিব। 'আমি সৌবর্ণ,' চোস্ত ব্রিটিশ উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল সে। 'শাহ সৌবর্ণ গালিব।'

'আমরা ইচ্ছে করলে বাংলায়ও কথা বলতে পারি,' বলল রানা, নিজেও হাত বাড়াল। 'লরেলির কোনও সমস্যা হবে না, তিনিও বাংলা বুঝতে ও বলতে পারেন।'

'হামি পারে না,' বলল সৌবর্ণ গালিব। 'ওয়্যাস্ট পাকেস্তানে উর্দুতে পড়হাই-লিখ্যাই, যদিও বোঙ্গালি, থোড়া থোড়া বোংলা হামি বলতে পারে...'

তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'থাক, এরকম বাংলার দরকার নেই। ইংরেজিতেই কথা চলুক। লরেলি বলছিলেন, আপনি খুব বড় মাপের মানুষ,' বলল রানা। গালিবের হাতটা শুকনো খসখসে লাগল ওর। 'শুনে ভাবলাম, নিশ্চয়ই ভদ্রলোক নিজেকে

খুব ছোট করে রাখেন, তা না হলে আমি তাঁকে চিনব না কেন!' হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে বিফল হলো।

রানার কথা শেষ হবার পরেও ওর হাত ছাড়ল তো না-ই, ধীরে ধীরে চাপ আরও বাড়াচ্ছে গালিব।

'আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন কিছু লোক নীরবে নিভৃতে কাজ করে, প্রচারবিমুখ; হ্যাঁ, আমি সেই দলেই পড়ি।' এতটুকু বিচলিত কিংবা বিব্রত নয় সৌবর্ণ গালিব। হাসছে সে।

গালিবের হাত যেন রক্ত-মাংস নয়, লোহা দিয়ে তৈরি। পাল্টা চাপ দিতে বাধ্য হলো রানা, তা না হলে আঙুলের হাড়গুলো ভেঙে ফেলবে। চমকে ওর মুখের দিকে চাইল গালিব, ভাবতেও পারেনি বাঙালি এক যুবকের গায়ে এত শক্তি থাকতে পারে। মুখের হাসি মুছে গেল ওর।

এবার হাসছে রানা। 'তার ওপর লরেলি বললেন, আপনি নাকি বেশ কিছুদিন হলো তিন তাসে শুধু জিতছেনই। স্ট্রেঞ্জ! একজন মানুষ শুধু জিততেই থাকবে, একদিনও হারবে না, তা কী করে হয়! ব্যাপারটা সত্যি কিনা দেখার জন্যে লরেলিও আজ আপনার সঙ্গে খেলতে বসেছিলেন। একই অবস্থা. তিনিও হাজার দশেক ডলার হারলেন। এটা শোনার পর বুঝে ফেললাম, আসলে ঠিক কী ঘটছে এখানে,' এটুকু বলে থামল ও।

পাল্টা চাপ সহ্য করতে না পেরে রানার হাতটা ছেড়ে দিল সৌবর্ণ গালিব। 'বুঝে ফেললেন,' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল সে, 'আসলে কী ঘটছে এখানে? তা, কী ঘটছে বলুন তো, মিস্টার মাসুদ রানা?' নরম আর ঠাণ্ডা হলেও, কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জের সুর স্পষ্ট। যেহেতু চুরি করছে, এই পরিস্থিতিতে অন্য কোনও মানুষ হলে ঘেমে গোসল হয়ে যেত; কিন্তু এর মধ্যে ভয় পাওয়ার কোনও লক্ষণই নেই।

ব্যাটাচ্ছেলের নার্ভ আছে, ভাবল রানা। 'নিশ্চয়ই আপনি বন্ধুদের সঙ্গে কৌতুক করছেন। এ না হয়েই যায় না! কার কাছ

থেকে কী জিতছেন, সব একটা কাগজে লিখে রাখছেন আপনি, এ-ব্যাপারে আমি শিওর। বন্ধুদের সঙ্গে এ-ধরনের মজা করাই যায়। এক সময় সবার সব টাকা ফিরিয়ে দেবেন আপনি, বলবেন: দেখলে তো, কেমন বোকা বানালাম তোমাদেরকে!' কথার শেষে হেসে উঠল রানা।

ওকে অবাক করে দিয়ে সৌবর্ণ গালিবের হাসি আরও জোরাল হয়ে উঠল। ভারী গলায়, প্রাণ খুলে হাসছে লোকটা। রানা থামার আরও দশ সেকেন্ড পর থামল সে, তারপরে বলল, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং। তা কৌতুক করছি কিনা, আসুন, খেলতে বসে জেনে নিন।' সামনের চেয়ারটা দেখাল রানাকে।

গালিবের দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারটাতেই বসল রানা। লরেলি বসল ওর ডান পাশের চেয়ারটায়। বসার সময় রানা বলল, 'আমি মোটামুটি শিওর, আমার সঙ্গে খেলতে বসে আপনি জিতবেন না। কারণ আমি তো আপনার বন্ধু নই, কাজেই আমার সঙ্গে কৌতুক করায় মনের সায় পাবেন না আপনি।'

তাস সর্ট করছে সৌবর্ণ গালিব। 'কী স্টেকে খেলবেন, বলুন। একশো ডলার বোর্ড ফি, ব্লাইন্ড পঞ্চাশ ডলার? কার্ড দেখার পর লাফ দিয়ে ডাবল করা যাবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো রানা। চট করে একবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে ওর সামনে রাখা বাহান্নটা তাস মাঝখান থেকে কেটে দিল ও।

দুজনের জন্য তিনটে করে ছ'টা তাস বাঁটল গালিব।

পাঁচশো ডলার ব্লাইন্ড খেলার পর তাস না দেখেই শো দিল রানা। নিজের তাসগুলো দেখাল গালিব। তিনটে তিন রঙের তাস পেয়েছে সে, সবচেয়ে বড় একটা কুইন। এবার নিজের কার্ড ওল্টাল রানা। ওরও প্রায় একই রকম তাস, তবে একটা টেক্কা পেয়েছে ও। কাজেই জিতল।

দ্বিতীয়বার রানা বাঁটল।

কিছুক্ষণ ব্লাইন্ড খেলার পর নিজের তাস দেখল রানা। তাস দেখার ওর ভঙ্গিটাই যা বলার বলে দিল গালিবকে। চেহারা দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবে বুকের ভিতর নিশ্চয়ই ঢেঁকির পাড় পড়ছে।

তাস তিনটে রানা টেবিল থেকে তুললই না। প্রথমে দুই হাতের আঙুল আর তালু দিয়ে ঘিরে ফেলল ওগুলোকে, তারপর টেবিলের সারফেসে নামিয়ে আনল নিজের চোখ। সবশেষে আঙুলের চাপ দিয়ে তাসগুলোর কিনারা সামান্য উঁচু করে দেখে নিল কোনটা কী। এই ভঙ্গিতে একা শুধু ও-ই দেখতে পেল নিজের তাস, ওর পিছনে ফ্লেমিঙ্গো পার্কের গর্তে বসা সাদিয়া মেয়েটি তার শক্তিশালী পেরিস্কোপে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না

গালিবের চেহারা দেখে রানা ধারণা করল, নিজের অক্ষমতার কথা জানাচ্ছে তাকে সাদিয়া।

একটা জোড়া পেয়েছে রানা। তারপরেও বোর্ডে একশো ডলার ফেলে শো দিল। গালিব কিছুই পায়নি, তার সবচেয়ে বড় তাস আবারও একটা কুইন।

'দেখা যাচ্ছে রানি-মহারানিরা আপনাকে খুব পছন্দ করে,' হাসিমুখে বলল রানা। 'করবে না-ই বা কেন– একে তো টাকার পাহাড়ে বসে আছেন, তার ওপর বলিউডি হিরোর মত চেহারা। মেয়েরা নিশ্চয়ই খুব জ্বালাতন করে আপনাকে?'

এই প্রথম কটমট করে তাকাল গালিব, নিজের অজান্তে তার একটা কাটা ঘায়ে খোঁচা মেরে বসেছে রানা।

পরবর্তী বিশ দানে সাতবার জিতল গালিব, তেরোবার রানা। পরিচ্ছন্ন খেলা চলছে, চুরি করার কোনও সুযোগ নেই গালিবের। সব মিলিয়ে হাজার দশেক ডলার জিতে নিয়েছে রানা।

'আপনার বন্ধু নই আমি,' বলল ও। 'তাই আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন না।' হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে হেসে উঠল। 'মানে দয়া করে জিতছেন না।'

তাস বাঁটতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল গালিব। 'ঠিক কী বলতে চান আপনি? বলছেন আপনি আমার বন্ধু হলে জিততাম। কীভাবে জিততাম, ব্যাখ্যা করবেন?'

ওরে, শালা! মনে মনে গালি দিল রানা। কথা না বলে অপেক্ষা করছে ও। কয়েক সেকেন্ড পরেই পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। হোটেলের মূল ভবনের দিক থেকে লম্বা পায়ে হেঁটে আসছে উর্দি পরা একজন ওয়েটার, হাতে ট্রে। ট্রের উপর একটা বড়সড় এনভেলাপ পড়ে রয়েছে।

সরাসরি গালিবের পাশে এসে থামল ওয়েটার, তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে সবিনয়ে ফিসফিস করল, 'স্পেশাল ডেলিভারি, সার।'

'এক্সকিউজ মি,' বলে ভুরু কোঁচকাল গালিব, তারপর ট্রে থেকে এনভেলাপটা তুলে নেড়েচেড়ে দেখল। ওটার এক পিঠে শুধু তার নাম লেখা রয়েছে।

ট্রে থেকে ছুরি তুলে নিয়ে এনভেলাপের মুখ কাটল গালিব। ভিতর থেকে বেরুল ফাইভ-R সাইজের রঙিন একটা ফটোগ্রাফ–তাতে সাদিয়ার কাঁধ সহ মাথা, পেরিস্কোপ, মাইক্রোফোনের স্পিকার, হোটেল লাইটহাউসের লন, লনে টাঙানো চাঁদোয়া, গালিবের সামনে বসা প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের হাতে ধরা তাস ইত্যাদি সবই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, এক কোণে আজকের তারিখসহ।

ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে সৌবর্ণ গালিবের চোখ-মুখ। অস্পষ্ট শিসের শব্দ বেরুচ্ছে নাকের ফুটো দিয়ে। চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল। অগ্নিদৃষ্টির যদি পোড়াবার ক্ষমতা থাকত, মুহূর্তে ভস্ম হয়ে যেত রানা। তবে ওর মুখে অমায়িক হাসি আর চোখে উৎফুল্ল ভাব দেখে বোঝা গেল কোনও ক্ষতিই হচ্ছে না।

শুধু ফটো নয়, এনভেলাপের ভিতরে একটা কমপিউটার প্রিন্টআউট-ও রয়েছে। সেটা বের করে চোখ বুলাল গালিব।

প্রথমে দীর্ঘ একটা তালিকা। গত সাত দিনে যে-কজন কংগ্রেস সদস্য আর ব্যবসায়ী গালিবের কাছে হেরেছে তাদের নাম, নামের পাশে টাকার অঙ্ক। সব মিলিয়ে এগারোজন। সর্বমোট টাকা: দুই লক্ষ বাইশ হাজার বাহান্ন ডলার।

সবশেষে ইংরেজিতে কিছু কথা লেখা। বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়:

'যা কিছু করেছেন, বন্ধুদের সঙ্গে কৌতুকবশত। সেই কৌতুকটাকে টেনে আরেকটু লম্বা করুন। এই মুহূর্তে, এক্ষুনি। গলা ছেড়ে হাসুন, সবাইকে ডেকে বলুন, ব্যাপারটা স্রেফ বোকা বানাবার একটা খেলা ছিল। তারপর চেক লিখে যার যার টাকা ফেরত দিন। আমার এই নির্দেশ না মানলে আপনার কপালে কী আছে তা আর ব্যাখ্যা করার ঝামেলায় গেলাম না।'

'এর মানে কী, মিস লরেলি?' কাগজটা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল গালিব।

লরেলি জবাব দেওয়ার সময় পেল না, কারণ ঠিক এই সময় হই-হই আওয়াজ উঠল একটা। ঘাড় ফেরাল ওরা। দেখল কংগ্রেস সদস্য আর ব্যবসায়ীদের একটা দল হন হন করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। সব মিলিয়ে নয়জন। এরা প্রত্যেকে গালিবের কাছে হেরেছে। এদের দলে আরও একজন ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে হোটেলে নেই সে।

'এ-সব কী শুনছি, মিস্টার গালিব!' ওদের টেবিলটাকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল তারা। 'আপনি নাকি আমাদের সঙ্গে জোক করেছেন?'

'হারা টাকা নাকি ফেরত দেবেন আপনি?'

'টাকা হারিয়ে ফেরত পাবার চেয়ে ভাল খবর আর কী হতে পারে, তবে তার আগে বলুন চুরিটা করলেন কীভাবে? শিখে রাখি, আমরাও যাতে বন্ধুদের বোকা বানাতে পারি।'

টাকা ফেরত পাওয়ার খবর শুনে ছুটে এসেছে, কাজেই তারা

তো হাসবেই। দেখা গেল ফাঁদে পড়লে বগাকে সময় সময় হাসতেও হয়। এই মুহূর্তে রানার নির্দেশ মত গলা ছেড়ে হাসতে হচ্ছে শাহ সৌবর্ণ গালিবকে। তার হাঁসিতে এত জোর, বাকি সবার সম্মিলিত হাসিও চাপা পড়ে যাচ্ছে।

'দেখলেন তো, কেমন বোকা বানালাম!' হাসি থামিয়ে বলল গালিব, রানার দিকে আপাতত তাকাচ্ছে না। ফটো আর তালিকাটা আগেই সরিয়ে ফেলেছে সে। পকেট থেকে চেক বই বের করে দুই লক্ষ বাইশ হাজার বাহান্ন ডলারের একটা চেক লিখে ধরিয়ে দিল লরেলির হাতে। 'চেকটা একজন ওয়েটারকে দিয়ে এই হোটেলেরই ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে নিন, প্লিজ। কার কী পাওনা হিসেব করে আপনিই সবাইকে বুঝিয়ে দিন। আপনারা যান, মিস্টার রানার সঙ্গে আমি একটু গল্প করি।'

উৎফুল্ল লোকগুলোকে নিয়ে চলে গেল লরেলি। যাওয়ার আগে রানার উদ্দেশে একবার চোখ মটকাল।

'ড্রিঙ্কস চলবে তো?' জানতে চাইল গালিব। সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। যাই ঘটুক না কেন, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে এই লোকের কোনও সমস্যা হয় না।

'চলতে পারে,' বলল রানা। 'তবে বিলটা আমি দেব।'

কাঁধ ঝাঁকাল গালিব, তারপরে ইঙ্গিতে একজন ওয়েটারকে ডাকল। 'দুটো হুইস্কি।' ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে যেতে রানার চোখে চোখ রাখল সে। 'কী করা হয় আপনার?' ভারী গলায় প্রশ্ন করল। ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'পেশায় আমি একজন সেলস প্রমোশন এক্সপার্ট,' বলল রানা। 'বাংলাদেশী কয়েকটা গার্মেন্টস কোম্পানি ইউরোপ-আমেরিকায় বাজার তৈরির দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে।'

'তাস ছাড়া আর কী খেলেন? গলফ?'

'মাঝে-মধ্যে খেলি, বিশেষ করে কখনও যদি ইংল্যান্ডে যাই,' বলল রানা। 'হান্টারকুমে।'

'আরে, দারুণ কোর্স! আমি সম্প্রতি রয়্যাল সেইন্ট মার্কস-এ যোগ দিয়েছি। স্যান্ডউইচ আমার একটা বিজনেস ফ্যাসিলিটির কাছেই। জায়গাটা আপনি চেনেন?'

'ওখানে আমি খেলেছি।'

'আপনার হ্যান্ডিক্যাপ কত?' গালিব জানতে চাইছে খেলার একটা কোর্স কমপ্লিট করতে গড়ে কতবার বলে আঘাত করতে হয় রানাকে।

'নাইন,' বলল রানা।

'কাকতালীয় ব্যাপার, আমারও তাই! একদিন খেলব আমরা, কী বলেন? সেটা কালও হতে পারে, তাই না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কাল আমি ব্যস্ত থাকব। তা ছাড়া সন্ধ্যার আগেই ট্রেনে চড়তে হবে, নিউ ইয়র্কে যাব বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট ধরতে।'

'দেশে ফিরছেন?'

'আপাতত, হ্যাঁ।'

'তবু, আশা করি নিশ্চয়ই আবার আমাদের দেখা হবে,' বলল গালিব, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। হঠাৎ হাসল সে। 'একটু বোধহয় ব্যাখ্যা করা দরকার, কেন আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছি। প্রথমে নিজের সম্পর্কে একটু বলি। আমি সৌবর্ণ। নিজে আমি সোনা দিয়ে তৈরি, সোনার তৈরি মানুষ দেখলে চিনতেও পারি। আপনি আমার ক্ষতি করেছেন ঠিকই, তবে আমার ভেতর কৌতূহলও জাগিয়ে তুলেছেন। তাই ভাবছি আবার আমাদের দেখা হওয়া উচিত। আমার একটা বৈশিষ্ট্য হলো, সব কিছু থেকে ভাল কিছু বের করে আনা যায় কিনা দেখা।'

'সংক্ষেপে, প্রতিটি ক্ষেত্রে লাভবান হতে চান।'

'এগজ্যাক্টলি।'

আসলে কে এই লোক? ভাবছে রানা। সত্যিকার অর্থে সুপুরুষ। হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক। এত টাকার মানুষ

বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতে বসে চুরি করে না। এর রহস্যটা কী?
'তবে তা বোধহয় সম্ভব নয়। মানে, প্রতিটি ক্ষেত্রে লাভবান হওয়া যায় না।'

'যায়,' দৃঢ়, প্রায় কঠিন সুরে বলল গালিব। 'এটা যদি আপনার চ্যালেঞ্জ হয়, আমি গ্রহণ করলাম।'

ওয়েটার ফিরে আসছে দেখে কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল রানা। ওয়েটারের পিছু নিয়ে লরেলিকেও ফিরতে দেখল ও।

চেয়ারে বসে রিপোর্ট করল লরেলি। 'সবাই যে কী খুশি হয়েছে, বলে বোঝাতে পারব না!'

'আমারও নিজেকে ভারমুক্ত লাগছে,' নির্লজ্জ লোকটা হাসছে। 'এটাকে উপলক্ষ করে আপনাদের দুজনকে আমি আজ রাতে ডিনার খাওয়াতে চাই। প্লিজ, না বলবেন না। আজকের ঘটনাটা সত্যি আমি ভুলতে চাই না।'

কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হুমকি আছে, খেয়াল করল রানা।

লরেলি ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হেসে উত্তরে বলল, 'কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, মিস্টার গালিব। এই মাত্র আমাদের দুজনের জন্যে একটা টেবিল রিজার্ভ করে আসলাম।'

কাঁধ ঝাঁকাল গালিব। 'আমার দুর্ভাগ্য!'

তিন

এক হপ্তা পর।

ঢাকা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টার। সকাল দশটা বেজে দশ মিনিট।

এক ঘণ্টা দশ মিনিট হলো অফিসে পৌঁছেছে রানা। এসেই শুনেছে, বস্ ওকে কোথাও যেতে মানা করেছেন, তাঁর সময় মত ডাকবেন। সেই থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ও। মনটা উন্মুখ হয়ে আছে প্রত্যাশায়। ভাবছে, যদি নতুন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট পায়, কে জানে কেমন হবে সেটা!

অপেক্ষার সময়টা সহজে কাটতে চায় না। তার উপর কী কারণে যেন খুঁত খুঁত করছে মনটা। বারবার মনে হচ্ছে হাতে যখন সময় রয়েছে, একটা ব্যাপার চেক করা দরকার। কী সেটা? অবচেতন মন থেকে আসছে তাগাদাটা। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মির্জা গালিব– না, সৌবর্ণ গালিব। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে, ওদের কমপিউটারাইজড রেকর্ড সেকশন তার সম্পর্কে কিছু জানাতে পারে কিনা।

টেলিফোনের সবুজ রিসিভার তুলে বোতাম টিপল রানা। রেকর্ড সেকশনের চিফ– রায়হানকে পাওয়া গেল। ওর প্রশ্ন শুনে রায়হান বলল, 'কই, মাথার ভেতরে কোনও বেল তো বাজছে না, সার। ঠিক আছে, চেক করে দেখে জানাচ্ছি আপনাকে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। চেয়ারে হেলান দিল ও, পা দুটো টেবিলে তুলে দিয়ে চোখ বুজল, ফিরে গেল এক হপ্তা আগে, মায়ামি বিচে।

গালিবকে নাকে খত দিতে বাধ্য করার পরদিন সন্ধ্যায় স্টিমারে চড়ে মায়ামি বিচ ত্যাগ করে রানা। মায়ামির রেলস্টেশনটা জেটি থেকে বেশি দূরে নয়, হেঁটেই পৌঁছাল। ওখানে ওর জন্য একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল। ফলে ট্রেন জার্নিটা হলো দারুণ উপভোগ্য।

প্ল্যাটফর্মে ওর অপেক্ষায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল সেই কমলা আগুন, পাকিস্তানী সুন্দরী সাদিয়া সিকান্দার। কাঁধ থেকে ঝুলছে চামড়ার একটা বিরাট ব্যাগ।

রানাকে দেখে হন হন করে হেঁটে এল সে, চোখে-মুখে

উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা। হাত ধরে প্ল্যাটফর্মের একধারে টেনে আনল ওকে। এরই মধ্যে দম ফুরিয়ে গেছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'উফ্, পেয়েছি! না পেলে কী যে হত! কেন তুমি আমাকে এরকম একটা বিপদের মধ্যে ফেললে?'

আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'বুঝলাম না।'

'গালিব সাহেবকে কী বলেছ তুমি? কেন তিনি বলছেন তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি আমি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমার সম্পর্কে কিছুই বলিনি তাকে। তোমাকে যে আমি চিনি, তা-ও সে জানে না। এটা স্রেফ তার সন্দেহ… '

'কী করেছ তুমি? এরকম সন্দেহ তাঁর হবে কেন?'

'সে নিজে তোমাকে কিছু জানায়নি?'

'না।'

'তুমি জানলে কীভাবে এখান থেকে ট্রেনে চড়ব আমি?'

'গালিব সাহেব বললেন। অভিযোগ আর জেরার মুখে তাঁকে আমি জানাতে বাধ্য হই তোমার সঙ্গে শপিং মলে আমার একবার দেখা হয়েছিল। তোমাকে আমি পার্কেও দেখেছি, সেটা বলিনি। আমার কথা বিশ্বাস করেছেন বলে মনে হলো, বললেন: যাও, মাসুদ রানার সঙ্গে একই ট্রেনে ওঠো, তার সঙ্গে ভাব জমাও, যেভাবে পার তার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যোগাড় করো। তার ধারণা, তুমি আমাদের পেছনে লেগেছ। তোমার উদ্দেশ্য কৌশলে জেনে নিয়ে তাঁকে বলব আমি। এই কাজে ব্যর্থ হলে আমার চাকরি থাকবে না।'

'তার চাকরি না করাই ভাল, সাদিয়া,' সাবধান করে দিয়ে বলল রানা। 'সৌবর্ণ গালিব অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক।'

'কিন্তু এরকম একটা চাকরি আমি আর পাব কোথায়? এত সুযোগ-সুবিধে আর ভাল বেতন কে দেবে আমাকে?'

'ঠিক আছে, এসো, আগে ট্রেনে উঠি,' বলল রানা। 'কথা বলার

জন্যে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।'

দুজনের জন্য স্লিপিং বার্থসহ ছোট্ট একটা কমপার্টমেন্ট বুক করল রানা। ট্রেনে চড়ার আগে রেস্তোরাঁয় ঢুকে খাওয়াদাওয়াটাও সেরে নিল।

ট্রেন ছাড়ার পর দুজন দুটো বিয়ারের ক্যান খুলল। এক-আধটা খায় সাদিয়া, শুনে রানাই কিনেছে।

'এবার বলো, এত যার টাকা, সে তাস খেলায় চুরি করে কেন?' ক্যান থেকে সরাসরি কয়েক ঢোক বিয়ার খেয়ে জানতে চাইল রানা।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সাদিয়া। 'এক কথায় দুর্বোধ্য একটা মানুষ। আমার ধারণা এটা তাঁর একটা রোগ, এই টাকা বানানো। সোনা ও টাকা, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই প্রিয়, এগুলোর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন না।

'একবার তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, টাকার পেছনে কেন এভাবে ছোটেন, কী দরকার এত টাকার? এক কথায় উত্তর দিলেন, হিসেবে মিললে যে লোক টাকা কামায় না সে বোকা। সারাক্ষণ এই একটা কাজই করে চলেছেন– হিসেব মিলছে কিনা দেখছেন।

'তিনি যখন এই কাজটা দিলেন আমাকে, আমি বললাম: এরকম ঝুঁকি নেয়ার কী দরকার? আপনার কীসের অভাব আছে? জবাব দিলেন: এটা হলো দ্বিতীয় অনুশীলন। হিসেব যখন মিলবে না, সেটাকে মেলাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'বলছ চাকরিটা ভাল। কিন্তু ভেবে দেখেছ, পার্কে তুমি যা করছিলে তা যদি আমি না দেখে পুলিশ দেখে ফেলত, এখন তুমি কোথায় থাকতে?' প্রশ্ন করল রানা।

বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সাদিয়া। 'মনে হয় না কোনও সমস্যা হত,' বলল সে। 'গালিব সাহেবের বলা আছে, সে-ধরনের কিছু ঘটলে আমি যেন সঙ্গে সঙ্গে জানাই তাঁকে। ওই পুলিশকে স্রেফ কিনে ফেলবেন তিনি। টাকা বা সোনার লোভ দমন

করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'মানে?'

নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে সাদিয়াকে। 'তাঁর দশ আঙুলে অন্তত আটটা হীরে-চুনি বসানো সোনার আঙটি থাকে সব সময়। আর ব্রিফকেসে থাকে বেশ কয়েকটা সোনার বার, মাস্টার কার্ড ও চেকবই।'

'এত হীরে-জহরত, সোনা ও টাকা সঙ্গে রাখার কী কারণ? চুরি-ডাকাতির ভয় নেই?'

'সঙ্গে রাখেন, কখনও যদি প্রয়োজন হয়! গালিব সাহেবের ধারণা সোনা ও টাকা তাঁকে যে-কোনও বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে। তাঁর সব সোনাই চব্বিশ ক্যারাট। আসলে সোনা সত্যি ভালবাসেন তিনি, মানুষ যেমন স্ট্যাম্প কিংবা দামী পাথর ভালবাসে, কিংবা,' হাসল সাদিয়া, 'যেভাবে মেয়েদেরকে ভালবাসে··· না, ঠিক তা বোঝাতে চাইনি।'

'সে তোমাকে··· তার সঙ্গে তোমার−?'

এক পলকে লাল হয়ে উঠল সাদিয়ার মুখ। 'নাহ্! কী যা তা··· তা ছাড়া, সে প্রশ্নই তো ওঠে না।'

'কেন, সে প্রশ্ন কী কারণে ওঠে না?' আরও বরং বাড়ল রানার কৌতূহল।

কথা না বলে চুপ করে থাকল সাদিয়া। চোখের ভাষাও অনুবাদ করা যাচ্ছে না, সেখানে যেন একাধারে ক্ষীণ বিদ্রূপ আর কৌতুকের ভাব আসা-যাওয়া করছে।

'তুমি রক্ষণশীল, যাকে বলে সতী-সাধ্বী, তাই প্রশ্ন ওঠে না?'

মাথা নাড়ল সাদিয়া। আড়ষ্ট ভাবটা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারছে না। 'আসলে··· মানে··· গালিব সাহেবের কী যেন একটা অসুখ আছে।'

'ইমপোটেন্ট··· নপুংসক?'

মাথা ঝাঁকাল সাদিয়া, অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, তবে ঠোঁটে না ফোটা হাসির আভাস।

'কীভাবে জানলে? তোমার ভুলও তো হতে পারে।'

'তিনি নিজে বলেছেন আমাকে। বলেছেন: এ-ব্যাপারে আমাকে তোমার ভয় পাওয়ার দরকার নেই··· আমি পারি না। তবে···'

'তবে কী?'

'নাহ্, কিছু না।' বিয়ার শেষ করে ক্যানটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিল সাদিয়া। 'আরেকটা দাও।'

'ওখানে তোমার কাজটা কী, তাস চুরিতে সাহায্য করা ছাড়া? তুমি কি তার সেক্রেটারি?'

'ঠিক সেক্রেটারিও বলা যায় না,' বলল সাদিয়া। 'আমাকে চিঠি টাইপ করতে হয় না, কিংবা কফিও বানাতে হয় না। ওহ্! আরে, আমাকে তো তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, অথচ নিজেদের সব কথা ফাঁস করে দিচ্ছি। তুমি আবার সব তাঁকে বলে দেবে না তো? তা হলে কিন্তু চাকরিটা সত্যি থাকবে না।' চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। 'কী জানি, তথ্য নিয়ে যেতে ব্যর্থ হলে··· তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'না, নিশ্চিন্ত থাকো, তাকে আমি কিছু বলব না। তবে আবার বলছি, এরকম একটা লোকের চাকরি করা তোমার ঠিক হচ্ছে না।'

'সব খরচ বাদেও প্রতি মাসে চারশো ডলার বাঁচে আমার,' বলল সাদিয়া। 'আমি টাকা জমাচ্ছি। স্বাধীনভাবে কিছু করার মত জমলে ছেড়ে দেব।'

রানা ভাবল, কে জানে মেয়েটি বোকার স্বর্গে বাস করছে কিনা। গালিব তাকে ছাড়বে কিনা সন্দেহ আছে ওর। সাদিয়া তার অনেক গোপন বিষয় জেনে ফেলেছে না? মেয়েটির মধ্যে এক ধরনের সরলতা আছে। মুখটা নিষ্পাপ আর সুন্দর। ফিগারটা সাংঘাতিক।

সাদিয়া হয়তো কিছু সন্দেহ করছে না, তবে তার জন্য সৌবর্ণ গালিব যে ভয়ানক একটা বিপদ তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

চিন্তা-ভাবনা করে রানা বলল, 'এক হাজার ডলার মাইনে পেলে চলবে তোমার? একটা অ্যান্টিকস শপে দশ ঘণ্টা ডিউটি

দিতে হবে। নিউ ইয়র্কে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা নাড়ল সাদিয়া। 'সমস্যা আছে। এখানে আমি চোদ্দশো পাই। তা ছাড়া, তিন মাসের বেতন জমা রাখেন গালিব সাহেব, হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিলে ওই টাকাটা হয়তো দিতে চাইবেন না।' হেসে উঠল সে। 'তবু, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। ভাল কথা, নিউ ইয়র্কে পৌঁছে বিদায় নেয়ার সময় তোমার ঠিকানা দিতে ভুলে যেয়ো না যেন!'

ট্রেন জার্নিটা সত্যি ভারি উপভোগ্য হয়েছিল। বিয়ার খাওয়া শেষ করে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক গুঞ্জনের মধ্যে সরু একটা বার্থে শুয়ে শুরু হয় ওদের ধীর লয়ে দীর্ঘ ভালবাসার পর্ব। আচরণ দেখে মনে হলো মেয়েটি যেন দৈহিক ভালবাসা পাওয়ার জন্য কাঙাল হয়ে আছে। রাত শেষ হওয়ার আগে আদর করার কোমল ছলে আরও দু'বার ওর ঘুম ভাঙাল সে; কিছুই না বলে শুধু স্পর্শ করল ওর হাত আর সুঠাম শরীর।

পরদিন সকালের কর্কশ আলো তাড়াবার জন্য জানালার পরদা টেনে দিয়ে দু'হাতে ধরে নিজের দিকে টানল ওকে, বলল, 'এসো, প্লিজ!' যেন ছোট্ট শিশু চকলেট চাইছে।

ইতিমধ্যে সাদিয়ার কাছ থেকে রানা জেনেছে, সৌবর্ণ গালিবকে মোটেও উদ্বিগ্ন দেখায়নি, তাকে বরং সম্পূর্ণ শান্ত আর ঠাণ্ডা মনে হয়েছে। অচেনা একজন লোকের কাছে পরাজিত হওয়ার ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিয়েছে সে। সাদিয়াকে সে বলেছে, রানাকে যেন জানানো হয় আট-দশ দিনের মধ্যে ইংল্যান্ডে যাবে সে, দেখা হলে রানার সঙ্গে গলফ খেলবে স্যান্ডউইচের রয়্যাল সেইন্ট মার্কস ক্লাবে। ব্যস, এইটুকুই; না কোনও হুমকি দিয়েছে, না কোনও অভিশাপ। বলেছে রানার কাছ থেকে যতটুকু সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী ট্রেনেই যেন মায়ামিতে ফিরে যায় সাদিয়া।

এই ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে সাদিয়ার সঙ্গে বেশ

খানিকটা তর্ক হলো রানার। রানা চায় না লোকটার কাছে আবার ফিরে যাক সাদিয়া। কিন্তু সৌবর্ণ গালিবকে ভয় পাচ্ছে না মেয়েটি। ওর কিই-বা ক্ষতি করতে পারবেন তিনি? আর চাকরিটা সত্যি খুব ভাল।

গালিবের সঙ্গে তাস খেলে জিতেছিল রানা। সব মিলিয়ে কিছু কম দশ হাজার ডলার। রানা সিদ্ধান্ত নিল, এই টাকাটা সাদিয়াকে দেবে। সে নিতে রাজি না হওয়ায় জোর করতে হলো। 'এই টাকা আমি নিজের কাছে রাখতে চাই না,' বলল ও। 'জানি না কী করব এটা দিয়ে। যাই হোক, বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে ভেবে রেখে দাও তুমি। ধরো হয়তো এমন হলো যে হঠাৎ ওখান থেকে তোমাকে পালাতে হবে, তখন কাজে লাগবে এটা। তখন এই দশ হাজারকেই মনে হবে দশ লাখ। তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কথা আমি কখনও ভুলব না।'

ট্রেন থেকে নেমে একটা রেস্তোরাঁয় বসে ব্রেকফাস্ট সারল ওরা। তারপরে টিকিট কেটে পরবর্তী ট্রেনে সাদিয়াকে তুলে দিল রানা। বিদায়ের ঠিক আগে তাকে একবার চুমো খেল ও। তারপরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এল।

কাল রাতের ব্যাপারটা প্রেম ছিল না, তবে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার সময় একটা উদ্ধৃতি মনে পড়ল রানার: 'Some love is fire, some love is rust. But the finest, cleanest love is lust.' দুজনের কেউই অনুতপ্ত নয়। ওরা কি কোনও পাপ করেছে? এখানে পাপ প্রাসঙ্গিক হয় কী করে! ওরা কি কারও ক্ষতি করেছে? নিঃসন্দেহে বলা যায় দুজনেই খুশি হয়েছে ওরা, আর কারও কোনও ক্ষতিও করেনি। আর পাপ যদি করে থাকে, কী সেটা? যৌন পবিত্রতা লঙ্ঘনের পাপ? আপন মনে হাসল রানা। এ প্রসঙ্গেও একটা উদ্ধৃতি আছে, তা-ও আবার একজন সেইন্ট-এর। সেইন্ট অগাস্টিন বলেছেন: Oh Lord, give me chastity. But don't give it yet!'

সবুজ টেলিফোনটা বেজে উঠল। নিউ ইয়র্ক থেকে ঢাকায় ফিরে এল রানার মন। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ও।

'শাহ মির্জা গালিব, শাহ গালিব মির্জা, এরকম নাম অনেক আছে, সার,' রেকর্ড সেকশন থেকে ওকে বলল রায়হান। 'কিন্তু সৌবর্ণ গালিব একজনও নেই। তা ছাড়া, গালিব নামে কোনও ক্রিমিনালও পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

'আমরা ইন্টারপোলে খবর নিয়ে দেখতে পারি,' বলল রানা। 'আপনার কাছে তার ফটো আছে, সার?'

'আছে, তবে সেটা দূর থেকে পোলারয়েড ল্যান্ড ক্যামেরায় তোলা,' বলল রানা।

'সেটা কোনও সমস্যা নয়, সার,' বলল রায়হান। 'কমপিউটারে ঢুকিয়ে মুখটাকে আমরা বড় ও পরিষ্কার করে নিতে পারব। আপনি ওটা আমাদের ল্যাবে পাঠিয়ে দিন, সার।'

'ঠিক আছে,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। ব্রিফকেস খুলে সৌবর্ণ গালিবের দ্বিতীয় ফটোগ্রাফটা বের করল ও। তারপরে কলিং বেল বাজিয়ে ওর সেক্রেটারি কাকলিকে ডাকল।

ছবিটা নিয়ে মাত্র চলে গেছে কাকলি, এই সময় রানার ইন্টারকম জ্যান্ত হয়ে উঠল।

'রানা?' মেজর জেনারেল [অব.] রাহাত খানের ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল স্পিকার থেকে।

চোখের পলকে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'ইয়েস, সার।'

'এখনই আমার চেম্বারে আসতে পারবে?' বলেই যোগাযোগ কেটে দিলেন বস্।

'ব্যাটাচ্ছেলে!' ভাবল রানা। 'উত্তরটা শোনারও ধৈর্য নেই?'

'আজ বিকেলের ফ্লাইটে লন্ডনে যাচ্ছ তুমি।'

এভাবেই শুরু করলেন বিসিআই চিফ রাহাত খান। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চিফ একটা সমস্যার কথা জানিয়েছেন। আমিও আমাদের একটা সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি।'

'মিস্টার মারভিন লংফেলো, সার?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালেন বস্। 'সমস্যাটা ব্যাখ্যা করে অনুরোধ করেছেন আমরা যেন অতি অবশ্যই এ-ব্যাপারে সাহায্য করি তাঁকে। আমিও আমাদের সমস্যার সমাধান করার জন্যে তাঁর সাহায্য চেয়েছি। দুটো সমস্যার জন্যে আসলে একজনই দায়ী।'

'কী ধরনের সমস্যা, সার?'

'গোল্ড হাইজ্যাকিং,' বললেন রাহাত খান, 'অ্যান্ড গোল্ড স্মাগলিং।'

'ঠিক বুঝলাম না, সার,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল রানা। 'কার গোল্ড হাইজ্যাক হলো?'

'বাংলাদেশের সোনা হাইজ্যাক হয়েছে, তবে বেশ কিছুদিন আগে,' বললেন বস্। 'তদন্তের স্বার্থে ব্যাপারটা যতটা পারা যায় চেপে রাখা হয়েছে।'

নড়েচড়ে বসল রানা। শুধু কৌতূহলী নয়, খানিকটা উদ্বিগ্নও দেখাচ্ছে ওকে। 'কত সোনা, সার? কীভাবে হাইজ্যাক হলো?'

ব্যাপারটা ধীরেসুস্থে ব্যাখ্যা করলেন বিসিআই চিফ। সোনার রিজার্ভ খুবই কম বাংলাদেশের। এর কারণ দেশ ভাগ হবার পর বাংলাদেশের প্রাপ্য সোনা পাকিস্তান বাংলাদেশকে ফেরত দেয়নি। যাই হোক, দেশে ডলারের রিজার্ভ বেশ ভাল হওয়ায় কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, কিছু সোনা কেনা হবে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন খনি কোম্পানিগুলো মাঝে মধ্যেই নিলামের আয়োজন করে, তখন বাজারদরের চেয়ে অনেক কম দামে সোনা কেনা যায়।

এরকম একটি নিলামে অংশ নিয়ে প্রায় একশো টন সোনা কিনেছে বাংলাদেশ যে সোনার বাজারদর আড়াই বিলিয়ন মার্কিন

ডলার। খনিটা দক্ষিণ আফ্রিকায়, নিলামও হয়েছে ওখানে, তবে খনির মালিক ব্রিটিশ হওয়ায় আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে বাংলাদেশ পেমেন্ট করবে ইংল্যান্ডে, সোনাও ডেলিভারি নেবে ওখানে।

পেমেন্ট করে সোনা বুঝে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধি দলকে পাঠানো হয় লন্ডনে। তারা সোনার বার দেশে নিয়ে আসার জন্য খুবই সতর্কতার সঙ্গে একটা কোম্পানির কার্গো প্লেন চার্টার করেছে, নিয়ম অনুযায়ী চুক্তি করেছে বীমা কোম্পানির সঙ্গে। যা যা করার সব করে প্রতিনিধি দলের প্রায় সবাই দেশে ফিরে এসেছে, গার্ড হিসাবে রয়ে গেছে শুধু দু'জন সিপাই আর একজন ক্যাপটেন– সোনার সঙ্গে প্লেনে আসার কথা তাদের। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে সোনা বোঝাই কার্গো প্লেনটা সময়মতই টেক অফ করেছে। কিন্তু তারপর স্রেফ উধাও হয়ে গেছে সেটা।

প্লেন নিখোঁজ, এ-খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ও ইন্টারপোল তদন্ত শুরু করেছে। প্লেনটার কোনও হদিসই তারা করতে পারেনি, তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এয়ারলাইন্স কোম্পানিটা ছিল ভুয়া, তাদের সমস্ত কাগজ-পত্র ছিল জাল করা। বীমা কোম্পানির ব্যাপারটাও তাই– সব ভুয়া, সব জাল।

পরে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ও ইন্টারপোলের সঙ্গে তদন্তে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সও। অনেক খোঁজখবর করার পর এই কিছুদিন আগে জানা গেছে, সেই ভুয়া বীমা ও এয়ারলাইন্স কোম্পানির মালিক একজন বাঙালী।

বস্ থামতে রানা জানতে চাইল, 'আর গোল্ড স্মাগলিঙের ব্যাপারটা, সার?'

'ওটা আসলে ইংল্যান্ডের সমস্যা, ডিটেলস ওঁদের কাছ থেকে তোমাকে জেনে নিতে হবে,' বললেন বস্। 'ওঁদেরকে স্মাগলিং ঠেকাতে সাহায্য করব আমরা, আমাদেরকে সোনা উদ্ধারে সাহায্য

করবে ওরা– এরকমই কথা হয়েছে বিএসএস-এর সঙ্গে। তবে আমাদের আসল কাজ: যেমন করে হোক ওই একশো টন সোনা ফিরিয়ে আনা।'

মনে মনে কিছুটা হতাশ রানা। ওর অ্যাসাইনমেন্ট তা হলে এটাই? একজন বাঙালী হাইজ্যাকারকে ধরতে হবে? তার কাছ থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে বাংলাদেশের সোনা?

'সার,' নিচু গলায় বলল ও, 'একটু যদি বলেন ঠিক কী করতে হবে আমাকে...'

'শাহ সৌবর্ণ গালিবের নাম শুনেছ?'

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার সময় পেল না রানা। মুচকি হাসি এসে গেল ঠোঁটে।

'কী ব্যাপার?' বসের গলায় ধমক আর বিরক্তির সুর। 'এর মধ্যে মজার কী পেলে?'

'আমি দুঃখিত, সার,' চট্ করে বলল রানা। 'আসলে, সার, এই খানিক আগে আমাদের রেকর্ড সেকশনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম লোকটা সম্পর্কে আমরা কিছু জানি কিনা।'

'নিজের নাম একটু বদলেছে সে, কাজেই আমাদের কমপিউটারে নামটা পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, তার নামে কখনও কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড ফাইল করা হয়নি। ব্যাপারটা কী বলো তো? তুমি তার সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছ কেন?'

একটা ঢোক গিলে রানা বলল, 'বলছি, সার...' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো গল্পটা বলে গেল ও, ট্রেনজার্নির একটা অংশ ছাড়া কিছুই বাদ দিল না।

রানার কথা শুনে ধীরে ধীরে রাহাত খানের চোখে-মুখে শান্ত একটা ভাব ফুটে উঠল। আগাগোড়া সবকিছু গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তিনি, মাথা ঝাঁকালেন।

'হ্যাঁ,' অবশেষে বললেন বৃদ্ধ, 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, আসলে বলা উচিত ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ড, এই লোককেই সন্দেহ করছে।

আমাদের ইন্টেলিজেন্সও বলছেঃ বাংলাদেশের একশো টন সোনা গায়েব করে দেয়ার পিছনে রয়েছে এই লোক। এই ফাইলটায় একবার চোখ বুলিয়ে নাও, তার সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাবে।' সামনে পড়ে থাকা ফাইলটা রানার দিকে ঠেলে দিলেন তিনি।

ফাইলটা সিধে করে নিয়ে খুলল রানা। পড়ছে।

বাবার নাম শাহ্ মির্জা গোলাম রসুল। পেশায় লোকটা সেকরা ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বহু খুন-খারাবি করেছে। ঢাকার তাঁতিবাজারে হিন্দুদের ফেলে যাওয়া কয়েকটা জুয়েলারির দোকান দখল করে। তবে বাতাস ঘুরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে অক্টোবর মাসের শেষ দিকে সপরিবারে করাচিতে পালিয়ে যায়। তার একমাত্র সন্তান গালিবের বয়স তখন মাত্র পাঁচ।

গালিবের বাবা পাকিস্তানে গিয়ে সুবিধে করতে পারেনি। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করলেও, অবসর সময়ে ছোট একটা দোকানে নিজের পাশে বসিয়ে সোনার অলঙ্কার বানানো শেখায়। পঁচাত্তর সালে খুন হয় সে, ঢাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া আরেক রাজাকারের হাতে। চুরাশি সালে, আঠারো বছর বয়সে, বাপের দখল করা জুয়েলারির দোকানগুলো ফিরে পাবার আশায় ভারত হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে গালিব।

তবে দোকানগুলো ফেরত পায়নি। ওগুলোর দখল না পেলেও, তাঁতিবাজারের স্বর্ণবণিকদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলে সে। কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষ সোনার কারিগর আর চোরাই সোনার বিশ্বস্ত বাহক হিসাবে নাম হয় তার। বড় বড় মহাজনদের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে ভারতে আসা-যাওয়া শুরু করে গালিব। শুরু হয় গোল্ড স্মাগলিং।

নিত্য নতুন কৌশলে সোনা আনে গালিব, ফলে তার চালান আজ পর্যন্ত কখনও ধরা পড়েনি। পাঁচ বছর পরে দেখা গেল বিস্ময়কর সাফল্য পেয়েছে সে। দেশের এমন কোন সুপার মার্কেট

নেই যেখানে নামে-বেনামে একাধিক জুয়েলারির দোকান নেই গালিবের।

পরবর্তী দু'বছরে অন্যান্য আরও অন্তত বিশটা ব্যবসাতে বিনিয়োগ করল গালিব। বাংলাদেশে গ্যাস আবিষ্কার আর উত্তোলনে যে-সব বিদেশী কোম্পানি কাজ করছে, সে-সব কোম্পানির প্রচুর শেয়ার কেনা আছে তার।

তবে সোনার ব্যবসা ছাড়ল না সে, সেটাকে বরং আরও বড় করে তুলল। ভারত আর ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যবসাতে মোটা পুঁজি খাটাচ্ছে। সেই সূত্রে এই দুই দেশের নাগরিকত্ব আর পাসপোর্টও পেয়েছে। সামুদ্রিক জাহাজের একটা বহর আছে তার, কোম্পানির নাম গালিব ওয়াটার লাইন্স। দশটা বোয়িং আর আটটা ফকার নিয়ে একটা এয়ারলাইন্সও আছে, নাম গালিব এয়ারলাইন্স; ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে উপমহাদেশে আসা-যাওয়া করে।

পড়া শেষ হতে ফাইলটা বন্ধ করল রানা।

'কী বুঝলে?' জানতে চাইলেন বস্।

'শুধু যে বড় মাপের ক্রিমিনাল তা নয়, মানসিকভাবেও বোধহয় অসুস্থ,' বলল রানা।

'এবার বলছি তোমার কাজটা কী হবে,' বললেন রাহাত খান। 'আমরা জানতে পেরেছি আমেরিকা আর কানাডার কয়েকটা ব্যাঙ্কে সৌবর্ণ গালিবের কয়েকশো টন সোনা জমা আছে। ওই সোনার দাম প্রায় দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই সোনার একটা অংশ আমাদের। তোমার অ্যাসাইনমেন্ট হলো, আমাদের একশো টন সোনা কিংবা আড়াই বিলিয়ন মার্কিন ডলার ফিরিয়ে আনা।'

রানা অনুভব করল ওর মাথাটা হঠাৎ চক্কর দিচ্ছে। 'কিন্তু, সার, তা কী করে সম্ভব! অন্যের গচ্ছিত সোনা ব্যাঙ্কগুলো আমাকে দেবে কেন?'

এবার রাহাত খান হাসলেন। 'কেন দেবে কীভাবে দেবে, এটা

তুমি আমার চেয়ে ভাল বুঝবে, রানা। কাজে নামার পর চিন্তা করলেই পেয়ে যাবে রাস্তা।'

রানার মাথা ঘোরা বন্ধ হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে খুলে গেছে চোখও। 'হাতে-নাতে ধরে তার অপরাধ প্রমাণ করতে হবে, তারপরে তাকে দিয়ে কয়েকটা চেক লিখিয়ে নিতে হবে?'

'হ্যাঁ, যে কাজ এরই মধ্যে একবার তুমি করেছ।'

'জী, সার, বুঝেছি।' এবার উঠতে চাইছে রানা। ভাবছেঃ যাই, দেশের একটা শত্রুকে শায়েস্তা করে আসি।

হঠাৎ ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন বস্। 'জুয়ায় জেতা প্রায় দশ হাজার ডলার। কী করেছ টাকাটা?'

'ওই মেয়েটিকে দিয়েছি, সার।'

'তা-ই? আমাদের বিসিআই কল্যাণ ফান্ড কী দোষ করল?'

'দুঃখিত, সার।' প্রসঙ্গটা নিয়ে তর্ক করতে প্রস্তুত নয় রানা।

'হুম।' মেয়েদের সঙ্গে রানার বেশি মেলামেশা কখনওই অনুমোদন করেননি রাহাত খান। 'ঠিক আছে, আমার আর কিছু বলার নেই তোমাকে। বিস্তারিত সব মিস্টার লংফেলোর কাছ থেকে জানতে পারবে। হ্যাঁ, সৌবর্ণ গালিব লোকটা সম্ভবত একটা সাইকোলজিকাল কেসও, একটু সাবধানে থেকো। গত বছরও সরকার তার কাছ থেকে একশো কোটি টাকার কাছাকাছি আয়কর পেয়েছে। ঢাকা ক্লাবে তার সঙ্গে একবার আমি ব্রিজ খেলেছি বলে অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। যাই হোক, ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ড তাকেই ধরতে চাইছে। এখন থেকে তুমিও, মাই বয়।'

'জী, সার,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা।

চার

লন্ডন, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার।

বিএসএস চিফ মারভিন লংফেলোর চেম্বার।

হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করে কখন পৌঁছাবে জানিয়ে দিয়েছে রানা, ফলে ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ডের একজন কর্মকর্তাকে নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছেন বিএসএস চিফ। হ্যান্ডশেক আর কুশল বিনিময়ে কিছুটা সময় ব্যয় হলো; বসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে রানা যেমন সমীহ করে ভদ্রলোককে, তিনিও অত্যন্ত স্নেহ করেন ওকে। প্রয়োজনে যেমন সাধ্যমত সাহায্য করেন, তেমনি সাহায্য চাইতেও দ্বিধা করেন না।

আরব আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার অন্যায় যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার যতই সায় দিক আর সাহায্য করুক, ব্রিটেনের বহু মানুষ ব্যাপারটা সমর্থন করে না, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মারভিন লংফেলো। সারাটা জীবন মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছেন, ধর্মীয় গোঁড়ামির ঘোর বিরোধী, গায়ের রঙ দিয়ে মানুষ বিচার করেন না। আরও নানা গুণের অধিকারী ভদ্রলোক, এবং কারও মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলে তার গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন। সেজন্যই রানা তাঁর এত প্রিয় হতে পেরেছে।

'এসো, মাই বয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' প্রথমেই কাজের কথায় চলে এলেন মারভিন লংফেলো। ইঙ্গিতে ডেস্কের এদিকটায়, রানার পাশে বসা ভদ্রলোককে দেখালেন। 'ইনি আমাদের ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ডের রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের হেড, কর্নেল

উইলিয়াম পাউন্ড। উনি তোমাদের হাইজ্যাক হওয়া সোনা সম্পর্কে প্রায় সবই জানেন। মিস্টার পাউন্ড, মাসুদ রানা; আপনাকে আগেই জানিয়েছি, বিএসএস-এর একজন উপদেষ্টা ও শুভাকাঙ্ক্ষী।'

হ্যান্ডশেক আর হাউ-ডু-ইউ-ডু করল রানা আর উইলিয়াম পাউন্ড।

'বিএসএস-এর একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টার সঙ্গে বিষয়টার গোপনীয়তা নিয়ে আলোচনা করাটাকে আমি বাহুল্য মনে করছি,' শুরু করলেন কর্নেল পাউন্ড। 'সরাসরি প্রসঙ্গে চলে আসি। সোনা। কিছু জানেন, প্লিজ?'

'দেখলে চিনতে পারি।'

'সোনার মজা হলো, দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্গম গ্রামটিতেও চলবে ওটা। আর যেটা মনে রাখতে হবে, সোনা আসলে আনট্রেইসেবল। সোনার মোহরে কোনও সিরিয়াল নম্বর নেই। গোল্ড বার-এ যদি কোন চিহ্ন কিংবা দাগ দেয়াও হয়, সহজেই তা মুছে ফেলা যায়, গলিয়ে নতুন বার তৈরি করা যায়। ফলে সোনা যখন দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সেটা কোত্থেকে এল বা কোথাকার সোনা কোথায় যাচ্ছে তা জানা প্রায় অসম্ভব। ইংল্যান্ডের কথাই ধরুন, আমরা শুধু আমাদের ব্যাঙ্কগুলোর ভল্টে যে সোনা আছে সেটার হিসাব নিতে পারি, এবং আন্দাজ করে বলতে পারি জুয়েলারি আর বন্ধকী ব্যবসাতে কী পরিমাণে সোনা জমা আছে।

'কত সোনা জমা আছে তা সব দেশকেই জানতে হয়, কারণ অবলম্বন হিসেবে সোনাকে পাওয়া গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে কারেন্সির গুরুত্ব থাকে। কী পরিমাণ সোনা কারেন্সিকে ব্যাকিং দিচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে টাকা, ডলার বা পাউন্ডের শক্তি।

'আমার মূল কাজ হলো, মিস্টার রানা,' কর্নেল পাউন্ডের চোখ দুটো অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'ইংল্যান্ড থেকে কোনও সোনা বেরিয়ে যাচ্ছে কিনা দেখা। যদি কোনও ফুটো দেখতে পাই, যেটা দিয়ে সোনা বেরিয়ে যাচ্ছে, দ্রুত সেটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করি,

চেষ্টা চালাই সিআইডি গোল্ড স্কোয়াডকে দিয়ে দায়ী লোকজনকে অ্যারেস্ট করতে। মুশকিল হলো, মিস্টার রানা,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকালেন কর্নেল পাউন্ড, 'সোনা আকৃষ্ট করে বড় মাপের মেধাবি ক্রিমিনালদের। ওদেরকে ধরা সত্যিই খুব কঠিন।

'সোনার এত আকাল কেন? এর জবাব দেয়া কঠিন নয়। প্রতিদিন পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ জন্ম নিচ্ছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু লোক সোনা মজুদ করবে। কারেন্সির ওপর তাদের আস্থা থাকবে না, মোহর কিনে বাগানে, বালিশের ভিতর কিংবা বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখবে। আরও কিছু লোকের সোনা দরকার হবে দাঁত বাঁধানো বা ফিলিং করার জন্যে। অল্প কিছু লোক সামান্য অলঙ্কারও পরবে। ফলে এই নতুন লোকগুলো প্রতি বছর বাজার থেকে কয়েক টন সোনা তুলে নিয়ে যাবে। এ ছাড়াও অনেক শিল্পকারখানার জন্য সোনার তার, সোনার প্লেট ইত্যাদি দরকার পড়ে।

'আরও একটা মুশকিল হলো, চাহিদা আছে, অথচ নতুন সাপ্লাই প্রায় না থাকারই মত। সব খনিই প্রায় খালি হয়ে গেছে, নতুন কোনও খনি আর পাওয়াও যাচ্ছে না।

'সোনার এত গুণ, তবে এর দুটো ত্রুটিও আছে। সোনা যথেষ্ট শক্ত নয়, ফলে দ্রুত ক্ষয়ে যায়। ঘষা খেয়ে কাপড়ের সঙ্গে আর শরীরের ঘামের সঙ্গে রয়ে যায়। প্রতি বছর দুনিয়ার মজুদ এভাবে কমেও যাচ্ছে। অপর ত্রুটিটা হলো, সোনা কেউ ছাড়তে চায় না, কেনা সোনা খুব কমই আবার বাজারে ফিরে আসে।

'এবার আমরা স্মাগলিং প্রসঙ্গে আসি। প্রথমে কাল্পনিক একটা হিসেব কষি। ধরুন, আপনার কাছে দুই কেজি সোনা আছে, একজোড়া সিগারেটের প্যাকেট আকৃতির। ওটা চব্বিশ ক্যারাট সোনা। এখন, আইনসম্মত ভাবে ওটা আপনি ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ডের কাছে বেচতে চান। বার দুটোর দাম পাবেন আপনি সাড়ে ষোলো হাজার ডলার।

'কিন্তু আপনি লোভী। আপনার এক বন্ধু আছে যে বাংলাদেশে যাচ্ছে, কিংবা কোনও এয়ারলাইন্সের ক্রু বা পাইলটের সঙ্গে খাতির আছে আপনার। আপনাকে শুধু সোনার ওই বারকে পাতলা পাতে রূপান্তর করতে হবে। কাজটা করে দেয়ার মত লোক পেতে খুব একটা সমস্যা হবে না। তাসের মত পাতলা হবে ওগুলো, সুতি একটা বেল্টে অনায়াসে ভরতে পারবেন, তারপর কিছু কমিশনের বিনিময়ে সেটা কোমরে পরতে দেবেন বন্ধুকে।

আপনার বন্ধু ঢাকায় প্লেন থেকে নেমে ইসলামপুর কিংবা বায়তুল মোকাররমের সোনার বাজারে চলে যাবেন। দুই কেজি ওজনের ওই সোনার বাজারদর পাবেন তিনি কমবেশি ছত্রিশ লক্ষ টাকা– পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার। তারমানে শতকরা তিনশো ভাগ প্রফিট করবেন আপনি।'

এই ভদ্রলোক যখন ঢাকার সোনার বাজার সম্পর্কেও সবরকম খবর রাখেন, রানা বুঝল: কী বলছেন, সে-সম্পর্কে এই লোকের টনটনে জ্ঞান আছে, কোনও ফাঁকিজুকি নেই।

'কী মাত্রায় এই চোরাচালান হচ্ছে?' জানতে চাইল রানা।

'অনেক বেশি মাত্রায়, বিপুল পরিমাণে। গত বছর ইন্ডিয়ান কাস্টমসের হাতে ধরা পড়েছে বিশ টনের কাছাকাছি সোনা, ধরা না পড়ার পরিমাণ অবশ্যই এর বহুগুণ বেশি। কমপাসের প্রতিটি পয়েন্ট দিয়ে সোনা ঢুকছে উপমহাদেশে।'

'আচ্ছা। আমার ওই সোনার বার আমি কি অন্য কোথাও বেশি দামে বেচতে পারব?'

'প্রায় সব দেশেই কিছু না কিছু লাভ পাবেন। যেমন ধরুন, সুইটজারল্যান্ডে। তবে ইন্ডিয়ার মত অত লাভ কোথাও হবে না।'

'বেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হলো,' বলল রানা। 'এবার আপনাদের সমস্যাটা যদি ব্যাখ্যা করেন।' ও আশা করছে সৌবর্ণ গালিব সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে পারবে।

কর্নেল পাউন্ডের চোখ দুটো হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। 'শাহ

সৌবর্ণ গালিব নামে এক বাঙালী ব্যবসায়ী। বারো বছর আগে ইংল্যান্ডে আসেন ভদ্রলোক। এটা সেটা নানা ধরনের ব্যবসাতে বিনিয়োগ করেন। ভদ্র, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কেতাদুরস্ত, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; কাজেই নাগরিকত্ব আর পাসপোর্ট পেতে কোনও সমস্যা হয়নি।

'বিভিন্ন ব্যবসাতে পুঁজি খাটালেও, পেশায় ভদ্রলোক আসলে একজন স্বর্ণকার। নাগরিকত্ব পাবার পর থেকে এই দেশের ছোটখাট পনশপগুলো কিনতে শুরু করেন। প্রতিটি দোকানের নাম বদলে রাখা হয় "সুবর্ণ"। এটা তাঁর ডাক নাম। এক সময় দেখা গেল গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে এরকম এক হাজার দোকানের মালিক হয়ে বসেছেন সৌবর্ণ গালিব। পনশপ বন্ধকী ব্যবসা, গালিবের দোকানে বন্ধকের কারবার সামান্যই হয়, লোকজনের কাছ থেকে টাকা বা জুয়েলারির বিনিময়ে সোনা সংগ্রহ করা হয়। তবে ন্যায্য দাম দেয় তাঁর কর্মচারীরা। এই সব দোকানে বসে তাঁর কর্মচারীরা একনাগাড়ে সোনা কিনছে, আর বেচছে হালকা জুয়েলারি।

'বেশিরভাগ সময় লন্ডনেই থাকেন তিনি। প্রতিমাসে একবার করে দোকানগুলো ভিজিট করেন, সোনা কালেক্ট করার জন্যে।

'পুরানো সোনা বলতে বোঝায় লকেট, আঙটি, মেডেল ইত্যাদি। এগুলোকে সামান্য, ছোটখাট জিনিস বলবেন। আসলেও তাই। কিন্তু একটা দোকান যদি হপ্তায় গড়ে এরকম ছোট চল্লিশটা আইটেম কেনে, এক হাজার দোকান কত কিনছে? মাসে চল্লিশ হাজার আইটেম।

'এরকম ছোট আকৃতির জিনিসের হিসেব রাখা, সেগুলো কোথায় জড়ো করা হচ্ছে, গলানো হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি জানা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। লন্ডনের রিকালভার এলাকায় তাঁর বাড়ি আছে, বাড়ির সঙ্গে আছে "সুবর্ণ অ্যালয় রিসার্চ ফ্যাক্টরি"। সেখানে কাজ করে একদল কোরিয়ান। বিদেশী কোনও ভাষাই জানে না লোকগুলো, কাজেই সিকিউরিটি রিস্কও নয় তারা।

'বিরাট একটা রোলসরয়েস আর্মার্ড কার আছে গালিবের। ওই সিলভার গোস্টটা বানানো হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রেসিডেন্টের জন্যে, ডেলিভারি নেয়ার আগেই খুন হয়ে যান তিনি।

'গত দশ বছরের রেকর্ড ঘেঁটে দেখা গেছে তাঁর সমুদ্রগামী জাহাজ বহরের অন্তত দুটো জাহাজ প্রতি বছর ইংল্যান্ড থেকে ভারতে যাচ্ছে। নিজের জাহাজে সোনা স্মাগলিং করার সুবিধা অনেক। তবে তা তিনি করছেন কিনা আমরা জানি না। সার্চ করা হয়েছে, পুলিশ কিংবা কাস্টমস অফিসাররা কিছুই পায়নি। তাঁর এয়ারলাইন্সের প্লেন প্রতি হপ্তায় তিনবার যাচ্ছে করাচি, মুম্বাই, দিল্লি, কোলকাতা আর ঢাকায়।' মাথা নাড়লেন কর্নেল পাউন্ড। 'তাতেও পাওয়া যায়নি কিছু।'

'পুরানো সোনা কিনছেন, মিস্টার গালিবকে সন্দেহ করার এটাই কি একমাত্র কারণ?' জানতে চাইল রানা।

'না। সে প্রসঙ্গে আসছি। বছর পাঁচেক আগের কথা। তাঁর একটা পুরানো জাহাজ ভারত থেকে ফেরার পথে ডুবে যেতে বসেছিল। আমাদের নৌ-পরিবহন সংস্থার ইন্সপেকশন টিম পরীক্ষা করে সমুদ্রে চলাচলের অযোগ্য ঘোষণা করল সেটাকে। আগেই বলেছি, মিস্টার গালিব আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি কোনও রকম দেন-দরবার না করে জাহাজটা পানির দরে একটি স্যালভেজ কোম্পানির কাছে বেচে দিলেন।

'এই কোম্পানি জাহাজটা ভাঙার সময় দেখল হোল্ডের ভেতরে, কাঠের পাটাতনে ব্রাউন রঙের পাউডার লেগে রয়েছে। জিনিসটা কী জানার জন্য পাউডারের খানিকটা নমুনা স্থানীয় কেমিস্টের কাছে পাঠানো হয়। কেমিস্ট ওটাকে সোনা বলায় বিস্মিত হয় তারা। ফরমুলা নিয়ে বকবক করব না, শুধু এটুকু বলি যে হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণে ফেলে সোনাকে গলিয়ে ফেলা যায়। তারপর, রিডিউসিং এজেন্ট সালফার ডাই অক্সাইড ও অকস্যালিক অ্যাসিডের সাহায্যে ব্রাউন রঙের পাউডারে

রূপান্তর করা যায়। এই পাউডারকে এক হাজার সেন্টিগ্রেড তাপে গলিয়ে আবার সোনার বার তৈরি করতে পারবেন। ক্লোরিন গ্যাসের ওপর একটু নজর রাখতে হয়, তা ছাড়া এটা সহজ একটা পদ্ধতি।

'ব্যাপারটা পুলিশ আর সিআইডি জানল। আমার কাছেও রিপোর্ট এল, গালিব শিপিং লাইন্সের প্রতিটি ইন্ডিয়া ট্রিপের কার্গো ক্লিয়ারেন্স পেপারের একটা করে কপি সহ। তাতে দেখা গেল, ইংল্যান্ড থেকে কার্গো হিসেবে মিনারেল ডাস্ট রফতানী করছেন মিস্টার গালিব। এই মিনারেল ডাস্ট সার তৈরিতে অল্প পরিমাণে লাগে।

'গোটা ব্যাপারটা পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল। পুরানো সোনা কিনে ব্রাউন পাউডার বানাচ্ছেন গালিব, তারপর সারের উপাদান হিসেবে পাচার করছেন ভারতে। কিন্তু আমরা কি তাঁকে ধরতে পেরেছি? পারিনি। কারণ ওই ঘটনার পরে বহুবার মাঝ সাগর থেকে তাঁর জাহাজ ফিরিয়ে এনে ব্রাউন পাউডার পরীক্ষা করা হয়েছে। একটাতেও সোনা পাওয়া যায়নি।'

'তারমানে গালিব তার কৌশল বদলেছে,' বলল রানা। 'অন্য কোনও ভাবে পাচার করছে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই,' জোর দিয়ে বললেন কর্নেল পাউন্ড। 'আমরা তার ফ্যাক্টরিতে গোল্ড স্কোয়াড পাঠিয়েছি। মিনিস্ট্রি অভ লেবার-এর তকমা এঁটে এজেন্টরা গিয়ে বলেছে: দুঃখিত, সার, রুটিন ইন্সপেকশন। ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কিনা দেখতে এসেছি। জবাবে বলা হয়েছে: আসুন, আসুন! মিস্টার গালিবের কাছ থেকে রীতিমত জামাই আদর পেয়েছে স্কোয়াডের সদস্যরা। যাই হোক, তন্নতন্ন করে খুঁজেও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। ফ্যাক্টরিতে সস্তাদরের অ্যালয় তৈরি করছে কোরিয়ান কারিগররা। ছিটেফোঁটা সোনা অবশ্যই পাওয়া গেছে, কিন্তু তা তো পাওয়া যাবেই; মিস্টার গালিব একজন জুয়েলার। কাজেই খালি হাতে, হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে আমার গোল্ড স্কোয়াডকে।'

'তারপর?'

'সেই থেকে তার ফাইলটা খোলা রেখেছি আমি,' বললেন কর্নেল পাউন্ড। 'আর দুনিয়ার সমস্ত ব্যাঙ্কে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছি। কিন্তু ওকে আটকাবার কোনও কায়দা বের করতে পারছি না। পাঁচ বছর সময় লেগেছে আমার, মিস্টার রানা, শুধু এটা জানতে যে, শাহ সৌবর্ণ গালিব ইংল্যান্ডের সেরা দশজন ধনীর একজন। জুরিখ, মন্ট্রিয়ল, পানামা ও নিউ ইয়র্কে তার যে সোনা জমা আছে তার দামই দশ থেকে সাড়ে বারো বিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিউ ইয়র্কের একটা ব্যাঙ্কে গিয়ে আমি তার সোনার বার দেখেও এসেছি। দুই দেশের ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে এ-ধরনের সহযোগিতা বিরল কোন ঘটনা নয়– অবশ্য গোটা ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়।

'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, চিত্রশিল্পীদের মত মিস্টার গালিবও তার হাতের কাজে সই না করে থাকতে পারেননি। জিনিসটা দেখতে চাইলে মাইক্রোস্কোপ লাগবে, তবে তার প্রতিটি গোল্ড বার-এর কোথাও না কোথাও SG খোদাই করা আছে। ব্যস, এইটুকুই আপনাকে আমার জানাবার ছিল।'

মৃদু হেসে রানা বলল, 'বেশ। আমরা সোনা উদ্ধারের জন্যে ওর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহের ব্যাপারে আপনাদেরকে সাহায্য করব। এবার আমার জানার বিষয় হলো, মিস্টার পাউন্ড, আপনার জানা আছে, আমাদেরও একশো টন সোনা চুরি করেছে এই লোক। কতটা সোনা উদ্ধার করা যাবে, কিংবা আদৌ যাবে কি না আমরা জানি না। তবে যে পরিমাণ সোনাই উদ্ধার হোক, বাংলাদেশ কী পাবে না পাবে সেটা আগেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া হয়ে উচিত নয়?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই উচিত,' উইলিয়াম পাউন্ড নন, তাঁর হয়ে জবাব দিলেন মারভিন লংফেলো। 'তোমার কোনও প্রস্তাব আছে, রানা?'

'বস্ আমাকে বলে দিয়েছেন, আমরা আমাদের সোনাটা ফেরত পেলেই খুশি।'

'এক কাজ করা যায়,' বললেন পাউন্ড, 'দুশো টন পর্যন্ত সমান ভাগে ভাগ করে নেব আমরা, তার বেশি যা হবে, সব ইংল্যান্ডের।'

'ফেয়ার এনাফ,' বলল রানা।

'ঠিক আছে, ওঁর সঙ্গে ফোনে যোগোযোগ করো তুমি,' বললেন বিএসএস চিফ, ইঙ্গিতে ডেস্কের সবুজ টেলিফোনটা দেখালেন রানাকে।

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল রানা। সরাসরি ডায়াল করে বিসিআই চিফ রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলল। 'সার, এমআরনাইন। মিস্টার মারভিন লংফেলোর সঙ্গে কথা বলুন, প্লিজ।' হাতের রিসিভারটা বাড়িয়ে ধরল ও।

দুই বন্ধু প্রথমে কুশল বিনিময় করলেন। তারপর প্রসঙ্গটা তুললেন লংফেলো। 'উদ্ধার করা সোনার ভাগ-বাটোয়ারাটা কীভাবে হবে, সেটা এখনই ঠিক করে ফেলা ভাল বলে মনে করছি আমরা। তুমি কী মনে করো?'

'উত্তম প্রস্তাব,' অপরপ্রান্ত থেকে জবাব দিলেন রাহাত খান। 'বেশি দরকার নেই, আমাদের হারানো সোনা আমরা ফিরে চাই।'

'হ্যাঁ, বলেছে রানা। অবশ্যই ফেরত পাবে–ওয়ার্ড অভ অনার,' কথা দিলেন মারভিন লংফেলো। ভাগাভাগির হারটাও জানালেন তিনি। বললেন, 'লিখিত দেবে ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ড।

'ওকে, থ্যাঙ্কস, মারভিন,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন রাহাত খান।

কর্নেল পাউন্ড বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর বিএসএস চিফ মারভিন লংফেলোর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ আলাপ করল রানা। সৌবর্ণ গালিবের সঙ্গে কীভাবে ওর পরিচয় হয়েছে জানাল তাঁকে।

লংফেলো বললেন, 'লোকটার সাত-পাঁচ আমরা কেউ বুঝতে পারছি না, রানা, ওর আর্মার ভেদ করতে পারছি না কিছুতেই। সেজন্যেই ভাবলাম, একজন বাঙালী হয়তো নাক গলাতে পারবে

আমরা তোমার ওপর ভরসা করছি, মাই বয়। কোত্থেকে, কীভাবে শুরু করবে, কিছু ভেবেছ?'

'জুয়া খেলায় তাকে একটা মার দিয়েছি,' বলল রানা। 'জবাবে বলেছেঃ আমার সঙ্গে গলফ খেলতে চায়। ভাবছি তাই খেলব।'

'তোমার কাভার স্টোরি কী হবে?'

'এখনও ভাবিনি কিছু, মিস্টার লং ফেলো।' বলল রানা। 'তবে বিনয়ের সঙ্গে তার কাছে চাকরি চাইলে কোনও কাজ হবে না। শুধু নিজের চেয়ে কঠিন আর স্মার্ট লোককে সমীহ করে সে। গার্মেন্টস-এর বাজার তৈরির কাজটা ছেড়ে দেবার কথা বলতে পারি।'

'হুম। সাবধানে, মাই বয়, কেমন? তুমি তার সাম্রাজ্য কেড়ে নিতে যাচ্ছ।'

মৃদু হেসে বিদায় নিল রানা।

পাঁচ

বিএসএস-এর কার পুল থেকে পাওয়া টয়োটা টারবো টি-বার স্পোর্টস কার চালাচ্ছে রানা। রচেস্টার আর চ্যাটাম হয়ে সাবধানে এগোচ্ছে, সকাল বেলার ট্র্যাফিক জ্যামে পড়ে গতি শ্লথ।

জ্যাম থেকে বেরিয়ে এ-টু হাইওয়ে ধরল ও, গন্তব্য স্যান্ডউইচ। তবে স্যান্ডউইচে যাওয়ার পথে রিকালভার-এ একবার থামবে ও, সৌবর্ণ গালিবের বাড়ি আর ফ্যাক্টরিটা একবার দেখতে চায়। সেজন্যই এ-টোয়েনটির বদলে এ-টু ধরেছে ও। টেমস নদীর তীরের ওদিকটা পরিত্যক্ত ও নির্জন এলাকা, বোধহয় সেজন্যই আস্তানা হিসাবে পছন্দ করেছে গালিব।

তারপর ব্রিজ পেরিয়ে র‍্যাম গেটে পৌঁছাতে হবে রানাকে, সানফ্লাওয়ার ইন-এ ব্যাগ রেখে লাঞ্চ খাবে, ওখান থেকে পৌঁছাবে স্যান্ডউইচে।

কুয়াশা ঢাকা লন্ডনকে পিছনে ফেলে এল রানা, রাস্তার দু'পাশে মাইলের পর মাইল এখন শুধু ফলের বাগান। ওর বাম দিকে, বেশ দূরে, টেমস নদী। নদীতে প্রচুর ট্র্যাফিক: লম্বাটে ট্যাঙ্কার, ট্রলার, স্টিমার আর বার্জ পিছন থেকে ভেসে আসা হর্ন-এর আওয়াজ শুনে স্পোর্টস কার একপাশে সরিয়ে আনল রানা। একটা পুরানো ফোর্ড পপুলার সাঁ করে পাশ কাটাল। পূর্ব এশিয়ার লোক, সরু চোখে রানাকে একবার দেখল ড্রাইভার।

দু'ঘণ্টা পর রিকালভার লেখা সাইনপোস্টটা দেখতে পেল রানা, নীচে একটা প্রাচীন মনুমেন্ট আঁকা। ওটা রিকালভার চার্চ-এর ছবি। গতি কমাল ও, তবে থামল না। ঘুরঘুর করা চলবে না। চোখ খোলা রেখে এগোচ্ছে। নদীর তীর এদিকে এতটাই ফাঁকা যে এখানে কোনও ট্রলার ভিড়িয়ে কিছু তুলতে বা নামাতে গেলে কারও না কারও চোখে ধরা পড়বার ভয় আছে। গালিব বোধহয় র‍্যামসগেট ব্যবহার করে। শান্ত ছোট একটা বন্দর। কাস্টমস ও পুলিশ সম্ভবত ফ্রান্স থেকে শুধু চোরাই ব্র্যান্ডি আসে কিনা সেইদিকে নজর রাখে।

রাস্তা ও তীরের মাঝখানে বেশ কিছু গাছপালা দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে বাড়ির ছাদ ও একটা বড়সড় ফ্যাক্টরির চিমনি। সেটা থেকে ধোঁয়া কিংবা বাষ্প, কিছু একটা বেরুচ্ছে। এটাই বোধহয়। খানিক পর গেটটা দেখতে পেল রানা, ভিতরে লম্বা পাকা রাস্তা। গেটের পাশে দেয়ালে সাইনবোর্ড, তাতে বড় বড় হরফে লেখা "সুবর্ণ অ্যালয়"। নীচে ছোট হরফে বলা হয়েছে: ব্যবসায়িক প্রয়োজন ছাড়া ভিতরে প্রবেশ নিষেধ।

ধীর গতিতে গেটটাকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। এখানে তেমন কিছু আর দেখবার নেই ডান দিকে বাঁক নিল ও। ম্যানসটন

মালভূমি পার হয়ে র‍্যামসগেটের দিকে যাচ্ছে।

বেলা বারোটায় সানফ্লাওয়ারে উঠল রানা। একেবারে উপরতলায়, দুই কামরার ছোট একটা সুইট। সুটকেস থেকে অল্প দু'একটা জিনিস বের করল ও। বার-এ নেমে এসে খানিকটা হুইস্কি নিয়ে বসল। পনেরো মিনিট পর আবার রাস্তায় নামল ও, স্পোর্টস কার নিয়ে স্যান্ডউইচের রয়্যাল সেইন্ট মার্কস-এ যাচ্ছে।

নিজের ক্লাবগুলো প্রফেশনাল'স শপ-এ নিয়ে এল রানা। ওঅর্করুমে ঢুকে দেখল ডেভিড কপারফিল্ড একটা ড্রাইভার-এ নতুন গ্রিপ লাগাতে ব্যস্ত। ড্রাইভারও গলফ ব্যাটই, টি শট-এ ব্যবহার করা হয়।

'হ্যালো, ডেভিড।'

ঝট করে মুখ তুলল নিগ্রো প্রফেশনাল এক মুহূর্ত পর কুচকুচে কালো মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটল। 'সার... মিস্টার রানা... আপনি!' বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়াল সে, রানার বাড়ানো হাতটা খপ করে ধরে ঝাঁকাল। 'বোধহয় পাঁচ বছর পর এলেন, সার হাত দুটো ক্লাব ধরার ভঙ্গিতে এক করে বলে আঘাত করার অভিনয় করল। 'হাতের সেই লম্বা মার এখনও আছে তো?'

'তা আছে, ডেভিড। সুযোগ পেলেই খেলি। তোমার বউ... সিন্থিয়া কেমন আছে? আর ছেলেটা, রকফেলার?'

'সবাই ভাল, সার। রক তো গত বছর কেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স আপ হয়েছে। ওঅর্কশপে আরেকটু কম সময় দিয়ে কোর্সে থাকতে পারলে এ বছর ও-ই জিতবে।'

'বাহ্, খুশি হলাম,' বলল রানা, নিজের ক্লাবগুলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল। 'খেলার সুযোগ পাওয়া যাবে, ডেভিড?'

পিছনের জানালা দিয়ে ফ্ল্যাগ পোল-এর চারধারে, পার্কিং এরিয়ায় চোখ বুলাল প্রফেশনাল। মাথা নাড়ল সে 'মনে হয় না, সার আজকাল হপ্তার মাঝামাঝি সময়টায় তেমন কেউ আসেন না।'

'তোমাকে পাচ্ছি তো?'

'দুঃখিত, সার। আমাকে আগেই বুক করা হয়েছে। একজন মেম্বার, সার। তাঁর ব্যাপারটা নিয়মিত। রোজ বেলা দুটোয়। মুশকিল হয়েছে, সার, রক ওই চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যে প্র্যাকটিস করতে কেন্ট-এ চলে যাওয়ায়। কী জঘন্য একটা ব্যাপার বলুন দেখি! এখন আমি কী করি! আপনি কতক্ষণ থাকছেন, সার?'

'বেশিক্ষণ না। ঠিক আছে, ভুলে যাও। আমি একজন ক্যাডি-কে সঙ্গে নিয়ে বলে বাড়ি মারব,' বলল রানা। 'কার সঙ্গে খেলছ তুমি, নাম কী ভদ্রলোকের?'

'ওহ্, ভদ্রলোকের নাম শাহ গালিব, সার।' ডেভিডকে ম্লান দেখাল।

'আচ্ছা, সৌবর্ণ গালিব! তাঁকে তো চিনি আমি। কদিন আগে আমেরিকায় পরিচয় হয়েছে।'

'আপনি চেনেন, সার?' সৌবর্ণ গালিবকে কেউ চেনে, এটা যেন ডেভিড বিশ্বাস করতে পারছে না। আরও কিছু জানবার জন্য সাবধানে রানাকে দেখছে সে।

'ভাল খেলেন?'

'মোটামুটি, হ্যাঁ, সার।'

'রোজ যখন খেলেন, নিশ্চয়ই খেলাটাকে খুব সিরিয়াসলি নেন ভদ্রলোক?'

'জী, ঠিক ধরেছেন, সার।' প্রফেশনাল-এর চেহারায় ফুটে ওঠা এই ভাব রানার পরিচিত। এর মানে হলো, বিশেষ একজন সদস্য সম্পর্কে ডেভিডের ধারণা ভাল নয়, তবে ক্লাবের আদর্শ কর্মচারী হিসাবে কথাটা আর কাউকে জানাতে চায় না সে।

নিঃশব্দে হাসল রানা। বলল, 'তুমি একটুও বদলাওনি, হে। আসলে বলতে চাইছ, আর কেউ তাঁর সঙ্গে খেলবে না। কারমাইকেলের কথা মনে আছে? এত ধীরগতিতে ইংল্যান্ডে বোধহয় আর কেউ কখনও খেলেনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার পিছনে

হাঁটতে হত তোমাকে। বলে ফেলো, গালিব সাহেবের ব্যাপারটা আসলে কী?'

হেসে উঠল প্রফেশনাল। বলল, 'বদলাননি, সার, আপনি। চিরকালই আপনি··· কী বলে··· অনুসন্ধানী মানুষ ছিলেন।' এক পা সামনে বাড়ল সে, গলার আওয়াজও নিচু করল। 'সত্যি কথা বলতে কি, সার, মিস্টার গালিব খেলায় কিছুটা কারচুপি করেন। বললেই আপনি বুঝবেন কীভাবে। ধরুন বল একটু নিচু জায়গায় পড়েছে। বলে আঘাত করার আগে বারবার ওটার পেছনের মাটিতে ক্লাবের মাথা ঠুকবেন তিনি। যেন সচেতন নন, এটা বোঝাবার জন্যে বলটার উদ্দেশে সারাক্ষণ বকবক করবেন। একটু পর দেখা যাবে আগের নিচু জায়গায় নেই বলটা, ইঞ্চিখানেক উঁচু হয়ে গেছে।'

কিছু বলল না রানা।

এখন আবার নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে ডেভিড কপারফিল্ডকে। 'তবে এটা স্রেফ গুজব, সার। আমি নিজে কখনও কিছু দেখিনি। মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। রিকালভারে তাঁর বাড়ি আছে। এক সময় ঘনঘন আসতেন। ইদানীং লন্ডনে থাকছেন বছরে কয়েক হপ্তা। ফোন করে জেনে নেন কেউ খেলতে চায় কিনা। কাউকে না পেলে আমাকে কিংবা রককে বুক করেন। আজ সকালেও ফোন করেছিলেন। জানতে চাইলেন কাউকে পাওয়া যাবে কিনা।' রানার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল সে। 'আপনি কি তাঁর সঙ্গে খেলতে চান, সার?'

'তা না হয় খেললাম। কিন্তু তোমার রোজগারের দিকটাও তো দেখতে হবে,' বলল রানা। প্রফেশনালের সঙ্গে খেলতে হলে নির্দিষ্ট একটা ফি দেওয়ার নিয়ম আছে। 'এক কাজ করলে কেমন হয়, তিনটে বল নিয়ে আমরা তিনজনই খেললাম?'

'মিস্টার গালিব তাতে রাজি হবেন না, সার। তিনি বলেন দুজনের বেশি হলেই খেলা স্লো হয়ে যায়। আমিও তাঁর সঙ্গে

একমত, সার। আর, সার, আমার ফি নিয়ে ভাববেন না। ওঅর্কশপে প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে, আজ বিকেলটা হাতে পেলে খুশিই হই আমি।' হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল ডেভিড। 'তিনি যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসবেন, সার। আমি আপনাকে একজন ক্যাডি যোগাড় করে দিচ্ছি। আমার কাজিন বোথাম-এর কথা মনে আছে আপনার?' হেসে উঠল সে। 'বোথাম সেই আগের মতই আছে। আপনাকে দেখে ভারি খুশি হবে।'

রানা বলল, 'ধন্যবাদ, ডেভিড। ভদ্রলোক কেমন খেলেন জানার আগ্রহ হচ্ছে। তবে ব্যাপারটা এরকম হলে ভাল হয়। তাঁকে বলো আমি একটা ক্লাব-এর অর্ডার দিতে এসেছি। পুরানো মেম্বার। আমার একটা নাম্বার ফোর উড স্পিয়ি দরকারও। আমাকে তাঁর কথা বলেছ, এটা তাঁকে না জানানোই ভাল। আমি তোমার ওঅর্কশপেই থাকি, তা হলে আমাকে বিব্রত না করে নিজের পছন্দের কথাটা বলতে পারবেন তোমাকে। এমন হতেই পারে যে আমাকে ভাল লাগল না, তোমার সঙ্গেই খেলতে চাইবেন। ঠিক আছে?'

'ভেরি গুড, মিস্টার রানা। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। ওই তাঁর গাড়ি আসছে, সার।' জানালার দিকে হাত তুলল ডেভিড। আধ মাইল দূরে উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা গাড়ি হাইওয়ে থেকে নেমে প্রাইভেট রোডে ঢুকল।

রাজকীয় ভঙ্গিতে সিলভার গোস্টটাকে ক্লাবের দিকে এগিয়ে আসতে দেখছে রানা। ড্রাইভিং সিটে বসা শোফারের মুখটা গোল। কালো সুট পরেছে সে, মাথায় কালো বোলার হ্যাট। চোখে পরেছে কালো রিমের ড্রাইভিং গগলস। তার পাশে দীর্ঘদেহী, সুদর্শন সৌবর্ণ গালিব শান্ত ভঙ্গিতে সিটে হেলান দিয়ে বসে আছে। অ্যাশ-কালারের শার্ট পরেছে সে।

গাড়িটা আরও এগিয়ে এল। দুই জোড়া চোখ ওঅর্কশপের জানালার ভিতর তাকিয়ে আছে, সরাসরি যেন রানার চোখে।

নিজের অজান্তেই ওঅর্কশপের আরও ভিতর দিকে সরে এল রানা। ব্যাপারটা খেয়াল করে আপন মনে হাসল ও। বেঞ্চ থেকে একটা ক্লাব তুলে নিল, ঝুঁকল, তারপর কাল্পনিক একটা বলের উদ্দেশে বিড় বিড় করে কিছু বলল।

'গুড আফটারনুন, কপারফিল্ড। সব রেডি?' স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, তবে কর্তৃত্বসুলভ। 'বাইরে একটা গাড়ি দেখলাম। কেউ খেলতে এল নাকি, হে?'

'ঠিক বলতে পারব না, সার। পুরানো মেম্বার, ক্লাব তৈরি করাতে এসেছেন। আপনি চান ভদ্রলোককে আমি জিজ্ঞেস করি, সার?'

'কে ভদ্রলোক? নাম কী তাঁর?'

রানার মুখে গম্ভীর হাসি। কান খাড়া করল, গালিবের প্রতিটি শব্দের সুর শুনতে চায়।

'ভদ্রলোকের নাম মিস্টার রানা, সার।'

একটু পর সাড়া পাওয়া গেল। 'রানা?' কণ্ঠস্বর বদলায়নি। কৌতূহলটা প্রকাশ করছে নম্র ভঙ্গিতে। 'কদিন আগে রানা নামে এক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর পুরো নামটা কী বলো তো?'

'মাসুদ রানা, সার।'

'ও, হ্যাঁ।' এবার বিরতিটুকু আগের চেয়ে লম্বা। 'তিনি কি জানেন আমি এখানে?' পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে গালিব।

'মিস্টার রানা ওঅর্কশপে আছেন, সার। হয়তো আপনার গাড়ির আওয়াজ পেয়েছেন,' বলল ডেভিড। রানা ভাবল: জীবনে একটিও মিথ্যে কথা বলেনি ডেভিড। আজও বলছে না।

'একটা সম্ভাবনা বটে।' গালিবের কণ্ঠস্বরে কোনও উত্থান-পতন নেই। ডেভিড কপারফিল্ডের কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়ার আশায় আছে সে। 'কী ধরনের গেম খেলেন এই ভদ্রলোক? তাঁর হ্যান্ডিক্যাপ কত?'

'অনেক বছর আগে আসতেন, ঠিক মনে নেই, সার।'

'হুম।'

রানা অনুভব করল, পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখছে গালিব। টোপটা সে গিলবে বলেই মনে হচ্ছে। নিজের ব্যাগটা টেনে নিয়ে ড্রাইভারটা বের করল, গ্রিপে একটুকরো গালা ঘষছে, ওকে যাতে ব্যস্ত দেখায় চাপ পড়ায় ওঅর্কশপের একটা বোর্ড প্রতিবাদ জানাল। আরও জোরে ঘষছে রানা, পিঠটা খোলা দরজার দিকে।

'আমাদের বোধহয় আগেও একবার দেখা হয়েছে,' দোরগোড়া থেকে ভেসে আসা গলার আওয়াজ– নিচু, মার্জিত।

কাঁধের উপর দিয়ে দ্রুত তাকাল রানা। 'মাই গড, আপনি আমাকে চমকে দিয়েছেন। আরে··· ' হঠাৎ চিনতে পারায় চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটল, 'আরে! মিস্টার গোলাম··· গালি··· ইয়ে, গালিব।' আশা করল, অভিনয়টা মাত্রা ছাড়াচ্ছে না। খানিকটা অপছন্দ, কিংবা অবিশ্বাসের আভাস দিয়ে বলল, 'হুট করে কোত্থেকে এলেন আপনি?'

'আপনাকে বলেছিলাম এখানে আমি খেলি। মনে পড়ে?' রানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সৌবর্ণ গালিব।

'না।'

'সাদিয়া মেয়েটি আমার মেসেজ দেয়নি আপনাকে?'

'না তো। কী মেসেজ?'

'বলেছিলাম এখানে আমি আসব, আপনার সঙ্গে গলফ খেলার ইচ্ছে।'

'ও, আচ্ছা,' রানার ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে ভদ্রতার কোনও অভাব নেই। 'একদিন না হয় খেলা যাবে।'

'আজ আমার প্রফেশনালের সঙ্গে খেলার কথা। তার বদলে আপনার সঙ্গে খেলব,' নিজের সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিল গালিব।

কোনও সন্দেহ নেই, সৌবর্ণ গালিব টোপ গিলেছে। এবার রানাকে ভান করতে হবে ওর সঙ্গ পাওয়া এত সহজ নয়। 'অন্য

আরেক দিন হলে হয় না? একটা ক্লাবের অর্ডার দিতে এসেছি। তা ছাড়া, প্র্যাকটিসের মধ্যেও নেই আমি। কোনও ক্যাডি-ও বোধহয় পাওয়া যাবে না।' যতটা সম্ভব অনীহা প্রকাশ করছে ও।

'বেশ কিছুদিন আমিও তো খেলিনি... '

ওরে শালা মিথ্যুক, ভাবল রানা।

'অর্ডার দিয়ে ক্লাব পেতে এক মিনিটও লাগে না,' বলে চলেছে গালিব। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল সে। 'কপারফিল্ড, মিস্টার রানার জন্যে একজন ক্যাডি-র ব্যবস্থা হবে না?'

'নিশ্চয়ই হবে, সার।'

'ব্যস, সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

নিজের ড্রাইভারটা ব্যাগে ভরে রাখল রানা। 'বেশ, ঠিক আছে তা হলে,' বলল ও। 'তবে আগেই বলে রাখছি, আমি কিন্তু টাকার জন্যে খেলি। শুধু মজা করার জন্যে রোদের মধ্যে বল পেটাতে বয়েই গেছে আমার।' নিজের এরকম একটা চরিত্র দাঁড় করাতে পেরে খুশি রানা।

উল্লাসের একটা ঝিলিক দেখা দিল গালিবের চোখের তারায়? তা যদি দেখা গিয়ে থাকে, দ্রুত তা লুকিয়েও ফেলা হয়েছে। কথা বলবার সময় নির্লিপ্ত শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। আপনি যা বলেন। যতদূর মনে পড়ে, আপনার হ্যান্ডিক্যাপ... নাইন?'

'হ্যাঁ, ছিল।'

সাবধানে জিজ্ঞেস করল গালিব, 'কোথায়, জানতে পারি?'

'হান্টারকুম।' সানিংডেল গলফ কোর্স-এও নয়বার বলে আঘাত করে গেম শেষ করতে পারে রানা। তবে হান্টারকুম সহজ কোর্স। হান্টারকুমে নাইন, শুনে ভয় পাবে না গালিব।

'আমিও নাইন। এখানে। দুজন তা হলে একই মাপের প্লেয়ার।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার চেয়ে ভাল খেলবেন আপনি।'

'আমার সন্দেহ আছে। যাই হোক,' দ্রুত কথা বলছে গালিব, 'আমি কী চাই বলছি। মায়ামিতে আপনি আমার কাছ থেকে অল্প কিছু টাকা খসিয়েছেন, মনে আছে? অঙ্কটা ছিল দশ হাজার। এখানে আমরা পাউন্ডের হিসেবে খেলব। জুয়া আমারও খুব প্রিয়। চেষ্টা করে দেখতে চাই হেরে যাওয়া টাকাটা জিতে নিতে পারি কিনা।'

নির্লিপ্ত একটা ভঙ্গি করে রানা বলল, 'বাজির অঙ্কটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে।' তারপর সিদ্ধান্ত পাল্টাবার সুরে আবার বলল, 'আপনি অবশ্য বলতে পারেন জেতা টাকা আর কুড়িয়ে পাওয়া টাকার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। হেরে গেলে সামান্যই আমার পকেট থেকে যাবে। বেশ, দশ হাজার পাউন্ডই সই।'

রানার দিকে পিছন ফিরল গালিব। চেষ্টা করেও গলার আওয়াজ থেকে আনন্দের ভাবটা লুকিয়ে রাখতে পারল না। 'সব পাকা হয়ে গেল, মিস্টার ডেভিড। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বিলে তোমার ফি-টা বসিয়ে নিয়ো। আমাদের খেলাটা না হওয়ায় সত্যি আমি দুঃখিত। এবার ক্যাডি-র ফি শোধ করে আসি, কেমন?' ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে গেল সে।

এগিয়ে এসে রানার ক্লাবগুলো তুলে নিল ডেভিড, তারপর সরাসরি ওর দিকে তাকাল। 'কী বলেছি মনে রাখবেন, সার,' বলল সে। একটা চোখ বন্ধ হয়ে আবার খুলে গেল।

মৃদু হাসল রানা। এত বয়সেও ডেভিডের কান খুব ভাল। যথেষ্ট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও কত টাকার বাজি তা হয়তো শুনে ফেলেছে। যদি না-ও শুনে থাকে, তার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলা হতে যাচ্ছে এটা। 'ধন্যবাদ, ডেভিড। ভুলব না। চারটে পেনফোল্ড দাও, হার্ট-এর ছাপ সহ। আর এক ডজন টি। এখনই আসছি আমি।'

পেনফোল্ড কোম্পানির বল চাইল রানা। আর চাইল কাঠ বা প্লাস্টিকের তৈরি ছোট টুকরো, ঘাস কোথাও বেশি লম্বা হলে বল

রাখবার কাজে লাগে। টি-র অবশ্য আরেকটা অর্থও আছে।

ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ির কাছে ফিরছে রানা। মাথায় কালো বোলার হ্যাট পরা লোকটা একটা কাপড় দিয়ে রোলসরয়েসের গা মুছছে। যতটা না দেখল তারচেয়ে বেশি অনুভব করল, কাজ থামিয়ে ওর প্রতিটি নড়াচড়া খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে গালিবের শোফার। ক্লাব হাউসে ফেরার সময় তার দিকে সরাসরি তাকাল ও। চ্যাপ্টা মুখ, হলদেটে চামড়া। কোরিয়ানদের একজন?

স্টুয়ার্ট গিবসনকে কোর্স ফি দিল রানা। চেঞ্জিং রুমে ঢুকে কোট খুলে কালো উইন্ডচিটার পরল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল, খেলার জন্য প্রস্তুত করছে মনটাকে। ইচ্ছে করেই সৌবর্ণ গালিবকে বুঝতে দিয়েছে ও উত্তেজনাকর, কঠিন একটা গেম হতে যাচ্ছে এটা, ওর সম্পর্কে লোকটার সমীহের ভাবটুকু যাতে বাড়ে। সন্দেহ নেই, এরই মধ্যে তার ধারণা হয়েছে অত্যন্ত সাহসী ও, নিষ্ঠুর, পোড় খাওয়া এক ভাগ্যান্বেষী। তার এই ধারণা আরও দৃঢ় করতে চাইছে রানা। এদিকে প্রতি গেম এক হাজার পাউন্ডই খুব বেশি হয়ে যায়। সেখানে দশ হাজার পাউন্ড! হেরে যাওয়া টাকা সুদসহ ফেরত পাওয়ার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে গালিব। জানা কথা, জেতার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠবে সে। তবে একশো একটা কারণে হারা চলবে না রানার।

ওঅর্কশপে ফিরে এসে ডেভিডের কাছ থেকে বল ও টিগুলো নিল ও।

'ক্লাবগুলো বোথাম নিয়ে গেছে, সার।'

সাগর সংলগ্ন পাঁচশো গজ লম্বা ঘাস ছাঁটা মাঠে বেরিয়ে এল রানা।

একটা গলফ কোর্স সাড়ে ছয় থেকে সাত হাজার গজ লম্বা, আঠারোটা সেকশনে ভাগ করা। প্রতিটি সেকশনের মাথায় ফ্ল্যাগ, কাপ, কিংবা সিলিন্ডার আকৃতির ছোট কন্টেইনার থাকে, হোল-টা কোথায় আছে বোঝাবার জন্য।

সেকশনকে হোল-ও বলা হয়। প্রতি হোল-এর জন্য খেলার শুরুতে যেখানে বল রাখা হয় সেই উঁচু জায়গাটা টি, টি-র চারধার অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

সবুজ মাঠে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করছে গালিব। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে তার ক্যাডি, বল ছুঁড়ে সাহায্য করছে তাকে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাছে এল রানার ক্যাডি। রানার মনে হলো চেহারা আর হাবভাব সেই আগের মতই আছে বোথামের, হাসি-খুশি ও নিরুদ্বিগ্ন। হেঁটে আসার সময় ওর ব্যাট দিয়ে কাল্পনিক বল পেটাচ্ছে।

'আফটারনুন, বোথাম।'

'আফটারনুন, সার।' রানার হাতে ভারী একটা ব্লাস্টার ধরিয়ে দিল বোথাম, তারপর ওর পায়ের কাছে ব্যবহার করা তিনটে বল ফেলল। ওর রোগাটে চেহারাটা এমনই, যে দেখে সে-ই মনে করে তাকে বিদ্রূপ করছে ও। এই মুহূর্তে সেখানে একটা ফাটল ধরল। নিঃশব্দে হেসে রানাকে স্বাগত জানাচ্ছে বোথাম। 'খোদাকে ধন্যবাদ, সার। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ ভাল আছেন আপনি।'

ক্লাবটা নিয়ে ওটার ওজন অনুভব করল রানা, দূরে তাকিয়ে প্রথম সেকশনের দূরত্বটুকু দেখে নিল। প্র্যাকটিসের ঢপ ঢপ আওয়াজটা বন্ধ হয়েছে।

বলের উপর দিয়ে বার কয়েক ক্লাব ঘোরাল রানা। তারপর আঘাত করল। ফুটখানেক ঘাসের চাপড়া উড়ে গেল। বল গেল দশ গজ। বোথামের দিকে ফিরল রানা, ব্যঙ্গাত্মক হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে। 'সব ঠিক আছে, বোথাম। ওটা ছিল লোক দেখানো।'

চোখ দেখে মনে হলো কৌতুক বোধ করছে বোথাম। তবে কপালে চিন্তার রেখাও আছে। কিছু বলল না সে। ব্যাগ থেকে ড্রাইভার বের করে রানাকে দিল সে। ক্লাব, ব্লাস্টার, ড্রাইভার ইত্যাদি সবই বিভিন্ন ধরনের গলফ ব্যাটের নাম, নিয়ম আর সুবিধে অনসারে যখন যেটা দরকার সেটা ব্যবহার করা হয়। দুজন

পাশাপাশি হাঁটছে, বোথামের পরিবারের কে কেমন আছে খবর নিচ্ছে রানা।

ওদের সঙ্গে যোগ দিল গালিব। শান্ত ও শিথিল লাগছে তাকে। তার ক্যাডিকে 'হাই' বলল রানা। বাচাল টাইপের আইরিশ, নাম আয়ান স্মিথ। রানার তাকে কোনদিনই ভাল লাগেনি।

'টস ফর অনার?' শূন্যে একটা কয়েন ছুঁড়ল গালিব।

'হেড।'

টেইল। নিজের ড্রাইভার নিয়ে নতুন একটা বলের মোড়ক খুলল গালিব। বলল, 'ডানলপ-পঁয়ষট্টি। নাম্বার ওয়ান। সব সময় একই বল ব্যবহার করি। আপনারগুলো কী?'

'পেনফোল্ড। হার্টস।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল গালিব। 'গলফ রুলস কড়াকড়িভাবে মানা হবে তো?'

'স্বভাবতই।'

'গুড।' হেঁটে টি-তে চলে এল গালিব। সাবধানে, গভীর মনোযোগ সহকারে প্র্যাকটিসের জন্য ক্লাব ঘোরাল সে। তার নিখুঁত ভঙ্গিটাই বলে দিল পঁচিশ হাজার পাউন্ড খরচ করে সেরা প্রো টিচারদের কাছ থেকে খেলাটা শিখেছে। এরকম মার থেকেই স্কোর পাওয়া যায়। একটু ঈর্ষাই হলো রানার। সেই সঙ্গে বুঝল, এ-ই লোককে হারানো সহজ কাজ হবে না।

গালিবের প্রথম শটটা ওর এই ধারণাকে আরও জোরাল করল। প্র্যাকটিসের মতই নিখুঁত হলো সেটা। রানা জানে, বিভিন্ন ক্লাব দিয়ে এই একই ধরনের মার আঠারোটা হোলে বারবার মারতে পারবে গালিব।

গালিবের প্রথম শট দুশো গজ দূরে নিরাপদ জায়গায় পড়েছে।

রানাও একবার মাত্র প্র্যাকটিস করল। ওর শটও নিখুঁত হলো, নামল গালিবের বলকে পিছনে ফেলে, গড়িয়ে সামনে চলে গেল আরও পঞ্চাশ গজ।

রয়্যাল সেইন্ট মার্কের প্রথম হোল সাড়ে চারশো গজ লম্বা। মাঝখানে ফাঁদে ফেলবার জন্য বাঙ্কার আছে। এই ফাঁদে পড়তে হয় দ্বিতীয় শট ভাল না হলে। বাঙ্কার মানে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা, যেমন বালি ভর্তি বড় গর্ত, কিংবা একটা লেক ইত্যাদি। এগুলোকে ট্র্যাপ-ও বলে। শট ভাল হলেও বিপদে পড়বার আশঙ্কা আছে, কারণ রাফ আর বাঙ্কার কোর্সের আরও অনেক জায়গায় আছে। র‍্যাফ বলা হয় টি আর গ্রিন-এর মাঝখানে ঘাস না কাটা জায়গাকে। গ্রিন, ফেয়ারওয়ে, গলফ কোর্স, সবই সমার্থক। রাফ আর বাঙ্কার আসলে পাহারাদার, ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারলে বিপদে পড়তে হবে।

দ্বিতীয়বার বলে আঘাত করল গালিব। ছোট্ট একটা রাফ-এ পড়ল বল, তবে হোল থেকে বেশি দূরে নয়। উজ্বল হাসি নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।

এবার রানার পালা। ঠিক মতই মারল ও, তবে বেশি জোরাল হয়ে যাওয়ায় হোল ছাড়িয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে পড়ল বল।

গালিব স্রেফ একটা টোকা দিল নিজের বলে। হোল থেকে তিন ইঞ্চি দূরে থামল সেটা।

অনেকটা দূরে আর বালির উপর বল পড়ায় রানার কোনও সম্ভাবনাই নেই, তারপরও চেষ্টা করল ও হোল-এর কাছাকাছিও গেল না বলটা।

নিজের বলটা হোল-এ ফেলবার ঝামেলায় না গিয়ে রানার দিকে পিছন ফিরল গালিব, রওনা হলো দ্বিতীয় টি-র দিকে।

ধীর পায়ে তার পিছু নিয়ে হাঁটছে রানা, বোথামও রয়েছে কাছাকাছি। ও বলল, 'তুমি বোধহয় কড়াকড়ি নিয়মের কথা বলেছিলে। তবে আমি ধরে নিলাম বলটা হোলে পড়েছে তুমি আমার চেয়ে এগিয়ে থাকলে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল গালিব। প্র্যাকটিস রুটিন শেষ করে আবার নিখুঁত একটা শট খেলল সে। তবে রানার মারটা হলো

আরও ভাল। দ্বিতীয় হোল-এ রানা জিতল।

তৃতীয় হোল দুশো চল্লিশ গজ গলফ কোর্সের মূল অংশ, ফেয়ারওয়ের দু'পাশে বেশ বড়সড় দুটো রাফ রয়েছে। বলে দু'বার আঘাত করে ফ্ল্যাগ-এর কাছে পৌঁছে গেল গালিব। তবে এমন জায়গায় পড়ল, ওটার ঠিক পিছনেই রয়েছে ঘাস ঢাকা উঁচু মাটি।

এই পজিশনের একটা বলকে মেরে নিজের পছন্দ মত জায়গায় পাঠানো সম্ভব নয়। বলের এক হাত পিছনে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা খুঁটিয়ে দেখছে গালিব। তার ভাব দেখে মনে হলো একটা সিদ্ধান্তে এল সে। পা ফেলে পাশ কাটাল বলটাকে, একটা ক্লাব নিল অ্যাটেনড্যান্ট, অর্থাৎ ক্যাডি-র কাছ থেকে। এগোবার সময় তার বাম পা ঠিক বলটার পিছনে পড়ল, চ্যাপ্টা করে দিল উঁচু মাটিটুকু। এখন গালিব টোকা দিয়ে বলটাকে অনায়াসে কাছাকাছি পৌঁছে দিতে পারবে। দিলও তাই। মাত্র তিন ফুট দূরে থামল ওটা।

ভুরু কোঁচকাল রানা। গলফ খেলায় কেউ চিট করলে তার সঙ্গে আর কখনও না খেলাই উচিত। তবে এক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। এমনিতেই তার সঙ্গে আর খেলবে না রানা। অভিযোগ করে কোনও লাভ নেই, ব্যাপারটা অস্বীকার করবে গালিব। বলবে, খেয়াল করেনি সে।

এখন রানাকে বিশ ফুট দূরের গর্তে বল ফেলতে হবে। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ওর ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা ষোলো আনা, গালিবের সফল হওয়ার সম্ভাবনা আঠারো আনা।

ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো আবার এগিয়ে গেল গালিব।

এভাবেই চলল ওদের খেলা

সপ্তম হোল-এ খেলা চলছে। দুজনেই তিনটে করে জিতেছে। এটা বোধহয় রানাই জিতবে। গালিবের বল কয়েকটা গাছের মাঝখানে, ঝোপের ভিতরে পড়েছে। রানার বল ফেয়ারওয়ের মাঝখানে। দূরত্ব যদিও যথেষ্ট এখনও, তবে রানার মারে জোর থাকায় ফ্ল্যাগের কাছাকাছি বলটাকে পাঠিয়ে দিতে

পারবে ও। বাকিটুকু সহজ।

শট নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা। প্র্যাকটিস শেষ করল। এবার বলে আঘাত করবে। ক্লাবটা সবেগে নামিয়ে আনছে, এই সময় ধপাস করে কিছু একটা পড়ল ওর ডান পাশে। ক্লাব ঘোরানো হয়ে গেছে, এখন আর রানার পক্ষে থামা সম্ভব নয়। অথচ মনোযোগ ছুটে যাওয়ায় কেঁপে গেছে হাত, শটটা জুতসই হবে না।

সত্যি হলো না। বল গিয়ে পড়ল একটা ঢালে, তারপর গড়িয়ে নেমে এল বালি ভর্তি নিচু নালায়।

ঘাড় ফিরিয়ে গালিব ও তার ক্যাডি-র দিকে তাকাল রানা, চোখে আগুন। গালিব সিধে হচ্ছে। রানার চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'দুঃখিত। হাত থেকে ড্রাইভারটা পড়ে গিয়েছিল।'

'আর কখনও এরকম করবেন না,' কঠিন সুরে বলল রানা।

স্কোরে আবার এগিয়ে গেল গালিব।

রানার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে মাথা নাড়ল বোথাম।

এরপর দীর্ঘ নীরবতা। সেটা হঠাৎ করেই ভাঙল গালিব। 'আরেকটু ধারণা দিন, আপনার কাজটা কী?'

নিজেকে তাগাদা দিচ্ছে রানা, রাগ দমন করো। আরে, ব্যাটা কী বলছে শোনো। এটা কাজ, খেলা নয়। 'আমার কাজ ইউরোপ-আমেরিকায় গার্মেন্টস-এর কোন্ আইটেমের কী রকম চাহিদা আছে জানা। দাম, কোয়ালিটি ইত্যাদি জেনে নিয়ে দেশের ফ্যাক্টরিগুলোকে পরামর্শ দেয়া।'

'ইন্টারেস্টিং কাজ বলে মনে হচ্ছে না,' গালিব যেন একঘেয়েমির শিকার, ভাব দেখাল উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।

'আমার কাছেও ইন্টারেস্টিং লাগছে না,' জানাল রানা। 'ভাবছি ছেড়ে দেব। চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেব বলেই ছুটি নিয়ে এখানে এসেছি। এ-কাজে ভবিষ্যৎ নেই ভাবছি কানাডাতে গিয়ে নতুন কিছু করব।'

'তাই?'

ছয়

থারটিন্থ হোল-এর খেলা চলছে। ছ'টা করে জিতেছে প্রত্যেকে। এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ একটা শট নিতে যাচ্ছে রানা। শটটা নিখুঁত হলে ওর জেতার সম্ভাবনা শতকরা নব্বুই ভাগ। কিন্তু আবার বিরক্ত করা হলো ওকে।

রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে গালিব। সাগরের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। তবে ডান হাতটা ট্রাউজারের পকেটে ভরে 'অন্যমনস্কভাবে' টাকা গুণছে।

রানার ঠোঁটে গম্ভীর হাসি ফুটল। বলল, 'টাকা-পয়সার হিসেবটা আমার শট মারার পর করলে হয় না?'

গালিব ফিরল না বা মুখও খুলল না। তবে খসখসে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল।

এই খেলাটায় জিতে এগিয়ে গেল রানা।

গ্রিন ধরে নিঃশব্দে হাঁটছে ওরা। কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে ফোরটিন হোল-এর খেলা। সামনে তাকাল রানা গালিবের বল ছোট একটা গর্তে পড়েছে।

নিজের বলের কাছে থামল রানা, পাখিদের শিস শুনছে। এটাতেও জিতবে ও। অন্য একটা ক্লাব নেওয়ার জন্য বোথামের দিকে তাকাল। কিন্তু গ্রিন-এর আরেকদিকে রয়েছে সে, একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে কীভাবে শট নেয় গালিব।

নিজের ব্লাস্টার নিয়ে বাঙ্কারে নামল গালিব। গর্তটা ঠিক কোথায় দেখবার জন্য একটা লাফ দিল সে, তারপর শট নেওয়ার

জন্য তৈরি হলো। ব্লাস্টার, অর্থাৎ ক্লাবটা যখন উপরে উঠছে, রানার বুকে আনন্দের শিহরণ জাগল। ভঙ্গিটাই বলে দিচ্ছে বলটাকে টোকা দিতে যাচ্ছে গালিব। গাড্ডায় পড়া বলকে এভাবে মারাটা ভুল টেকনিক। একমাত্র উপায় মাটিতে বিস্ফোরণ ঘটানো। নেমে এল গালিবের ক্লাব– কোনও ব্যস্ততা নেই, শান্ত ভঙ্গি। এক মুঠো বালি ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। গভীর বাঙ্কার থেকে উড়ে এল বল, একবার ড্রপ খেয়ে হোল-এর কাছে এসে ডেড হয়ে গেল। বলের ডেড হয়ে যাওয়া বলতে বোঝায় টোকা দিলে ওটার আর হোল-এ না পড়বার কোনও কারণ নেই।

ঢোক গিলল রানা। কাজটা গালিব পারল কীভাবে? এবার ওর পালা। একই ধরনের জাদু ওকেও তা হলে দেখাতে হয়। ওর বলও বাঙ্কারে, অর্থাৎ কঠিন ফাঁদে পড়ে আছে। সময় নিয়ে, চিন্তা-ভাবনা করে শটটা নিল। কিন্তু কাজ হলো না। হারল ও।

দুজনেই আবার সমান। সাত-সাত।

টি-র দিকে হাঁটছে সবাই। গালিব আর তার ক্যাডি পঞ্চাশ গজ সামনে। দ্রুত খোঁড়াতে খোঁড়াতে রানার পাশে চলে এল বোথাম। নিচু গলায় বলল সে, 'আপনি দেখলেন, সার? কী কাজটা করলেন উনি?'

'হ্যাঁ, ব্যাটা শুধু দক্ষ নয়, ভাগ্যও তাকে সাহায্য করেছে।'

বিস্মিত দেখাল বোথামকে। 'ও, তারমানে, সার, ব্যাপারটা আপনি খেয়াল করেননি?'

'না, কী? আমি অনেকটা দূরে ছিলাম।'

চোদ্দ নম্বর গ্রিনকে ঘিরে থাকা একটা বাঙ্কারে নিঃশব্দে নেমে গেল বোথাম। জুতোর ডগা দিয়ে গুঁতো মেরে মাটিতে ছোট একটা গর্ত তৈরি করে একটা বল রাখল তাতে। এরপর গর্তের ভিতর অর্ধেকটা লুকিয়ে থাকা বলের ঠিক পিছনে দুই পা এক করে দাঁড়াল। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। 'মনে পড়ে, সার, হোলটা দেখার জন্যে লাফ দিয়েছিলেন তিনি?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু তাকিয়ে থাকুন, সার।' বলটার ঠিক পিছনে লাফ দিল বোথাম, যেভাবে গালিব লাফিয়েছিল। এরপর আবার রানার দিকে তাকাল সে, আঙুল তাক করে পায়ের সামনে পড়ে থাকা বলটা দেখাচ্ছে ওকে। দুই পায়ের চাপে আশপাশের জমিনের সঙ্গে একই লেভেলে উঠে এসেছে গর্তের তলা, অর্থাৎ গর্তটার এখন আর কোনও অস্তিত্বই নেই। বলটা এখন এমন পজিশনে রয়েছে, শুধু একটা টোকা দিলেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে। পেয়েছেও তাই গালিব।

ক্যাডির দিকে এক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর বলল, 'ধন্যবাদ, বোথাম। ব্যাট আর বল দাও আমাকে। এই ম্যাচে কেউ একজন দ্বিতীয় হবেই। খোদার কসম বলছি, মিস্টার গালিবকেই তা করা হবে।'

'ইয়েস, সার।'

ঢাল বেয়ে উঠল ওরা, পনের নম্বর সেকশনের দিকে এগোচ্ছে। টি-র কাছে দুই দল জড়ো হলো আবার।

'ভাল কথা,' গালিবকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'সুন্দরী মেয়েটির খবর কী? সাদিয়া সিকান্দারের?'

নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে আছে গালিব। 'আমার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে সে।'

রানা ভাবল, নিজের উপকার করেছে সাদিয়া। বলল, 'তাই? তার সঙ্গে আবার আমার যোগাযোগ হওয়া দরকার। চাকরি ছেড়ে কোথায় গেল?'

'তা আমি বলতে পারব না।' হেঁটে নিজের বলের দিকে চলে গেল গালিব।

'স্কোর সমান সমান, বোথাম,' ক্যাডিকে নিচু গলায় বলল রানা। 'আর মাত্র চারটে খেলা বাকি। পরবর্তী চারটে হোলে কড়া নজরে রাখতে হবে। কী বলছি বুঝতে পারছ তো?'

'আপনি চিন্তা করবেন না, সার। তাঁর ওপর আমার চোখ থাকবে।'

পনের নম্বর হোল-এর খেলা চলছে। শেষ দিকে এসে দেখা গেল রানার বল হোল থেকে মাত্র দুই ইঞ্চি দূরে থেমেছে। আর শুধু একটা মৃদু টোকার অপেক্ষা।

এখন অবশ্য গালিবের পালা। বলে আঘাত করল সে। দুর্ভাগ্য তার, জলাভূমির মধ্যে পড়ল বলটা।

ভাল হয়েছে, ভাবল রানা। খুশি হই বলটা যদি পাওয়া না যায়, কিংবা পাওয়া গেলেও যেন খেলবার উপযোগী না থাকে।

জলার মধ্যে প্রচুর কাদা, আগাছা, উইয়ের ঢিবি আর নল-খাগড়ার জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। ভাগ্য সহায়তা না করলে ওখান থেকে বল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ পর জলা ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে গেল গালিব ও তার ক্যাডি। রানা ভাবল, ধ্যাত, অতদূরে কীভাবে যাবে বলটা। হঠাৎ কীসে যেন পা পড়ল ওর। কী আশ্চর্য! একটা বল মনে হচ্ছে। ঝুঁকল ও, তারপর অত্যন্ত সাবধানে চারপাশের ঘাস সরাল, বলটার পজিশন যাতে ভাল হয়ে না যায়। হ্যাঁ, এটা ডানলপ পঁয়ষট্টিই। 'এই যে, এখানে আপনার বল,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল ও। 'এক সেকেন্ড··· দুঃখিত। আপনি নাম্বার ওয়ান নিয়ে খেলছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ,' গালিবের অধৈর্য সুর ভেসে এল।

'কিন্তু এটা নাম্বার সেভেন,' বলটা তুলে নিয়ে গালিবের কাছে হেঁটে এল রানা।

বলটার দিকে চট করে একবার তাকাল গালিব। বলল, 'আমার নয়।' ড্রাইভারের মাথা দিয়ে লম্বা ঘাস সরিয়ে আবার তল্লাশি শুরু করল।

বলটা ভাল, কোথাও কোনও দাগ নেই, প্রায় নতুনই বলা যায়। ওটা পকেটে ফেলে তল্লাশিতে যোগ দিল রানা। হাতঘড়ি দেখল ও। নিয়ম অনুসারে হারানো বল পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুঁজে পেতে

হবে। সময় প্রায় হয়ে এসেছে। আর ত্রিশ সেকেন্ড পর হোলটা ক্লেইম করবে ও। নিয়মের কড়াকড়ি মানতে হবে, বলেছে গালিব। ঠিক আছে, বন্ধু। মানো এবার!

চোখ তুলে মাঝে মধ্যে রানাকে দেখছে গালিব। এখনও লম্বা ঘাসের ভিতর বলটা খুঁজছে সে।

রানা বলল, 'না বলে পারছি না, সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'

'হুম।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এই সময় তার ক্যাডি চেঁচিয়ে উঠল।

'এই যে, সার, এখানে। নাম্বার ওয়ান ডানলপ।'

গালিবের পিছু নিয়ে তার ক্যাডির কাছে পৌঁছাল রানা। লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে শুকনো, উঁচু একটা জায়গায়। নীচের দিকে আঙুল তাক করল সে। ঝুঁকে বলটা পরীক্ষা করল রানা। হ্যাঁ, প্রায় নতুন একটা ডানলপ ওয়ান; পজিশনটাও অসম্ভব ভাল। ব্যাপারটা অলৌকিকই বলতে হবে। গালিব আর তার ক্যাডির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'আগে কখনও দেখিনি কারও ভাগ্য এভাবে সাহায্য করে,' নরম সুরে মন্তব্য করল ও।

কাঁধ ঝাঁকাল গালিবের ক্যাডি।

গালিবকে শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

রানা চিন্তিত, ধীর পায়ে সরে এল ওখান থেকে। শট নিল গালিব। এটা তার শ্রেষ্ঠ শট। দু'বার ড্রপ খেয়ে হোল-এ পড়ল বল।

গালিবের স্কোর আট। রানার সাত। আর তিনটে খেলা বাকি।

পরের খেলাটা রানা জিতল। স্কোর সমান সমান।

সেভেনটিন সেকশনে যাচ্ছে ওরা। রানার পাশে চলে এল বোথাম। রানা বলল, 'ব্যাপারটা মিরাকল, তাই না? বলটা যেখানে খুঁজে পেল?'

'ওটা তাঁর বল নয়, সার।' শান্ত, অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জানাল বোথাম।

'কী বলতে চাও তুমি?' রানার গলায় চাপা উত্তেজনা।

'আমি টাকা হাতবদল হতে দেখেছি, সার। সম্ভবত একশো পাউন্ডের একটা নোট। স্মিথ নিশ্চয়ই তার ট্রাউজারের পায়ার ভেতর থেকে নীচে ফেলেছে বলটা।'

'বোথাম!' দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। চারদিকে তাকাল। গালিব আর তার ক্যাডি যথেষ্ট দূরে, ধীর পায়ে গ্রিন-এর দিকে এগোচ্ছে। নিচু, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ও, 'তুমি কসম খেতে পারবে? কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ?'

বোথামের চেহারায় খানিকটা লজ্জার ভাব দেখা গেলেও, বাঁকা ঠোঁটে হাসি ঝুলে আছে। চোখে জিদের আভাসও স্পষ্ট। 'নিশ্চিত হচ্ছি, কারণ তাঁর বলটা এই মুহূর্তে ক্লাবগুলোর সঙ্গে আমার ব্যাগে রয়েছে।' রানাকে হাঁ হয়ে যেতে দেখে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে আবার বলল সে, 'দুঃখিত, সার। আপনার সঙ্গে যে অন্যায় উনি করছেন, এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছি আমি। ব্যাপারটা বলতাম না, কিন্তু জানাবার দরকার ছিল যে আবার আপনাকে ঠকিয়েছেন উনি।'

না হেসে পারল না রানা। প্রশংসার সুরে বলল, 'তুমি আশ্চর্য একটা মানুষ, বোথাম। মনে হচ্ছে আমার হয়ে খেলাটায় একার চেষ্টায় জিততে চাইছ তুমি?' ওর গলার আওয়াজ তেতো হয়ে উঠল। 'তবে; বাই গড, লোকটার মধ্যে নীতির কোনও বালাই দেখছি না। তাকে আমার ধরতে হবে। দাঁড়াও, বুদ্ধি বের করি!' ধীর পায়ে আবার হাঁটছে ওরা।

রানার বাম হাতটা ট্রাউজারের পকেটে, রাফ থেকে তোলা বলটা অন্যমনস্কভাবে আঙুল দিয়ে নাড়ছে। হঠাৎ মস্তিষ্কে পৌঁছে গেল মেসেজটা। পাওয়া গেছে! বোথামের কাছে সরে এল ও। চট করে একবার দেখে নিল ওদের দুজনকে।

গালিব দাঁড়িয়ে পড়েছে। রানার দিকে পিছন ফিরে ব্যাগ থেকে ক্লাব বের করছে সে।

কনুই দিয়ে বোথামের পাঁজরে মৃদু গুঁতো মারল রানা। 'এই,

রাখো এটা।' বলটা গিঁট সর্বস্ব হাতে গুঁজে দিল ও। মৃদুকণ্ঠে, জরুরি ভঙ্গিতে বলল, 'ভুল কোরো না, ফ্ল্যাগটা তুমি তুলবে। যে-ই জিতুক, হোল থেকে বল তুলে মিস্টার গালিবকে তুমি এই বলটা দেবে। ঠিক আছে?'

চোখে-মুখে দৃঢ়তা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল বোথাম, খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামনে এগোল।

সেভেনটিন হোল-এ গালিব জিতল। প্রস্তুতি নিয়ে ফ্ল্যাগের কাছেই ছিল বোথাম। আসলে ইচ্ছে করেই হারল রানা। ও না হারলে গালিবের বল হোল-এ পড়ে না। বোথামেরও সুযোগ হয় না ফ্ল্যাগ তুলে বল বের করার।

হোল থেকে তুলে কৌশলে বলটা বদলে ফেলল বোথাম, কারও চোখে ধরা পড়েনি। এগিয়ে এসে গালিবকে দিল সাত নম্বর বলটা।

তবে সেই সঙ্গে শুরু হলো রানার উদ্বেগ। বলটা মাটিতে রেখে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছে গালিব। বলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে। সর্বনাশ! টের পেয়ে গেল নাকি? এর আগে এক কি দু'বার প্র্যাকটিস করেছে গালিব, এবার তার প্র্যাকটিস চলছে তো চলছেই।

তবে সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে বলে আঘাত করল গালিব।

রানার হৃৎপিণ্ড গান ধরল। পাইছি তোমারে, শালা বেজন্মা! ভাল মথনই পাইছি!

ওর হিসাবে এরইমধ্যে হেরে ভূত হয়ে গেছে গালিব। এখন তাকে আগুনে পুড়িয়ে কাবাব বানানো বাকি। ধীরে ধীরে, জিভে জল এনে।

রানা অনুতপ্ত নয়। ওকে কয়েকবারই চিট করেছে গালিব, পারও পেয়ে গেছে। তা না হলে এতক্ষণে হার মানতে বাধ্য হত সে। এখন যদি স্কোর-বুক পরিশুদ্ধ করতে রানাকে মাত্র একটিবার

চিট করতে হয়, সেটাকে পোয়েটিক জাস্টিস ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। আর তা ছাড়া, এটা শুধুই একটা গলফ খেলা নয়, অন্য কিছুও বটে। জেতাটা রানার এক রকম দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। যে লোক নিজেকে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান, অজেয় বলে মনে করে, ওর কাছে পরাজিত হলে মনে মনে ভাবতে বাধ্য হবেঃ নাহ্, লোকটার মধ্যে কিছু আছে। ওর গুণ আমার কাজে লাগতে পারে। শক্ত-পোক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক, আস্তিনে লুকানো আছে প্রচুর কৌশল। এ-ধরনের বদমাইশই তো দরকার আমার।

কী জন্য দরকার? তা রানার জানা নেই। এমন হতে পারে যে গালিব ওকে হয়তো কোনও কাজে লাগাবে না। হয়তো লোকটা সম্পর্কে ওর অনেক ধারণাই ভুল। তবে তার কাছাকাছি পৌঁছানোর অন্য কোনও উপায়ও নেই।

শেষ খেলার অন্তিম মুহূর্তেও ইচ্ছে করে হোল-এ বল ফেলল না রানা। বলটা হোল-কে পাশ কাটিয়ে আধ হাত এগিয়ে যাওয়ায় হতাশায় মুষড়ে পড়বার ভান করল ও। 'ছিহ্, পারলাম না।' তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেকে সামলে নেওয়ার ভঙ্গি করল।

এরপর গালিবের পালা। উল্লাসে চকচক করছে তার দুই চোখ। পানির মত সহজ একটা শট। ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে হোল-এ ফেলল বল।

নিজের বল আগেই তুলেছে রানা। হোল থেকে গালিবের বলটাও তুলল। দুটোকেই সবার চোখের সামনে রেখেছে।

এগিয়ে এল গালিব। চোখ-মুখ থেকে উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে। 'আমার সঙ্গে খেললেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। দেখা যাচ্ছে দুজনের মধ্যে আমিই বেটার।'

তিক্ত কণ্ঠে রানা বলল, 'হার হারই, কষ্ট হলেও মেনে নিতে হবে।' হাতের বল দুটোর দিকে তাকাল ও, গালিবের বলটা অপর হাতে নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

হঠাৎ চমকে ওঠার ভান করল রানা। হাতটা টেনে নিল নিজের

দিকে। এখনও বলটা দেখছে। 'হ্যালো!' তীক্ষ্ণ চোখে গালিবের দিকে তাকাল। 'আপনি এক নম্বর ডানলপ ব্যবহার করেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' ষষ্ঠইন্দ্রিয় অজানা সর্বনাশের ইঙ্গিত দেওয়ায় গালিবের চেহারা থেকে বিজয়ের উল্লাস মুছে গেল। 'কেন? কী হয়েছে?'

'ইয়ে,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল রানা। 'সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক। আপনি দেখা যাচ্ছে এতক্ষণ ভুল বল দিয়ে খেলছিলেন। এই দেখুন আমার পেনফোল্ড হার্টস,আর এটা একটা সাত নম্বর ডানলপ।' দুটো বলই গালিবের দিকে বাড়িয়ে ধরল ও।

ছোঁ দিয়ে বল দুটো নিয়ে পাগলাটে ব্যস্ততার সঙ্গে পরীক্ষা করছে গালিব। ধীরে ধীরে তার ফরসা চেহারা লাল হয়ে উঠছে। অটল দাঁড়িয়ে থাকল সে, মুখের প্রতিটি পেশি যেন একেকটা জ্যান্ত পোকার মত কিলবিল করছে, পালা করে রানা আর বলগুলোর দিকে তাকাচ্ছে সে।

নরম সুরে রানা বলল, 'আপনার জন্যে দুঃসংবাদ হলো, নিয়ম ধরে খেলছি আমরা। এর মানে হলো, ম্যাচে আপনি হেরে গেছেন।' গম্ভীর মুখে গালিবকে লক্ষ করছে ও।

'কিন্তু, কিন্তু… '

এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিল রানা। মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকল ও, কিছু বলছে না

হঠাৎ গালিবের মুখ বোমার মত ফাটল। 'রাফ-এ ডানলপ সেভেন আপনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আপনার ক্যাডিই এই বল আমাকে দিয়েছে। সে ইচ্ছে করে এই কাজ করেছে, ব্যাটা চি–'

'অ্যাই, মুখ সামলে,' নরম গলায় বলল রানা। 'তা না হলে বেফাঁস মন্তব্য মহাবিপদ ডেকে আনবে। বোথাম, তুমি কি মিস্টার গালিবকে সাত নম্বর বল দিয়েছ, ভুল করে বা ইচ্ছে করে?'

'না, সার।' বোথামের চেহারা নিরেট পাথর হয়ে আছে। নির্লিপ্ত

সুরে বলল সে, 'আমার মতামত চাইলে আমি বলব, ভুলটা হয়েছে পনের নম্বর সেকশনে, যখন নিজের বলটা ভদ্রলোক খুঁজে পেলেন জলার ওপারে। ওয়ান আর সেভেন প্রায় একই রকম দেখায়। আমার ধারণা এ-ধরনের কিছুই ঘটেছে, সার। বলটা উনি যেখানে পেলেন, তাঁর বল অত দূরে যাওয়াটা স্রেফ মিরাকল। তখনই ভাল করে দেখে নেয়া উচিত ছিল ওটা ওয়ান, নাকি সেভেন।'

'একদম বাজে কথা!' খেঁকিয়ে উঠল গালিব। রাগের সঙ্গে রানার দিকে ফিরল সে। 'আপনি দেখেছেন আমার ক্যাডি এক নম্বরই পেয়েছে।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'আমি আসলে ভাল করে দেখিনি, সত্যি বলছি। যাই হোক,' ওর কণ্ঠস্বর দৃঢ় হয়ে উঠল, 'ঠিক বল নিয়ে খেলছে কি না তা দেখা খেলোয়াড়ের দায়িত্ব। এ-ব্যাপারে আর কাউকে দোষ দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। আপনি যদি ভুল বল দিয়ে খেলে থাকেন, তার মাসুল আপনাকেই দিতে হবে। যাই হোক,' কোর্স ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ও, 'ম্যাচের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার একদিন খেলব আমরা, কেমন?'

অস্তগামী সূর্য সোনালি রোদে ভরিয়ে দিয়েছে গালিবকে, কিন্তু তার গোড়ালির সঙ্গে বাঁধা পড়েছে লম্বা ও কালো একটা ছায়া। রানাকে ধীর পায়ে অনুসরণ করল সে। তার চোখের চিন্তিত দৃষ্টি রানার পিঠে নিবদ্ধ।

সাত

শাওয়ার সেরে বেডরুমে মাত্র ঢুকেছে রানা, নক হলো দরজায়। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে দরজার কাছে চলে এল ও। কবাট খুলে দেখল হল পোর্টার দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'ইয়েস?'

'মিস্টার সৌবর্ণ গালিবের কাছ থেকে একটা টেলিফোন মেসেজ এসেছে, সার। আজ রাতে তাঁর বাড়িতে আপনার ডিনারের নিমন্ত্রণ। বাড়ির নাম সুবর্ণভিলা, ওটা রিকালভার-এ, সার। সাড়ে ছ'টায় ড্রিঙ্কস।'

'মিস্টার গালিবকে ধন্যবাদ দাও। বলো যেতে পারলে খুশি হব।' দরজা বন্ধ করে খোলা জানালার সামনে চলে এল রানা, গোধূলিবেলার সাগর দেখছে। বেশ, বেশ! ভাল একটা মার দেয়া হয়েছে, তাই হয়তো ডিনারে ডেকে বিষ খাওয়াতে চাইছে ওকে। তারপরই চিন্তাটা বাতিল করে দিল রানা। বরং ওর হিসাবটাই সম্ভবত মিলছে, ওকে নিজের কোনও কাজে লাগাবার কথা ভাবছে গালিব।

ছ'টায় নীচের বার-এ নেমে এসে বসল রানা। কয়েকজন এয়ার ফোর্স অফিসার ছাড়া আর কেউ নেই; চেয়ারগুলো খালি পড়ে আছে। কাছাকাছি ম্যানস্টনে ওদের ঘাঁটি আছে, মনে পড়ল ওর। অল্প একটু হুইস্কি খেয়ে বেরিয়ে এল বার থেকে।

স্পোর্টস কার নিয়ে ধীর গতিতে রিকালভারে যাচ্ছে রানা। ডিনার পার্টিটা বেশ জমবে বলেই ভাবছে ও। এটাই তো নিজেকে গালিবের কাছে বিক্রি করবার সময়। তবে কৌশলে। কোনও রকম

ভুল করলে চাকরি তো পাবেই না, অজানা ও অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়তে হতে পারে। গালিব ঠিকই বুঝতে পারবে ওর কাছে কিছু আছে কি না, তাই সঙ্গে করে কোনও অস্ত্র আনেনি ও।

তবে আমন্ত্রণটা খুব তাড়াতাড়িই এল।

গলফ ক্লাবে বিদায় নেওয়ার সময় জোর করে হলেও হেসেছে গালিব, জানতে চেয়েছে বাজিতে জেতা টাকাটার চেকটা কোথায় পাঠাতে হবে। ওর এজেন্সির একটা সেফ-হাউসের ঠিকানা দিয়েছে রানা, ওটার সামনের অংশে একটা কনসাল্টিং ফার্মের অফিস আছে। বলেছে ওটা ওর এক বন্ধুর অফিস, ওখানে পাঠিয়ে দিলে পেয়ে যাবে ও।

এরপর খেদ প্রকাশ করে গালিব জানিয়েছে, খুবই ইচ্ছে ছিল ওর সঙ্গে আরেকটা ম্যাচ খেলবে, কিন্তু কালই তাকে ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা হতে হবে, কবে ফিরবে তার কোনও ঠিক নেই। প্লেনে? হ্যাঁ, লয়েড থেকে এয়ার ফেরি ধরবে সে। তো, ম্যাচের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। ভাল থাকবেন। এরপর প্রকাণ্ড হলুদ গাড়িটা নিয়ে চলে গেছে সে।

সুযোগ পেয়ে গালিবের শোফারটাকে ভাল করে দেখে নিয়েছে রানা। লোকটা জাপানি বা কোরিয়ান। চোখ তো নয়, যেন পেন্সিল দিয়ে আঁকা সরু দাগ। তবে শরীর-স্বাস্থ্য দেখবার মত, যেন জাপানি কুস্তিগির। তার উপরের ঠোঁটটা বিকৃত, খুদে শুঁড়ের মত দেখতে। লোকটাকে কোনও কথা বলতে শোনেনি ও, ফলে সন্দেহ হয়েছে বোবা কিনা। অস্পষ্ট হলেও, লোকটার কাঁধ আর চোখ চেনা চেনা লেগেছে রানার।

রোলসরয়েস চলে যাওয়ার সময় পিছন থেকে তাকে দেখে মনে পড়ে গেল রানার। লন্ডন থেকে গলফ ক্লাবে আসার পথে গালিবের এই শোফারকে দেখেছে ও। একটা পুরানো ফোর্ড পপুলার চালাচ্ছিল, হর্ন বাজিয়ে ওভারটেক করে ওকে। অত ব্যস্ত তার সঙ্গে কোত্থেকে ফিরছিল সে? কী কাজে তাকে পাঠিয়েছিল

গালিব? কর্নেল পাউন্ড কী বলেছেন মনে পড়ল রানার। গালিবের পনশপ-এর চেইন আছে, ওগুলো থেকে সোনা সংগ্রহ করে ফিরছিল লোকটা? কে জানে, হয়তো তাই।

সুবর্ণ অ্যালয় ও সুবর্ণ ভিলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি ও কারখানা, দুটোই পুরানো। প্রধান সড়ক থেকে বেশ কিছুটা দূরে জায়গাটা। এক সময় রাবার চাষ হত এদিকে, প্লান্টগুলো অনেক বছর হলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এরকম ভূতুড়ে জায়গায় সাধারণত কেউ বাড়ি কিংবা কারখানা বানায় না। গালিবের কথা অবশ্য আলাদা। নিশ্চয়ই গোপন কিছু করার জন্য এই জায়গাটা বেছে নিতে হয়েছে তাকে।

কাঁচ দিয়ে ঘেরা পোর্টিকো দেখতে পেল রানা। লোকজন দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল ও। ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এসে বাড়িটার দিকে ভাল করে তাকাল।

ফ্যাক্টরির প্রথম অংশটা বাড়ির ডান পাশে হলেও, দ্বিতীয় অংশটা ইংরেজি এল হরফের আকৃতি নিয়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেছে। সেদিক থেকে হাপরের মত আওয়াজ ভেসে আসছে, যেন বড়সড় কোনও প্রাণী হাঁপাচ্ছে। আকাশ ছোঁয়া চিমনি থেকে ধোঁয়া কিংবা বাষ্প বেরুতে দেখল ও।

কয়েকটা ধাপ বেয়ে উঠতে হলো, তারপর ঝাপসা কাঁচ লাগানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাপ দিল কলিং বেলে। বেল বাজার কোনও আওয়াজ শুনতে পেল না রানা। তবে ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। এখনও বোলার হ্যাট পরে আছে কোরিয়ান শোফার। রানার দিকে তাকাল, তবে চোখে কোনও রকম আগ্রহ নেই। দাঁড়িয়ে আছে অটল, বাম হাত ভিতর দিকের ডোরনব-এ, লম্বা করা ডান হাত সাইনবোর্ডের তীরচিহ্নের মত বাড়ির আধো অন্ধকার হল-এর দিকে তাক করা।

ভুল করে আলগোছে তার পা মাড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটাকে দমন করে লোকটাকে পাশ কাটাল রানা, এগোল সামনে।

হলটা মেইন লিভিং রুমও বটে। প্রায় অন্ধকার ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। দুটো ক্লাব চেয়ার ও এক সেট সোফা আগুনের দিকে মুখ করে ফেলা। সোফার সামনে একটা নিচু সেটি, তাতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হুইস্কি ও ব্র্যান্ডির বোতল আর গ্লাস সহ একটা ট্রে রয়েছে।

কামরার একদিকের দেয়াল জুড়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্ম ঝুলছে, তাদের মধ্যে ভ্যান গগ ও দা ভিঞ্চিও আছে। রিপ্রোডাকশন বলে ধরে নিল রানা। আরেক দিকের দেয়ালে নানা ধরনের শো-পিস: মূল্যবান পাথর, ঝিনুক, দুষ্প্রাপ্য আর্টিফ্যাক্ট, বিচিত্র হ্যান্ডিক্রাফট।

কাঠের চওড়া সিঁড়িটা বাম দিকে।

রানা এ-সব দেখছে, নিঃশব্দে এগিয়ে এল কোরিয়ান শোফার। সে তার তীরচিহ্নটা এবার চেয়ার ও ড্রিঙ্ক ট্রে-র দিকে তাক করল। মাথা ঝাঁকিয়ে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ওকে পাশ কাটিয়ে একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। ওদিকটা বোধহয় সার্ভেন্টস কোয়ার্টার, আন্দাজ করল ও।

মান্ধাতা আমলের দেয়ালঘড়ি টিক-টিক করছে। আর কোনও শব্দ নেই। নিস্তেজ আগুনটার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল রানা। এরকম একটা এলাকায়, এরকম একটা বাড়িতে দুনিয়ার সেরা ধনীদের একজন বাস করে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

কোথায় একটা টেলিফোন বাজল। নিচু, ফিসফিসে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। একটু পর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। সিঁড়ির নীচের একটা দরজা খুলে গেল। কামরায় ঢুকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল সৌবর্ণ গালিব। লালচে-বেগুনি রঙের ভেলভেট জ্যাকেট পরেছে সে। পালিশ করা কাঠের মেঝেতে সাবধানে পা ফেলে হেঁটে এল। হাতটা বাড়াল না। মুখে হাসি, বলল, 'এরকম শর্ট নোটিশে কষ্ট করে এসেছেন, সেজন্যে আমি কৃতার্থ বোধ করছি, রানা। আপনি একা, আমিও তাই, তাই ভাবলাম আমরা হয়তো

আলোচনা করে দেখতে পারি পরস্পরের জন্যে কার কী করার আছে।'

'দাওয়াত পেয়ে সত্যি আমি খুশি হয়েছি,' বলল রানা। 'নিজের সমস্যা নিয়ে স্রেফ বোর হচ্ছিলাম। র‍্যামসগেটে এমন কিছু নেই যে সব ভুলিয়ে দিতে পারে।'

'না। এবার আমাকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। একটা ফোন এসেছে। আমার এক কর্মচারী পুলিশের সঙ্গে কী একটা ঝামেলা বাধিয়ে বসেছে, আমি না গেলে ব্যাপারটার সুরাহা হবে না। আমার সব কর্মচারীই কোরিয়ান, আর ওদেরকে নিয়ে সমস্যা হলো, একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

'যাই হোক, শোফারকে নিয়ে ওখানে যেতে হচ্ছে আমাকে। বাড়িতে একা শুধু আপনি থাকবেন। আপনি আর আপনার ফ্যান্টাসি। না, বেশি দেরি হবে না। খুব জোর আধ ঘণ্টা। ড্রিঙ্ক আছে, ম্যাগাজিন আছে··· আপনি কিছু মনে করছেন না তো? প্লিজ, সত্যি ক্ষমা চাই!'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ঝামেলা যখন হয়েছে, যেতে তো হবেই।' অনুভব করছে, এর মধ্যে গোলমেলে কিছু আছে। কিন্তু সেটা কী বুঝতে পারছে না।

'বেশ তা হলে, আপাতত বিদায়।' সামনের দরজার দিকে এগোল গালিব। 'তবে আলোর ব্যবস্থা করে যাই। কামরাটা বড় বেশি অন্ধকার।' ওয়াল প্লেটের সুইচ লক্ষ্য করে হাত ঝাপটাল সে। অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে গেল কামরাটা। সিলিঙের চারটে ঝাড়-বাতি, তিনটে স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রিক ল্যাম্প, ওয়াল ব্রাকেটের ভিতর পাঁচটা বালব একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার, আবছা ভাবে দেখল, দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে গালিব। এক মিনিট পর গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ হলো। এটা অন্য কোনও গাড়ি, রোলসরয়েস নয়। গিয়ার বদলে ড্রাইভ ধরে ছুটছে।

হেঁটে এসে সামনের দরজাটা খুলে বাইরে তাকাল রানা। ড্রাইভ খালি পড়ে আছে। দূরে গাড়ির আলো দেখা গেল, বাম দিকে বাঁক নিয়ে প্রধান সড়কে উঠছে।

দরজা বন্ধ করে চিন্তা করছে রানা। ব্যাপারটার অর্থ কী? ঠিক কী ঘটল? নিঃশব্দ পায়ে সার্ভিস ডোর-এর সামনে এসে দাঁড়াল ও। খুলল ওটা। অন্ধকার একটা প্যাসেজ, বোধহয় বাড়ির পিছন দিকে চলে গেছে।

দরজা বন্ধ করে আলোর বন্যায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ওর প্রতিটি ইন্দ্রিয় টান টান হয়ে আছে। সৌবর্ণ গালিবের বাড়িতে একা বসিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে ওকে। কেন?

ট্রের কাছে হেঁটে এসে গ্লাসে সামান্য একটু ব্র্যান্ডি ঢালল রানা। টেলিফোন অবশ্যই একটা এসেছে, তবে সেটা ফ্যাক্টরি থেকে কাউকে দিয়ে অনায়াসেই করানো যেতে পারে। পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা বাধিয়েছে কর্মচারী, এটা বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প হতে পারে, তার জামিনের জন্য শোফারকে নিয়ে গালিবের যেতে চাওয়াটা অযৌক্তিক কিছু নয়। গালিব বলে গেছে আধ ঘণ্টার জন্য একা থাকবে ও; ও আর ওর ফ্যান্টাসি। কিন্তু কী বোঝাতে চেয়েছে সে? চুপিসারে কিছু করবার আমন্ত্রণ? চ্যালেঞ্জ? ওর উপর আড়াল থেকে নজর রাখছে কেউ? কে জানে এখানে কতজন কোরিয়ান আছে, কিংবা তারা এখন কে কী করছে। হাতঘড়ি দেখল রানা। এরইমধ্যে পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। ফাঁদ হোক বা না হোক, এরকম একটা সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। চারদিকটা ঘুরে দেখবে ও, তবে আচরণে নিরীহ ভাবটা বজায় রাখবে, এবং হল ছেড়ে বেরোবার অজুহাত হিসাবে একটা কাভার স্টোরি-ও তৈরি করবে।

কোত্থেকে শুরু করা যায়? ফ্যাক্টরিটা দেখে আসুক। গল্পটা কী হবে? আসার পথে গাড়িটা গোলমাল করেছে... একজন মেকানিকের সাহায্য পাওয়া যায় কিনা দেখতে গিয়েছিল। ভঙ্গুর,

তবে এ দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

ব্র্যান্ডিটুকু গলাধঃকরণ করে সার্ভিস ডোর খুলল রানা, তারপর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল ও, লম্বা প্যাসেজ ধরে সাবধানে এগোচ্ছে।

প্যাসেজ শেষ হয়েছে নিরেট দেয়ালে, সেটার ডানে ও বাঁয়ে একটা করে দরজা। একটার কপাটে কান রেখে কিচেন থেকে ভেসে আসা ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পেল। ডান দিকের দরজাটা খুলল ও। সামনে পাকা উঠান, জায়গাটাকে গ্যারেজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়; অন্তত পাঁচ-ছটা গাড়ি রাখা হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আর্ক লাইটের উজ্জ্বল আলোয় দিনের মত হয়ে আছে উঠানটা। শেষ প্রান্তে ফ্যাক্টরির লম্বা পাঁচিল দেখা যাচ্ছে, ইঞ্জিন আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির আওয়াজ বেশ জোরেই আঘাত করছে কানে।

পাঁচিলের গায়ে সাধারণ একটা কাঠের দরজা। উঠানটা পার হয়ে এসে ওটার সামনে দাঁড়াল রানা। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খুলল, ভিতরে ঢুকে কবাট দুটো ভিড়িয়ে দিল। ছোট একটা খালি অফিস এটা, সিলিং থেকে নগ্ন বালব ঝুলছে। কাগজ-পত্রসহ ডেস্ক টেবিল-ঘড়ি, একজোড়া ফাইলিং কেবিনেট ও টেলিফোন দেখা যাচ্ছে। আরেকটা দরজা দিয়ে মূল ফ্যাক্টরির ভিতরে ঢোকা যায়। পাশেই জানালা, শ্রমিকদের উপর নজর রাখার জন্য। এটা তা হলে ফোরম্যানের অফিস। জানালার সামনে চলে এসে বাইরে তাকাল রানা।

ছোট ধরনের মেটাল ফ্যাক্টরি যেমন হওয়ার কথা, এটাও সেরকম ওর মুখোমুখি রয়েছে দুটো ব্লাস্ট ফারনেস-এর খোলা মুখ, তবে এই মুহূর্তে কোনওটাতেই আগুন জ্বলছে না। ওগুলোর পাশে এক সারি আভন রয়েছে। কাছাকাছি দেয়ালের গায়ে বিভিন্ন রঙ ও আকারের ধাতব পাত দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। আরও আছে গোলাকার স-মেশিনসহ ইস্পাতের চকচকে টেবিল, ডায়মন্ড

আকৃতির শিটকাটিং মেশিন, বামদিকের ছায়ার ভিতরে বড়সড় অয়েল ইঞ্জিন; পাওয়ার তৈরিতে ব্যস্ত বিরাট জেনারেটরের সঙ্গে সংযুক্ত।

ডান দিকে, আর্কলাইটের নীচে, চারজন কোরিয়ান কাজ করছে সৌবর্ণ গালিবের রোলসরয়েসটা নিয়ে। উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে গাড়িটা। ওটার ডানদিকের দরজা খুলে কাছাকাছি একজোড়া বেঞ্চের উপর রাখা হয়েছে। রানার চোখের সামনে দুজন লোক নতুন একটা দরজা মেঝে থেকে তুলল। অ্যালুমিনিয়াম রঙের মেটাল দিয়ে তৈরি, অত্যন্ত ভারী। এই মুহূর্তে ডোর ফ্রেমে ফিট করা হচ্ছে ওটা। রানা আন্দাজ করল, একটু পরেই গাড়ির বাকি অংশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রঙ করা হবে নতুন দরজাটা। ব্যাপারটা স্বাভাবিক ও নির্দোষ। আজ বিকেলের দিকে দরজাটা তুবড়ে ফেলে গালিব, তাই কাল রওনা হওয়ার আগে নতুন একটা লাগানো হলো।

বিরূপ দৃষ্টিতে ফ্যাক্টরির চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে জানালার সামনে থেকে সরে এল রানা। প্যাসেজ ধরে হল-এ ফেরার সময় ভাবছে, ওর গল্পটার কী হবে? কাজে ব্যস্ত লোকজনকে বিরক্ত করতে চায়নি? ডিনারের পর দেখবে, তাদের কেউ সময় দিতে পারে কি না।

হাতঘড়ি দেখল রানা। গালিবের ফিরতে এখনও দশ মিনিট বাকি। এবার দোতলাটা দেখতে হয়। একটা বাড়ির রহস্যময় জায়গা হলো বেডরুম আর বাথরুম। ওগুলোয় মেডিসিন কেবিনেট, ড্রেসিং টেবিল থাকে। বলা যাবে হঠাৎ মাথাটা খুব ধরেছিল। দোতলায় উঠতে হয়েছে অ্যাসপিরিন-এর খোঁজে।

দোতলায় পাশাপাশি কয়েকটা বেডরুম পাওয়া গেল, একটারও বিছানা তৈরি করা হয়নি, ভিতরে গুমোট ভাব। করিডরের আরেক পাশে একটা গ্যালারি। কোত্থেকে কে জানে লালচে-খয়েরি রঙের একটা নাদুসনুদুস বিড়াল উদয় হলো, অনুসরণ করছে ওকে।

মাঝেমধ্যে মিউ মিউ করে ডাকল, গা ঘষল ওর ট্রাউজারের পায়ায়। করিডরের শেষ কামরাটা পরিপাটি। ভিতরে ঢুকে কবাট ঠেলে দিল রানা, সরু একটু ফাঁক রাখল শুধু।

কামরার সবগুলো আলো জ্বলছে। হয়তো চাকরবাকরদের কেউ বাথরুমে আছে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল রানা। বাথরুমেও প্রচুর আলো, কিন্তু কেউ নেই। ভিতরে বেশ বড় একটা জায়গা, তবে খালি নয়। নানা ধরনের ফিটনেস ইকুইপমেন্ট রয়েছে: রোয়িং মেশিন, ফিক্সড বাইসাইকেল হুইল, ইন্ডিয়ান ক্লাবস, হেলথ বেল্ট ইত্যাদি। মেডিসিন কেবিনেটে বেশ কিছু ওষুধ আছে, তবে অ্যাসপিরিন কিংবা কোনও ড্রাগস নেই। বেডরুমে ফিরে এসেও কিছু পেল না রানা।

হাতঘড়ি দেখল। আর পাঁচ মিনিট বাকি। কামরার চারদিকে শেষ একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগোল। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করল ও। কোথাও একটা কিছু আছে। কী সেটা? কোনও রঙ? গন্ধ? অন্য কিছু? কী? শব্দ? এই তো, হ্যাঁ! যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, এখান থেকে অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে। একটা গুঞ্জন, যেন মশার সঙ্গীত। কোত্থেকে আসছে আওয়াজটা, উৎসটা কী? এখন আরও একটা কী যেন আছে কামরায়, ওর অত্যন্ত পরিচিত কিছু, বিপদের গন্ধ।

টান টান হয়ে আছে শরীরের সমস্ত পেশি, দরজার পাশের কাবার্ড-এর দিকে এগোল রানা। সাবধানে, ধীরে ধীরে খুলল ওটা। হ্যাঁ, আওয়াজটা এই কাবার্ডের ভিতর থেকেই বেরুচ্ছে। হ্যাঙ্গারের সঙ্গে কয়েকটা স্পোর্টস কোট ঝুলছে, সেগুলো একপাশে সরাতেই শক্ত হয়ে উঠল ওর চোয়াল। কাবার্ডের পিছনের দেয়ালে একটা নয়, তিন-তিনটে সিনে-ক্যামেরা ফিট করা হয়েছে। খোদাই জানে লেন্সগুলো কোথায়। যেখানেই থাক, সন্দেহ নেই, রানার প্রতিটি নড়াচড়ার ছবি তোলা হয়ে গেছে।

নিজেকে তিরস্কার করল রানা। এরকম উজ্জ্বল আলোর তাৎপর্য আগে কেন বোঝেনি ও? এখন তো ওকে পেয়ে বসবে গালিব। তার কাছে ধরা পড়ে গেছে ও।

ওখানে দাঁড়িয়ে দ্রুত চিন্তা করছে রানা। করার যে একেবারে কিছু নেই, তা নয়। ক্যামেরাগুলোর ফিল্ম এক্সপোজ করে দিলে ওর গতিবিধির কোনও রেকর্ড থাকবে না। কিন্তু কাবার্ডের দরজা কে খুলল এ প্রশ্ন উঠবে। তার কী জবাব?

ট্রাউজারের পায়ে গা ঘষে লালচে-খয়েরি বিড়াল বলল, 'মিউ।' এটাই জবাব, ভাবল রানা, এই বিড়ালটা।

দ্রুত হাতে এক এক করে তিনটে ক্যামেরা খুলে ফিল্মগুলো এক্সপোজ করল রানা। তারপর আদর করার ছলে বিড়ালটাকে দু'হাতে ধরে ঢোকাল কাবার্ডের ভিতরে। একটা দেরাজের উপর বসিয়ে দিতে আরেকবার মিউ করে ডাকল ওটা, একটা হাই তুলল; বোধহয় ঘুম পেয়েছে।

কাবার্ডের দরজা বন্ধ করে হল-এ নেমে এল রানা। 'বিড়াল অ্যালিবাই' বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য দরজাগুলো খুলে রেখে এসেছে ও। গালিব অবশ্য শতকরা নব্বুই ভাগ সন্দেহ করবে রানাকে, তবু দশ ভাগ অনিশ্চয়তাও এই অবস্থায় কম নয়।

একটা ম্যাগাজিন নিয়ে সোফায় বসল রানা। ড্রাইভ ধরে কোনও গাড়ি আসার শব্দ পায়নি ও, শব্দ হয়নি দরজা খোলারও, তবে ঘাড়ে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস অনুভব করল। বুঝতে পারছে, কামরার ভিতরে ফিরে এসেছে সৌবর্ণ গালিব।

আট

ম্যাগাজিন রেখে দাঁড়াল রানা। সামনের দরজা সশব্দে বন্ধ হলো। ঘুরল ও। 'হ্যালো।' চোখে-মুখে মৃদু বিস্ময়। 'আপনার ফিরে আসার আওয়াজ পাইনি। ঝামেলাটা মিটেছে?'

গালিবের হাবভাবও স্বাভাবিক। ওরা যেন পরস্পরের পুরানো বন্ধু। 'ও, হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার এক লোককে এয়ার ফোর্সের অফিসাররা ব্লাডি জাপ বলেছিল। পুলিশকে আমার ব্যাখ্যা করতে হলো, কোরিয়ানদেরকে জাপানি বললে ভয়ানক অপমানিত বোধ করে তারা। সাবধান করে দিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। আপনাকে একা বসিয়ে রেখে গেছি, সেজন্যে সত্যি দুঃখিত, রানা। আশা করি বোর হননি আপনি। আরও একটা ড্রিঙ্ক নিন।'

'ধন্যবাদ। তবে মনে হলো গেলেন আর এলেন, যেন পাঁচ মিনিটও লাগেনি আপনার।' ইঙ্গিতে ম্যাগাজিনগুলো দেখাল। 'আসলে এগুলো সময় কাটাতে সাহায্য করেছে আমাকে।'

'এক মিনিট,' বলে সিঁড়ির দিকে এগোল গালিব। 'ওপর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এখনই আসছি।'

গালিব চলে যাওয়ার পর সোফায় বসে একটা গ্লাসে সামান্য হুইস্কি ঢালল রানা। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে কাবার্ডের দরজা খুলে বিড়ালটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে গালিব।

উপরতলায় কবরের নীরবতা। তবে কয়েক মুহূর্ত পর বাথরুমের দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে এল।

দু'মিনিট পর সিঁড়ির ধাপে পায়ের আওয়াজ হলো। নেমে

আসছে গালিব। হাতের ম্যাগাজিন নামিয়ে রেখে চোখ তুলল রানা। এক হাতের ভাঁজে নাদুসনুদুস বিড়ালটাকে অযত্নের সঙ্গে আটকে রেখেছে গালিব। ফায়ারপ্লেসের কাছে এসে একটা বোতামে চাপ দিল সে। তারপর রানার দিকে ফিরল। 'আপনি বিড়াল পছন্দ করেন, রানা?' জিজ্ঞেস করল সে, চোখে কোনও কৌতূহল নেই।

'করি।'

সার্ভিস ডোর খুলে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শোফার। লোকটা এখনও বোলার হ্যাট ও চকচকে কালো গ্লাভস পরে আছে। গম্ভীর মুখে গালিবের দিকে তাকাল সে। একটা আঙুল নেড়ে তাকে কাছে আসার ইঙ্গিত করল গালিব। এগিয়ে এসে ফায়ারপ্লেসের সামনে, ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়াল শোফার।

রানার দিকে তাকাল গালিব। হালকা সুরে; যেন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে, বলল, 'এ হলো হুনমিন আসান। ছোটখাট কোনও মুশকিলে পড়লে আসান করে দেয় ও, তাই মাঝে মধ্যে ওকে আমি মুশকিল আসান নামেও ডাকি।' হাসছে সে। 'সবুর, একটু জোক করি। হুনমিন আসান, মিস্টার রানাকে তোমার হাত দুটো দেখাও।' রানার দিকে ফিরে আবার হাসল সে। 'আমার স্টাফকে ঠিক রাখতে আসানের সাহায্য না হলে চলে না।'

ধীরেসুস্থে হাতের গ্লাভস খুলে ফেলল কোরিয়ান লোকটা, রানার চার ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়াল সে, তারপর হাত দুটো লম্বা করল; দুই তালু উপরদিকে। সোফা ছেড়ে হাত দুটোর দিকে তাকাল রানা। বড় আকৃতির হাত, মোটা মোটা পেশি। প্রতিটি আঙুলের দৈর্ঘ্য একই রকম মনে হলো। ভোঁতা ডগাগুলো এত বেশি চকচকে, যেন হলুদ হাড় দিয়ে তৈরি।

'ঘোরাও ওগুলো। মিস্টার রানাকে কিনারাগুলো দেখাও।'

আঙুলের আগায় কোনও নখ নেই। হাত দুটোর কিনারা দেখাল সে। একই রকম শক্ত, হাড়সদৃশ বর্ম।

চোখ তুলে গালিবের দিকে তাকাল রানা।

গালিব হাসল। বলল, 'দাঁড়াও, একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি।' মোটাসোটা কাঠের রেলিংটা দেখাল সে, সিঁড়ির কিনারা ধরে উঠে গেছে। 'ওটা ছয় বাই চার ইঞ্চি পুরু।'

সুবোধ বালকের মত সিঁড়ির দিকে এগোল শোফার। দু'তিন ধাপ উপরে উঠে থামল সে, হাত দুটো শরীরের পাশে ঝুলিয়ে রেখে গালিবের দিকে তাকাল। তার উদ্দেশে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল গালিব।

গম্ভীর মুখে ডান হাতটা মাথার পাশে খাড়া করল কোরিয়ান লোকটা, তারপর একটা কুড়ালের মত সবেগে পালিশ করা রেলিঙের উপর নামিয়ে আনল। কড়াৎ করে কাঠ ভাঙার আওয়াজ হলো, মাঝখানে ঝুলে পড়ল রেলিংটা। আবার উঠল হাত, নামল সবেগে। এবার রেলিং ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, দু'পাশে এবড়োখেবড়ো কিনারা দেখা যাচ্ছে। কাঠের ছিলকা আর টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের মেঝেতে।

সিধে হয়ে টান টান ভঙ্গিতে দাঁড়াল শোফার, পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়। চেহারায় এতটুকু উত্তেজনা নেই, নেই এতটুকু গর্ব।

ইঙ্গিত করল গালিব। সিঁড়ির ধাপ থেকে নেমে ফায়ারপ্লেসের কাছে ফিরে এল হুনমিন আসান। রানার দিকে তাকিয়ে গালিব বলল, 'ওর পা দুটোও একই রকম, বাইরের কিনারাগুলো। মুশকিল আসান, ম্যান্টেলপিস।' হাত তুলে ফায়ারপ্লেসের মাথার উপর খিলান আকৃতির কাঠের ভারী শেলফটা দেখাল। মেঝে থেকে প্রায় সাত উঁচু ওটা। শোফারের বোলার হ্যাট থেকে ছয় ইঞ্চি উঁচু।

'ঘঁওঘঁও কঁ-কঁ?' দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলল আসান।

'হ্যাঁ, কোট আর হ্যাট খুলে ফেলো।' রানার দিকে ফিরল গালিব। 'বেচারার টাকরায় ফুটো আছে। আমি ছাড়া খুব কম লোকই ওর আওয়াজের অর্থ করতে পারে।'

তাতে তোমার খুব সুবিধেই হয়েছে, ভাবল রানা।

কোট ও হ্যাট খুলে একপাশের মেঝেতে সযত্নে রাখল হুনমিন আসান। ট্রাউজারের পায়া গুটিয়ে হাঁটু পর্যন্ত তুলল সে. তারপর

পিছিয়ে এসে জুডো এক্সপার্ট-এর ভঙ্গিতে দু'পা ফাঁক করে পজিশন নিল। দেখে মনে হলো ছুটে আসা একটা উন্মত্ত হাতিও তার ভারসাম্য নষ্ট করতে পারবে না।

'তুমি বরং পিছিয়ে এসো, রানা।' গালিবের চওড়া মুখে মুক্তোর মত দ্যুতি ছড়াচ্ছে দাঁতগুলো। 'ওর এই ঘুসি মানুষের ঘাড়কে পাটখড়ির মত মট করে ভেঙে ফেলবে।' ট্রেসহ নিচু সেটিটা টেনে সরিয়ে নিল সে। এবার ছোটার জন্য ফাঁকা জায়গা পেল হুনমিন আসান। তবে মাত্র তিন কদম দূরে রয়েছে। কীভাবে সে অত উঁচু ম্যান্টেলপিসটার নাগাল পাবে?

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। চ্যাপ্টা, হলুদ মুখোশের গায়ে সরু চোখ দুটোয় এই মুহূর্তে তীব্র একাগ্রতা ফুটে উঠেছে। এরকম একজন লোকের পাল্লায় পড়লে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যেতে হয়।

গালিব হাত তুলল। হাঁটু বাঁকা রেখেই দীর্ঘ একটা পদক্ষেপ নিল কোরিয়ান লোকটা, তারপর লাফ দিল। শূন্যে ওঠার পর ব্যালে ডান্সার-এর মত দুই পা এক করল, তবে কোনও ব্যালে ডান্সারের পা এতটা উপরে ওঠে না, তারপর পাশে ও নীচের দিকে বেঁকে গেল শরীরটা, ডান পা স্যাৎ করে পিস্টনের মত ছুটল। সংঘর্ষের আওয়াজ হলো। সাবলীল ভঙ্গিতে নীচে নামল শরীরটা দুই হাতে ভর দিয়ে, এই মুহর্তে মেঝেতে লম্বা হয়ে রয়েছে, ভার সহ্য করার জন্য বাঁকা হয়ে আছে কনুই।

কনুই দুটো সিধে হলো, ছোট একটা লাফ দিয়ে দাঁড়াল শোফার। শরীরটা টান টান করল সে। তার পায়ের কিনারা ম্যান্টেলপিসের ইঞ্চি তিনেক উড়িয়ে দিয়েছে। ভাঙা অংশটার দিকে তাকাল সে, এবার তার সরু চোখে বিজয়ের ক্ষীণ আনন্দ ফুটল।

লোকটার দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে রানা। আন-আর্মড কমব্যাটে এই লোকের সঙ্গে কেউ জিততে পারবে বলে মনে হয় না। অন্তত নিজের কথা জানে রানা, বাধ্য না হলে তার সঙ্গে লাগতে যাবে না ও। দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী এই

কোরিয়ান। এরকম একজন গুণী মানুষের কদর না করলে নিজের কাছেই ছোট হতে হয়। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল ও।

'আস্তে, আসান,' চাবুকের মত কড়কে উঠল গালিবের কণ্ঠস্বর।

মাথা ঝোঁকাল কোরিয়ান লোকটা, রানার হাতটা সাবধানে ধরল। আঙুলগুলো সোজা রেখেছে, ধরার জন্য শুধু বুড়ো আঙুল বাঁকা করেছে। তার হাত এক টুকরো বোর্ডের মত। রানাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের কাপড়চোপড়ের কাছে ফিরে গেল সে।

'কিছু মনে করবেন না, রানা। আপনার ভদ্রতাবোধের প্রশংসা করি আমি।' গালিবের চোখে-মুখে আন্তরিকতার অভাব নেই। 'কিন্তু সমস্যা হলো, হুনমিন আসান নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন নয়, বিশেষ করে যখন টেনশনে থাকে। তার ওই হাত দুটো আসলে মেশিন-টুলস। না জেনেই আপনার হাতটা ছাতু বানিয়ে ফেলতে পারত। এবার তা হলে...' ইতিমধ্যে কাপড় পরা হয়ে গেছে শোফারের, '...দারুণ দেখিয়েছে, আসান। এটা ধরো,' বগলের নীচ থেকে বিড়ালটাকে বের করে তার দিকে ছুঁড়ে দিল গালিব।

চোখে-মুখে ব্যগ্র একটা ভাব নিয়ে সেটাকে লুফে নিল হুনমিন আসান।

'ওটাকে সারাক্ষণ দেখতে দেখতে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে আমার,' বলল গালিব। 'আমি চাই ডিনার হিসেবে পেটে চালান করে দাও।' কোরিয়ান লোকটার চোখ দুটো চকচক করছে। জিভে জল চলে আসায় ঢোক গিলতে হলো তাকে। 'আর শোনো, কিচেনে গিয়ে বলো আমাদের জন্যে এখনই যেন ডিনার পরিবেশন করা হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লোকটা।

নিজের বিতৃষ্ণা ও তিক্ততা চেপে রাখল রানা। জানা কথা, এ-সব দেখানোর পিছনে দুটো উদ্দেশ্য, নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন আর ওকে সাবধান করে দেওয়া। সৌবর্ণ গালিব ওকে বলতে চাইছে,

'আমার ক্ষমতা তো দেখলে। অনায়াসে তোমাকে আমি মেরে ফেলতে পারতাম, কিংবা চিরকালের জন্যে পঙ্গু করে ছেড়ে দিতে পারতাম। মুশকিল আসান নিজের নৈপুণ্য দেখাচ্ছিল, তুমি তার সামনে পড়ে যাও। আমাকে দায়ী করার কোনও প্রশ্নই উঠত না, মুশকিল আসানও হালকা শাস্তি ভোগ করে আবার আমার কাছে ফিরে আসত। কিন্তু তার বদলে কী করলাম আমি? তোমার বদলে দণ্ড দিলাম বিড়ালটাকে। নেহাত দুর্ভাগ্যই বলতে হবে ওটার।'

নিজেকে অপরাধী মনে হলো রানার। বিড়ালটাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে যেন খুব বড় মাপের অন্যায় করেছে ও। খারাপ হয়ে গেল মনটা।

রানা শান্তকণ্ঠে জানতে চাইল, 'লোকটা সারাক্ষণ বোলার হ্যাট পরে থাকে কেন?

'আসান!' হাঁক ছাড়ল গালিব। লোকটা ইতিমধ্যে সার্ভিস ডোর-এর কাছে পৌঁছে গেছে। ডাক শুনে ঘুরল সে। 'তোমার হ্যাট।' ইঙ্গিতে ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা প্যানেল দেখাল তাকে।

ভাঁজ করা বাম হাতে বিড়ালটাকে নিয়ে ফিরে আসছে মুশকিল আসান। অর্ধেক মেঝে পার হয়েছে, এই সময় না থেমে এবং লক্ষ্যস্থির না করে, কারনিস ধরে মাথা থেকে হ্যাটটা নামিয়ে শরীরের সবটুকু শক্তিতে ছুঁড়ে দিল। জোরাল ধাতব আওয়াজ শোনা গেল। গালিবের দেখানো প্যানেলের গায়ে অন্তত তিন সেকেন্ড হ্যাটের কিনারা আধ ইঞ্চি গেঁথে থাকল, তারপর মেঝেতে পড়ে ঝন ঝন আওয়াজ করল।

সবিনয়ে রানার উদ্দেশে হাসল সৌবর্ণ গালিব। 'হালকা, তবে অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যালয়, রানা। নিশ্চয়ই ফেল্ট আচ্ছাদনের ক্ষতি হয়েছে, তবে এরপর আসান নতুন একটা পরবে।'

হ্যাটটা তুলে নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল মুশকিল আসান। একটু পরেই ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল।

'ওহ্, ডিনার! আসুন, প্লিজ।' পথ দেখাল গালিব।

ফায়ারপ্লেসের পাশে, কাঠের প্যানেলিং-এ লুকানো একটা দরজা খুলল বোতামে চাপ দিয়ে। তার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা।

ছোটখাট ডাইনিং রুম। মোমবাতি ও ঝাড়বাতির আলোয় ভেসে যাচ্ছে। বৃত্তাকার টেবিলের উপর সিলভার ও গ্লাস চকচক করছে। পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসল ওরা। সাদা জ্যাকেট পরা হলুদমুখো দুজন চাকর সার্ভিং টেবিল থেকে ডিশগুলো নিয়ে এল। প্রথম ডিশটা শুধু ইলিশ মাছ। সমস্ত কাঁটা বের করে নিয়ে পিঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজা হয়েছে। দ্বিতীয় ডিশও মাছ। রানাকে ইতস্তত করতে দেখে অভয় দিয়ে হাসল গালিব। 'আপনি যা ভাবছেন তা নয়, রানা,' বলল সে। 'ওগুলো চিংড়ি, বিড়ালের মাংস নয়।'

রানা শুধু মৃদু হাসল। ওর সামনে বরফ ভর্তি বালতিতে লম্বাটে একটা বোতল রয়েছে। দেখেই বুঝল, ওয়াইন। গ্লাসে ঢেলে স্বাদ নিল। মিষ্টি মধু, বরফের মত ঠাণ্ডা। মেজবানকে অভিনন্দন জানাল রানা।

জবাবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল গালিব। তারপর বলল, 'আমি মদ খাই না, ধূমপানও করি না। আমার শুধু একটাই নেশা... '

'কী?'

হাত ঝাপটা দিয়ে প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিল গালিব।

প্রসঙ্গ বদলে রানা বলল, 'আপনার ওই শোফার সত্যি মুগ্ধ করেছে আমাকে। এরকম ফ্যানটাসটিক কমব্যাট শিখল কোত্থেকে? কোরিয়ানদের নিজস্ব কিছু নাকি?'

মুখে ন্যাপকিন বুলাল গালিব। আঙুলগুলো ঝাপটাল সে। প্লেটগুলো সরিয়ে রোস্ট করা হাঁসের ছানা নিয়ে এল লোক দুজন, একই সঙ্গে রানার জন্য আনা হলো পঞ্চাশ বছরের পুরনো হুইস্কি। তারা সার্ভিং-টেবিলের কাছে সরে যেতে গালিব বলল, 'কারাতে-তে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছে আসান। তোমার শরীরের সাতটা জায়গা চেনে সে, যে-কোনওটায় মাত্র একটা আঘাত করলেই তুমি মারা যাবে।'

রানাকে সিরিয়াস দেখাচ্ছে। 'ইন্টারেস্টিং বলতে হবে। কারণ,

আমি তার মাত্র পাঁচটা জায়গা চিনি, যে-কোনও একটায় মারলে আপনার হুনমিন আসান পটল তুলবে।'

মন্তব্যটা শুনতে না পাওয়ার ভান করল গালিব। হাতের চামচ নামিয়ে রেখে ঢক ঢক করে পানি খেল সে।

'সে যাই হোক,' বলল রানা। 'আমি ভাবছি, এরকম একজন লোক আপনার দরকার হলো কেন? সঙ্গী হিসেবে নিশ্চয়ই... মানে, গ্রহণযোগ্য নয়।'

'ঘটনাচক্রে আমি ধনী মানুষ... বলতে পারেন বাড়াবাড়ি রকমের ধনী,' আত্মতৃপ্তির হাসি দেখা গেল গালিবের মুখে। 'আর যে যত বেশি ধনী, তার তত বেশি প্রোটেকশন দরকার।'

ডেজার্টের পর কফি পরিবেশিত হলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগার ধরাল রানা। 'আপনার গাড়িটার প্রশংসা না করে পারছি না। তবে মডেলটা বড় বেশি পুরনো, তাই না?'

'পুরনো ঠিকই, তবে ওটার অনেক কিছুই বদলে ফেলেছি আমি,' জবাব দিল গালিব। 'নতুন স্প্রিং। ব্রেকিং পাওয়ার বাড়ানোর জন্যে পেছনের চাকায় ডিস্ক ব্রেকস ফিট করেছি।'

'তার দরকার ছিল কি? টপ স্পিড নিশ্চয়ই পঞ্চাশের বেশি নয়।'

'কিন্তু ওজন? শুধু আর্মার প্লেটিং-এর ওজনই তো এক টন।'

'বুঝেছি। কেউ বলবে না সৌখিন নন আপনি। কিন্তু অত ভারী একটা জিনিসকে চ্যানেলের ওপর দিয়ে কীভাবে উড়িয়ে নিয়ে যাবেন? একটা প্লেনের প্রায় সবটুকু মেঝে দখল করে নেবে না? তা হলে প্যাসেঞ্জাররা কোথায় বসবে?'

'প্লেনে যখন চড়ি, তখন পুরোটাই আমার। উপায় কী, চার্টার করতে হয়। বছরে দু'চারবার।'

'স্রেফ গোটা ইউরোপে ঘুরে বেড়াবেন?'

'আসলে গলফিং হলিডে।'

'খুবই ইন্টারেস্টিং। আমারও স্বপ্ন ছিল এভাবে ঘুরে বেড়ানোর।'

টোপটা গিলল না গালিব। 'আপনার তো এখন সামর্থ্য আছে।'

মৃদু হাসল রানা। 'ওহ্, জেতা টাকার কথা বলছেন। কিন্তু আমি যদি কানাডায় যাবার সিদ্ধান্ত নিই তা হলে ওগুলো লাগবে।'

'আপনার ধারণা, ওখানে আপনি ভাল করবেন? ইচ্ছেটাও তাই, প্রচুর টাকার মালিক হওয়া?'

রানার কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল ভাব চলে এল। 'খুব চাই। কাজ করার আর কী কারণ থাকতে পারে মানুষের, বলুন?'

'কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কী জানেন, টাকা বানাবার বেশির ভাগ পদ্ধতিতেই প্রচুর সময় লেগে যায়। টাকা কামাবার পর দেখা যায় লোকটা বুড়ো হয়ে গেছে।'

'সেটাই তো মুশকিল। আমি তাই সব সময় শর্টকাট খুঁজি। এখানে সেটা পাবার কোনও উপায় নেই। এখানে ট্যাক্স ইত্যাদি খুব বেশি।'

'ঠিক। আইনও খুব কড়া।'

'হ্যাঁ। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমিও সেটা টের পেয়েছি।'

'তাই?'

'হেরোইনের ব্যবসায় ঢুকে পড়েছিলাম। কোনও রকমে গা বাঁচিয়ে সরে এসেছি। আশা করি কথাটা তৃতীয় কারও কানে যাবে না?'

কাঁধ ঝাঁকাল গালিব। 'পুলিশকে সাহায্য করা আমার নীতি নয়।' একটু থেমে আবার বলল, 'স্বীকার না করে উপায় নেই, আপনার অনেক গুণ আছে। এখনও আপনি ওপরে উঠে আসেননি কেন, সেটাই আশ্চর্য।'

'আমার আসলে একটা ব্রেক দরকার,' বলল রানা।

'ঠিক আছে,' বলে চেয়ার ছাড়ল গালিব। রানাও দাঁড়াল। 'সন্ধেটা দারুণ উপভোগ করলাম। কোন্ দুঃখে হিরোইনের ব্যবসায় হাত দিতে যাব, বলুন? মোটা টাকা কামাবার অনেক নিরাপদ উপায় থাকতে? প্রথমে দেখতে হবে হিসেব মেলে কিনা. তারপর

ঝক্কি-ঝামেলা পোহাবার জন্যে তৈরি হতে হবে। টাকা দ্বিগুণ করার একটা পন্থার কথা শুনতে চান?'

'নিশ্চয়ই।'

মৃদু হাসি ফুটল গালিবের ঠোঁটে। 'দ্বিগুণ করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো, আপনার টাকা দু'বার ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিন।'

হাসির জবাবে হাসল রানা, কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল। তেমন সুবিধে করা যাচ্ছে না। গালিব ওকে আশ্বাস দিয়ে কিছু বলছে না। তবে মন থেকে তাড়াহুড়ো না করবার নির্দেশ পাচ্ছে ও।

হল-এ ফিরে এল ওরা। হাত বাড়াল রানা। 'চমৎকার ডিনারের জন্যে ধন্যবাদ। এবার বিদায় নিতে হয়, ঘুম পাচ্ছে। আবার হয়তো কোনও দিন দেখা হবে আমাদের।'

সামান্য একটু চাপ দিয়ে রানার হাতটা ছেড়ে দিল গালিব। ওর দিকে কঠিন চোখে তাকাল সে। বলল, 'দেখা হলে আমি মোটেও অবাক হব না, রানা।'

হোটেলে ফেরার পথে গালিবের শেষ কথাটার তাৎপর্য নিয়ে ভাবছে রানা। একটা মানে হতে পারে, গালিব নিজেই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কিংবা সে চায় রানাই নিজের গরজে তার আশপাশে থাকুক। প্রথমটা হেড, দ্বিতীয়টা টেইল।

হোটেলে ফিরে ড্রেসিং টেবিল থেকে একটা কয়েন তুলল রানা। টস করতে দেখা গেল, টেইল। তার মানে গালিবের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করতে হবে ওকে।

বেশ, তাই। তবে এবারে দেখা হওয়ার সময় ওর কাভারটা হওয়া চাই অত্যন্ত মজবুত। বিছানায় শুয়ে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

নয়

সকাল ন'টায় ঘুম থেকে উঠে ওর এজেন্সির লন্ডন শাখায় ফোন করল রানা। শাখা প্রধান অনুভব ইশতিয়াককে কয়েকটা কাজ দিল, সবশেষে বলল, প্রয়োজনে একটি ফোন নম্বরে ডায়াল করে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাহায্য চাইতে পারবে সে।

শাওয়ার সেরে জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিল রানা। এক কাপ কফি নিয়ে বসেছে, ফোন করল ইশতিয়াক। তার কাছ থেকে জানা গেল, সৌবর্ণ গালিব একটি বিমান চার্টার করেছে। বেলা বারোটার সময় ফেরিফিল্ড থেকে টেক-অফ করবার কথা।

ফেরিফিল্ডে ঠিক এগারোটায় পৌঁছাল রানা। চিফ পাসপোর্ট কন্ট্রোল ও কাস্টমস অফিসাররা অপেক্ষা করছিলেন ওর জন্য। দেরি না করে ওর গাড়িটা চোখের আড়ালে, একটা খালি হ্যাঙ্গারে সরিয়ে নেওয়া হলো। কফির কাপে চুমুক দিয়ে পাসপোর্ট কর্মকর্তার সঙ্গে গল্প করছে রানা। তিনি ধরে নিয়েছেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসার ও। তাঁর ধারণা পাল্টাবার কোনও চেষ্টা নেই রানার। না, তাঁকে জানাল ও, সৌবর্ণ গালিব নিজে কোনও সমস্যা নন। আশঙ্কা করা হচ্ছে তাঁর একজন কর্মচারী দেশ থেকে কিছু অবৈধভাবে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা গোপনীয়। রানা কি গোপনে রোলসরয়েসটা মিনিট দশেকের জন্য পরীক্ষা করতে পারবে? টুল কিট-এ চোখ বুলাতে চায় ও। আর কাস্টমসকে অনুরোধ, লুকানো কমপার্টমেন্টের খোঁজে তারা যেন গাড়িটা ভালমত একবার তল্লাশি চালায়।

এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কাস্টমসের এক অফিসার দরজা দিয়ে ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে রানার উদ্দেশে চোখ মটকালেন। 'আসছেন ভদ্রলোক। শোফার সহ তাঁকে গাড়ির আগে প্লেনে চড়তে অনুরোধ করা হবে। বলা হবে, ওয়েট ডিসট্রিবিউশন নিয়ে টেকনিকাল একটা ব্যাপার আছে। শুনতে মিথ্যে অজুহাতের মত শোনালেও, বাস্তবে তা নয়।'

'কী রকম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুরানো এই বাক্সটা চিনি আমরা। ওটা আর্মার প্লেটেড। প্রায় তিন টনের মত ওজন। প্লেনের ঠিক কোনদিকটায় ওটাকে রাখা হবে, বিবেচনার বিষয়। যাই হোক, আমরা তৈরি হয়েই ডাকব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ।'

পাসপোর্ট কর্মকর্তাও বাইরে চলে গেলেন। একা হতেই পকেট থেকে ছোট্ট প্যাকেটটা বের করে খুলল রানা। আধ ইঞ্চি লম্বা, ক্যাপসুল আকৃতির একটা বিপার, খুদে ব্যাটারিতে চলে। রিসিভারটা গাড়ির ড্যাশবোর্ডের নীচে লুকানো আছে। গাড়ির সঙ্গে এ-ধরনের আরও দু'একটা যন্ত্র দিয়েছে ওকে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, দেখা যাক কেমন কাজ করে।

এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে আবার খুলে গেল দরজা। কাস্টমস অফিসার হাতছানি দিলেন। 'কোনও সমস্যা হয়নি। শোফারকে নিয়ে প্লেনে উঠে পড়েছেন ভদ্রলোক।'

চকচকে রোলসরয়েস কাস্টমস শেড-এর ভিতর দাঁড়িয়ে আছে, প্লেন থেকে দেখা যাচ্ছে না। শেডে আর মাত্র একটি গাড়ি রয়েছে, ক্রিম কালারের ট্রায়াম্প কনভার্টিবল।

সৌবর্ণ গালিবের সিলভার গোস্ট-এর পিছনে চলে এল রানা। স্পেয়ার টুলস কমপার্টমেন্টের প্লেটে লাগানো স্ক্রুগুলো খুলে ফেলেছে কাস্টমসের লোকেরা। টুলস-এর ট্রে-টা টান দিয়ে বের করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবার ভান করছে রানা। হাঁটু গাড়ল ও।

কমপার্টমেন্টের পাশগুলোয় তল্লাশি চালাবার ভাব দেখিয়ে ওটার পিছনে আটকে দিল ক্যাপসুল আকৃতির বিপার। টুলস ট্রে আবার বসাল জায়গামত। ঠিকমতই ফিট করল ওটা। সিধে হয়ে হাত ঝাড়ল। 'নেগেটিভ,' কাস্টমস অফিসারকে বলল ও।

প্লেটটা বসালেন অফিসার, চারকোনা চাবি দিয়ে স্ক্রুগুলো আটকালেন। সিধে হয়ে বললেন, 'চেসিস কিংবা বডিওঅর্কে কিছু নেই। ফ্রেম ও গদির নীচে প্রচুর জায়গা, কিন্তু ওগুলো ভাল করে পরীক্ষা করতে হলে প্রচুর সময় দরকার, গাড়িটারও বারোটা বাজবে।'

'তার দরকার নেই। ধন্যবাদ।' হেঁটে অফিস রুমে ফিরে এল রানা।

একটু পরেই স্টার্ট নিল রোলসরয়েস, কাস্টমস শেড থেকে বেরিয়ে লোডিং র‍্যাম্প হয়ে উঠে পড়ল প্লেনে। সঙ্গে সঙ্গে কার্গো প্লেন হারকিউলিস-এর চোয়াল বন্ধ হয়ে গেল। এক মিনিট পর স্টার্ট নিল ওটার জোড়া ইঞ্জিন। রানওয়ে ধরে ছুটল, তারপর উঠে পড়ল আকাশে।

প্লেনটা রানওয়েতে থাকতেই নিজের স্পোর্টস কারের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসেছে রানা। ড্যাশ-এর নীচে হাত গলিয়ে একটা বোতামে চাপ দিল ও। লুকানো স্পিকার জ্যান্ত হয়ে উঠল।

আকাশে উঠে উপকূলের দিকে রওনা হলো প্লেনটা। মিনিট পাঁচেক বিপ্ বিপ্ আওয়াজ পেল রানা, তারপর অস্পষ্ট হয়ে এল। সেটটা অফ করে দিল ও।

কাস্টমস শেড-এর গেটে একবার থামল রানা, অফিসারদের একজনকে ডেকে বলল, বেলা দুটোর ফ্লাইট ধরার জন্য ফিরবে আবার।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে একটা পাব-এ ঢুকল রানা। এখন থেকে, সৌবর্ণ গালিবের রোলস ওর একশো মাইলের মধ্যে থাকলে, ওটায় ফিট করা রেডিও ট্র্যান্সমিটার স্পোর্টস কারের

রিসিভারে সারাক্ষণ বিপ পাঠাতে থাকবে। নব ঘুরালেই পাওয়া যাবে ডিরেকশন। ওকে শুধু লক্ষ রাখতে হবে আওয়াজটা যেন মিলিয়ে না যায়।

চ্যানেল-এর ওপারে পৌঁছানোর পর রানাকে জেনে নিতে হবে গালিব ফ্রান্স ও ইউরোপের কোথায়, কোন্ পথ ধরে যাচ্ছে।

ইউরোপ জুড়ে শুধু ভ্রমণই নয়, চতুর শিয়ালকে ফাঁদে আটকানোর একটা অভিযানও চলবে। এক মুহূর্তের জন্য শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো রানার। সৌবর্ণ গালিব, ভাবল ও, জীবনে এই প্রথম বড় একটা বিপদে পড়তে যাচ্ছ তুমি।

চ্যানেল পার হয়ে এয়ারপোর্টে নামল রানার প্লেন। কাগজ-পত্রের ঝামেলা মিটতেই স্পোর্টস কার নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। সঙ্গে সঙ্গে রোলস থেকে আসা বিপ পাওয়া গেল, কিন্তু খুব দুর্বল ভাবে। এক ঘণ্টা আগে রওনা হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে না গালিব অস্ট্রিয়া কিংবা জার্মানির দিকে ছুটছে, নাকি দক্ষিণ ফ্রান্সে ।

তবে রানার একটা সুবিধে হলো টয়োটা স্পোর্টস কারের স্পিড রোলস-এর দ্বিগুণেরও বেশি। ঘণ্টায় একশো মাইল স্পিডে গাড়ি চালাতে পারবে ও। ভুল করলে সেটা ধরতে কিংবা শুধরে নিতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

একটা ক্রস-রোডে রানা এজেন্সির একজন এজেন্টকে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রানাকে সে জানাল, এক ঘণ্টা আগে অ্যাভেলির দিকে চলে গেছে সিলভার গোস্ট।

রানাও সেই পথে ছুটল। ওর ধারণা, এন-ওয়ান ধরে হয় প্যারিসে যাচ্ছে গালিব, নয়তো এন-আটাশ ধরে রোয়াঁ-য়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি ছোটাচ্ছে রানা। বিপ-এর শব্দ আসছে, সেই আগের মতই, জোরাল হচ্ছে না। তার মানে একশো মাইল স্পিড তুলেও দূরত্ব খুব একটা কমাতে পারছে না রানা। এর একটাই অর্থ হতে পারে। রোলসের পুরানো ইঞ্জিন বদলে নতুন

ইঞ্জিন লাগিয়েছে গালিব।

পাঁচটা বাজল। ছ'টা। সাতটা। ড্রাইভিং মিররে সূর্যকে পাটে বসতে দেখছে রানা। ছুটে চলেছে, থামবার কোনও লক্ষণ নেই গালিবের। পঞ্চাশ মাইল লম্বা বিস্তৃতি পার হয়ে অহ্লিয়ঁ-এ পৌঁছাচ্ছে রানা। আন্দাজ করল, নিশ্চয়ই কোনও ফাইভ স্টার-এ থামবে গালিব। হিলটন-এ, নাকি শ্যাতো ইন্টারন্যাশনাল-এ?

অবশেষে বিপ-এর শব্দ বাড়তে শুরু করল। শহরটা ঝকঝকে তকতকে। রাস্তায় দামী গাড়ির ছড়াছড়ি। কয়েকটা নামকরা হোটেলকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। ওর ধারণাই ঠিক হলো। গালিবের রোলসটা পার্ক করা রয়েছে শ্যাতো ইন্টারন্যাশনাল-এর পার্কিং এরিয়ায়। আরও মাইল দুয়েক এগিয়ে শেরাটন-এ উঠল রানা।

পরদিন সকাল ছ'টা। রোলস এখনও রওনা হয়নি। শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা। ব্রেকফাস্ট সেরে বিল মিটিয়ে ফিরে এল শহরের মাঝখানে। শ্যাতো ইন্টারন্যাশনালের পাশের গলিতে গাড়ির ভিতর বসে থাকল। এবার অনিশ্চয়তায় ভুগতে রাজি নয় ও। এখান থেকে লোয়া নদী পেরিয়ে দক্ষিণে যেতে পারে গালিব, তারপর হয়তো এন-সেভেন ধরে রিভিয়েরা-য় পৌঁছাবে। তা না হলে লোয়া-র উত্তর পাশ ধরে এগোবে, গন্তব্য সেই রিভিয়েরা-ই, তবে সুইটজারল্যান্ড ও ইটালির দিকে সরেও যেতে পারে।

গাড়ি থেকে নেমে নদীর কিনারায় একটা বেঞ্চে বসল রানা এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাহাড় ও পাইন বন, ভারি সুন্দর। সাড়ে আটটার সময় ওর বিনকিউলারে ধরা পড়ল সৌবর্ণ গালিব। তার শোফার হুনমিন আসান রোলস নিয়ে তার সামনে থামল। গালিব উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

পিছু নিল রানা। আধ ঘণ্টাও পেরোয়নি, পিছন থেকে হঠাৎ একটানা কয়েক সেকেন্ড হর্ন বেজে উঠল। দ্রুত সাইড দিল রানা। ক্রিম কালারের ছোট্ট একটা ট্রায়াম্প পাশ কাটাল ওকে। গাড়ির

হুডটা খোলা। ড্রাইভিং সিটে সুন্দরী একটি মেয়ে বসে আছে। প্যান্ট-শার্ট পরা সত্ত্বেও মেয়েটিকে ইউরোপিয়ান, কিংবা শ্বেতাঙ্গ বলে মনে হলো না, যদিও গায়ের রঙ খুব ফরসা। মাথার চুল একটা স্কার্ফ দিয়ে বেঁধে রেখেছে। রানার দিকে তাকালই না সে।

রানা ভাবছে। এরকম সুন্দরী একটি মেয়ে নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, আর তুমি বুড়ো আঙুল চুষবে? না, তা হয় না। নিঃসঙ্গতা ও একঘেয়েমি দূর করতে চাওয়াটা মানুষের একটা অধিকার। তবে পরমুহূর্তেই বোঝাল নিজেকে: না, আজ নয়। আজ তুমি কাজ করছ। আজকের দিনটা সৌবর্ণ গালিবের জন্য, প্রেম করবার জন্য নয়। নব ঘুরিয়ে স্পিকার থেকে বেরুনো বিপ আরেকবার শুনে নিশ্চিত হয়ে নিল ও। সুইচ অফ করে শান্ত, শিথিল মনে গাড়ি চালাচ্ছে, সেই সঙ্গে খেলাচ্ছলে চিন্তা করছে মেয়েটির কথা।

তার সঙ্গে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে ওর। পরস্পরের বেশ কাছাকাছিই থাকছে ওরা। রাতটা নিশ্চয়ই অহ্‌লিয়ঁ-এ কাটিয়েছে সে। কোথায় হতে পারে? ইস, কী রকম একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। এই, এক মিনিট! অকস্মাৎ দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল রানা। খোলা হুড মনে করিয়ে দিচ্ছে তাকে। ওই গাড়ি, ট্রায়াম্পটা, আগেও দেখেছে ও। দেখেছে ফেরিফিল্ডে। নিশ্চয়ই গালিবের পরবর্তী ফ্লাইটে চ্যানেল পেরিয়ে ফ্রান্সে এসেছে সে। এ-কথা সত্যি যে মেয়েটিকে তখন দেখিনি ও, কিংবা গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন নম্বরও খেয়াল করেনি, তা সত্ত্বেও ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই যে এটা সেই একই গাড়ি। তাই যদি হয়, তিনশো মাইল ধরে এখনও তার গালিবের পিছনে লেগে থাকাটা তো কাকতালীয় ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গতরাতে আলো নিস্তেজ করে গাড়ি চালাচ্ছিল মেয়েটি! আরে, আসলে ব্যাপারটা কী?

স্পিড বাড়াল রানা। এক ঢিলে দুটো পাখি মারবে সে। পরমুহূর্তে টের পেল পাখি মারার সময় নেই, ওকে জানতে হবে

মেয়েটির উদ্দেশ্য কী। তার আগে দেখতে হবে মেয়েটি ওর আর গালিবের মাঝখানে কোথাও থাকছে কিনা।

ব্যাপারটা এখন উটকো ঝামেলা বলে মনে হচ্ছে রানার। গালিবের সঙ্গে থাকাটা এমনিতেই কঠিন, ওদের মাঝখানে স্যান্ডউইচে পরিণত আরেকটা ফেউ পরিস্থিতি শুধু জটিলই করে তুলবে।

টু-সিটার খুদে গাড়িটা আছে। রোলসের কাছ থেকে সম্ভবত দু'মাইল পিছনে। গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই স্পোর্টস কারের স্পিড আবার কমিয়ে আনল রানা। বেশ, বেশ। প্রায় পরিষ্কার, গালিবকে অনুসরণ করছে। কে হতে পারে সে? চিন্তার রেখা ফুটল রানার কপালে।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা একই ছকে ছুটল ছোট্ট কনভয়। সিলভার গোস্ট-এর দু'মাইল পিছনে ট্রায়াম্প, ট্রায়াম্পের দু'মাইল পিছনে রানার স্পোর্টস কার।

ইতিমধ্যে এন-৭৩ ধরে ডান দিকে ঘুরে গেছে গালিব, যাচ্ছে লিয়ঁ ও ইটালির দিকে, কিংবা হয়তো জেনেভায়। টয়োটাকে খুব জোরে ছোটাতে বাধ্য হচ্ছে রানা, তারপর হঠাৎ বিপদে পড়বার মত একটা অবস্থা সৃষ্টি হলো। বিপ-এর ওঠা-নামা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি ও, গাড়ির স্পিড কম-বেশি করেছে ট্রায়াম্পটাকে দেখে। হঠাৎ করে খেয়াল হলো খুব জোরাল বিপ হচ্ছে। নব্বুইয়ে ছুটছে গাড়ি, কড়া ব্রেক না করলে রোলসের উপর চড়াও হত টয়োটা। ভাগ্যই বলতে হবে রাস্তাটা পাহাড় বেয়ে চূড়ায় উঠেছে। কাছিমের মত অলস গতিতে চূড়ায় উঠে এসে থামল রানা। চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাতেই দেখল একটা ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোলস। ব্রিজ রেইলিং-এর সামনের বেঞ্চে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে গালিব। ট্রায়াম্পের চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও।

সাদা কোট পরে রয়েছে গালিব। মাথায় ড্রাইভিং হেলমেট। গাড়ির পিছনের সিটে বসা কোরিয়ান শোফারের মাথাটাও দেখা

যাচ্ছে। খাচ্ছে সে-ও।

লাঞ্চ সারছে ওরা। দেখে রানার পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল।

মেয়েটির কথা ভাবল ও। আদৌ যদি গালিবের পিছু নিয়ে থাকে সে, সময় মত থামতে পারেনি। স্পিড আরও বাড়িয়ে জানালার নীচে মাথা নামিয়ে রোলসকে পাশ কাটাতে হয়েছে। নাকি এ-সবই ওর কল্পনা? মেয়েটি হয়তো তার বাবা-মা, কিংবা স্বামীর কাছে ফিরছে।

বিশ মিনিট পর রোলস আবার রওনা হলো। ডানে-বামে না গিয়ে সোজা পথেই থাকল, তার মানে সুইটজারল্যান্ডে যাচ্ছে গালিব!

স্যাঁ লুহো শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছাল গাড়ি দুটো। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর রানা। রাস্তার ধারে কাঁচ ঘেরা রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ সারছে লোকজন। বার দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটা। ড্রাইভিং মিররে তাকাল ও। বাহ্, বেশ! আবার উদয় হয়েছে ক্রিম ট্রায়াম্প। এবার ওর পিছনে, মাত্র কয়েক ফুট দূরে। কতক্ষণ ধরে ওখানে সে? রোলসকে অনুসরণ করবার ব্যাপারে এত মনোযোগী ছিল রানা, পিছনে তাকাবার কথা মনেই পড়েনি। নিশ্চয়ই কোনও সাইড রোডে অপেক্ষা করছিল রহস্যময়ী।

আচ্ছা! পরিষ্কার হয়ে গেল যে এটা কাকতালীয় কোনও ব্যাপার নয়। কিছু একটা করা দরকার। দুঃখিত, প্রিয়তমা, কিছুটা আঘাত দেব তোমাকে। যতটা পারি নরমভাবে। একটা রেস্তোরাঁর সামনে হঠাৎ থামল রানা। তারপর রিভার্স গিয়ার দিল। অসুস্থকর একটা সংঘর্ষের আওয়াজ শোনা গেল। ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ও।

টয়োটার পিছনে চলে এল রানা। রাগে ও উত্তেজনায় লালচে হয়ে উঠেছে মেয়েটির ফরসা মুখ, আঁটো জিনসে মোড়া একটা সুগঠিত পা রাস্তায় নেমে এসেছে। চোখ থেকে গগলস খুলে দাঁড়াল সে। পা দুটো সামান্য ফাঁক করা, দুইহাত কোমরে। অত্যন্ত সুন্দর

দেখতে, রেগে যাওয়ায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

স্পোর্টস কারের পিছনের বাম্পার ট্রায়াম্পের ল্যাম্প ও রেডিয়েটর গ্রিল গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সকৌতুকে বলল রানা, 'ওখানে যদি আবার আমাকে স্পর্শ করো, এই বান্দাকে তোমার বিয়ে করতে হবে।'

'আচ্ছা বেয়াদপ লোক দেখছি!' রাগে আর কিছু বলতে পারল না মেয়েটি। ইংরেজি বললেও, কথার সুরে হিন্দি বা উর্দুর টান স্পষ্ট।

বেশ কজন পথিক দাঁড়িয়ে পড়েছে। মেয়েটির সমর্থনে দু'একটা মন্তব্যও শোনা গেল।

'চালাতে না জানলে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছ কেন?'

রানা বলল, 'আমার দোষ? নাকি তোমার ব্রেক ভাল নয়?'

'আমার ব্রেক! এর মধ্যে আমার ব্রেকের কথা আসছে কোত্থেকে? তুমি রিভার্স দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়েছ।'

'গিয়ার স্লিপ করেছে। আমার জানা ছিল না তুমি আমার এত কাছে।' এবার মেয়েটিকে শান্ত করা দরকার। 'সত্যি, ভীষণ দুঃখিত আমি। মেরামতের সমস্ত খরচ আমার। এসো, দেখি কতটুকু ক্ষতি হয়েছে।'

'না, আমার গাড়ি ছোঁবে না!' সাবধান করল মেয়েটি, ড্রাইভিং সিটে বসে সেলফ-স্টার্টারে চাপ দিল। সচল হলো ইঞ্জিন। বনেটের নীচ থেকে ধাতব আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। ইঞ্জিন বন্ধ করে জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বের করল। 'শুনলে তো? ফ্যানটা ভেঙে দিয়েছ।'

নিজের গাড়িটা সরিয়ে নিল রানা। গাড়ি দুটো বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় ট্রায়াম্পের ভাঙা কিছু অংশ ঝন ঝন শব্দে খসে পড়ল পাকা রাস্তায়। আবার গাড়ি থেকে নেমে ট্রায়াম্পের সামনে চলে এল ও। লোকজন চলে যাচ্ছে। নিজের গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রানা কী বলে শোনার জন্য অপেক্ষা করছে মেয়েটি।

'মেরামত করতে খুব বেশি সময় লাগবে না,' বলল রানা। 'কাল সকালে আবার রওনা হতে পারবে।' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। 'রাতের খরচ ও ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিচ্ছি। টাকাটা দয়া করে নাও, তারপর চেহারাটা একটু স্বাভাবিক করো।'

'না।' দৃঢ় ও ঠাণ্ডা একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল মেয়েটি। হাত দুটো পিছনে বেঁধে অপেক্ষা করছে। কেমন যেন চিন্তিত বলে মনে হলো। কী যেন ভাবছে।

'কিন্তু... ' কী চায় সে? পুলিশ ডাকবে নাকি? 'দেখো, সন্ধ্যায় আমার একটা জরুরি কাজ আছে, তা না হলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার গাড়িটা মেরামত করিয়ে দিতাম, তুমি যাতে কাল সকালে... '

'জরুরি একটা কাজ আজ সন্ধ্যায় আমারও আছে,' বলল মেয়েটি। 'জেনেভাতে পৌঁছাতে হবে আমাকে। টাকা-টুকা লাগবে না, আমাকে তুমি শুধু ওখানে পৌঁছে দাও। বেশি দূর নয়, মাত্র একশো মাইল। তোমার গাড়িতে খুব বেশি হলে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। প্লিজ!'

সন্দেহ জাগল রানার মনে। গালিবের তৈরি কোনও ফাঁদের অংশ নয় তো? নাকি গালিবকে ব্ল্যাকমেইল করছে কেউ? এক মুহূর্ত পর দুটো সন্দেহই বাতিল করে দিল রানা। প্যান্ট-শার্ট পরে থাকলেও, নিজের দিকে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোন প্রবণতা এর মধ্যে নেই। তা ছাড়া, চোখে-মুখে যে সরলতা দেখা যাচ্ছে, এই মেয়ের পক্ষে সে-ধরনের কোনও কাজ সম্ভব নয়।

তার অনুরোধ বিবেচনা করে দেখছে রানা। ঝামেলাটা যদি ঘাড়ে নেয়, কতক্ষণে নামাতে পারবে? এর মধ্যে কোনও সিকিউরিটি রিস্ক নেই তো?

রানা সিদ্ধান্ত নিল, বিপদে পড়ে কেউ সাহায্য চাইলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে সে যদি কোনও মেয়ে

হয়। 'ঠিক আছে। তোমাকে আমি জেনেভা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। জিনিস-পত্র যা আছে টয়োটায় তুলে ফেলো। রাস্তার ওপারের ওই গ্যারেজে যাচ্ছি আমি, তোমার গাড়িটা মেরামতের ব্যবস্থা করে ফেলি। এই ফাঁকে আমাদের জন্যে লাঞ্চ কিনে আনো তুমি, প্লিজ; রুটি, মাখন, পনির, কিছু ফল আর ঠাণ্ডা বিয়ার।' তার হাতে কিছু ফ্রাঙ্ক গুঁজে দিল রানা।

ট্রায়াম্পের বুট খুলল মেয়েটি। ভিতর থেকে গলফ ক্লাব-এর বড়সড় ব্যাগ ও দামী একটা সুটকেস বের করল সে। ওগুলো টয়োটায় তোলা হলো। নিজের গাড়ির কাছে ফিরে এসে এরপর কালো লেদারের একটা শোল্ডার ব্যাগ বের করল সে।

'নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে কী বলব?' প্রশ্ন করল রানা।

'কী?'

প্রশ্নটা আবার করল রানা, ভাবছে মেয়েটি মিথ্যে বলবে কিনা।

'আমি কয়েকটা দিন পথেই থাকব। বলো জেনেভার শেরাটন হোটেল। নাম প্রার্থনা, প্রার্থনা মিশ্র।' তাকে এতটুকু ইতস্তত করতে দেখা গেল না। ঘুরে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের দিকে এগোল সে।

পনেরো মিনিট পর রওনা হলো ওরা।

পাশের সিটেই বসল প্রার্থনা, শিরদাঁড়া খাড়া করে আছে, নাক বরাবর রাস্তার উপর চোখ।

রোলস নিশ্চয়ই আরও পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে গেছে। স্পিড বাড়াল রানা। আধ ঘণ্টা পর একটা গিরিখাদের মাথায় উঠে এল টয়োটা, নীচে ফ্রেঞ্চ-সুইস সীমান্ত। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখল সিটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রার্থনা। বোতাম টিপল রানা। রিসিভার থেকে বিপ পাওয়া গেল। তখনই আবার ওটা অফ করে দিল ও।

রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে নীরবে পিকনিক সারল ওরা। কাস্টমসের লোকজন গাড়িটা একবার দেখে গেল। আরেকজন

এসে ওদের পাসপোর্ট দুটো নিয়ে গেল। কোনও প্রশ্ন করা হলো না, আবার ফিরিয়ে দেওয়া হলো ওগুলো। রানা খেয়াল করল, নিজের পাসপোর্ট ওকে দেখতে দিল না মেয়েটি। গাড়ি স্টার্ট দিল ও। সুইস সীমান্তেও কোনও ঝামেলা পোহাতে হলো না। পাঁচ মিনিট পর আবার বোতাম টিপল রানা।

ফাঁকা রাস্তার দু'পাশে পাইন বন। ফাঁক দিয়ে পাহাড় দেখা যায়। পাহাড়ের মাথায় চার্চ-এর চূড়া।

'শব্দটা কীসের?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'ম্যাগনিটোর গুঞ্জন। স্পিড তুললে বাড়ে। অহ্লিয়ঁ থেকে শুরু হয়েছে। আজ রাতে ঠিক করে নিতে হবে।'

ব্যাখ্যাটায় সন্তুষ্ট হলো মেয়েটি 'তুমি যাচ্ছ কোথায়?' স্পষ্ট করে জানতে চাইল সে। 'তোমাকে আবার আমি নিজের পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিচ্ছি না তো?'

'আরে না!' নরম সুরে কথা বলছে রানা। 'আসলে আমিও জেনেভাতেই যাচ্ছি। তবে ওখানে রাত কাটাব না। মিটিঙের ওপর নির্ভর করবে। তুমি কতক্ষণ থাকবে ওখানে?'

'কী জানি। যাচ্ছি গলফ খেলতে। সুইস লেডিস ওপেন চ্যাম্পিয়ানশিপ-এ নাম লিখিয়েছি আমি।'

'তুমি ভারতীয়?'

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল প্রার্থনা মিশ্র। 'হ্যাঁ। তবে কয়েক পুরুষ ধরে ইংল্যান্ডে আছি আমরা, ইন্ডিয়ায় প্রায় যাওয়াই হয় না।'

গলফ খেলতে যাচ্ছে, ভাবল রানা। হ্যাঁ, সম্ভব। তবে এটা সবটুকু সত্য বোধহয় নয়। 'গলফ কি প্রচুর খেলো তুমি?' জানতে চাইল ও।

'খেলি।' তারপর, রানা আরও কিছু জিজ্ঞেস করবার আগে প্রার্থনা প্রশ্ন করল, 'তুমি কি সুইটজারল্যান্ডে বেড়াতে এসেছ?'

'আমি সেলসম্যান। গার্মেন্টস-এর বাজার দেখে বেড়াই।

এখানে ওই কাজেই এসেছি।'

'ও।' প্রার্থনা আর কোনও আগ্রহ দেখাল না।

জেনেভায় পৌঁছে শেরাটনের ভিতর ঢুকল টয়োটা। হোটেলের পোর্টার এসে প্রার্থনার সুটকেস আর গলফ ক্লাবগুলো নিয়ে গেল। রানার দিকে একটা হাত বাড়াল প্রার্থনা। 'গুডবাই। অসংখ্য ধন্যবাদ। খুব ভাল ড্রাইভ করো তুমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারলে এদিক সেদিক বেড়ানোর ইচ্ছে ছিল। আবার যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়... '

'কী জানি,' প্রার্থনার কণ্ঠস্বরে এতটুকু উৎসাহ নেই। 'হতেও পারে।' ঘুরে হোটেলের লবিতে ঢুকে পড়ল সে।

গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে রানা। বাদ দাও তার চিন্তা! গালিবকে নিয়ে মাথা ঘামাও। নিজেকে রানা মনে করিয়ে দিল, ওর এজেন্সির জেনেভা শাখায় একবার যেতে হবে ওকে।

বোতাম টিপে দু'মিনিট আওয়াজটা শুনল রানা। কাছাকাছি আছে গালিব, তবে দূরে সরে যাচ্ছে।

লেক জেনেভার উত্তর তীরে, লউজান শহরে রোলসটাকে দেখতে পেল রানা। একটা লরি-র পিছনে লুকাল ও। খানিক পর বাম দিকে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রোলস।

বাম দিকে চোখ রেখে সোজা এগোল রানা। ওদিকে একটা বিশাল শ্যাতো। শ্যাতোটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। নিরেট লোহার বিরাট একটা গেট।

এই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গেটটা। বাতাসে ধুলোর মেঘ ঝুলে আছে। পাঁচিলের মাথায়, গেটের পাশে, একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা: গালিব এন্টারপ্রাইজেস।

গর্তে লুকিয়েছে শিয়াল।

আরও কিছু দূর এগিয়ে বাম দিকে বাঁক ঘুরে একটা পাহাড়ী পথ ধরল রানা। রাস্তার দু'পাশে গভীর বনভূমি। ঢাল বেয়ে চূড়ায়

উঠে এল ও। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে গাড়ি থেকে নামল। নীচে নেমে চোখে বিনকিউলার তুলল।

সরাসরি গালিব এন্টারপ্রাইজেস-এর উপর রয়েছে রানা। পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় কাঁটাতারের বেড়া, গেট, তারপর শুধু খানিকটা রেইলিং ইত্যাদি সবই দেখা যাচ্ছে। তবে এটা বাড়ির পিছন দিক।

সরু মেঠো পথ ধরে নীচে নামছে রানা। গালিবের শ্যাতোয় ঢোকার কোনও উপায় করা যায় কিনা দেখবে।

মিনিট পাঁচেক পর রেইলিঙের ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকল রানা। একটা বোল্ডারের পাশে, গাছতলায় দাঁড়িয়ে আবার চোখে বিনকিউলার তুলল। এবার শ্যাতোর মূল ভবনটা দেখতে পেল। লাল ইঁটের তৈরি পুরানো আমলের দোতলা বাড়ি, দেশলাইয়ের বাক্সের মত দেখতে, মাথায় টালির ছাদ। বাড়ির পিছনে একটা খোলা উঠান। উঠানের মাঝখানে রোলসটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উঠানের দুই প্রান্ত করোগেটেড টিন দিয়ে ঘেরা। দুই দিকে দুটো ওঅর্কশপ। লম্বা একটা চিমনিও দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। পাঁচটা বাজার সংকেত। বাড়িটার পিছনের দরজা খুলে যেতে দেখল রানা। চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সৌবর্ণ গালিব। এখনও সাদা কোট পরে আছে সে, তবে মাথায় হেলমেট নেই। তার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল ছোটখাট এক লোক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, গোঁফ জোড়া যেন কালো প্রজাপতি।

গালিবকে হাসি-খুশি দেখাচ্ছে। এগিয়ে এসে রোলসের পাশে থামল সে, চাপড় মারল গাড়ির বনেটে। সবিনয়ে হাসল তার সঙ্গী লোকটা। পকেট থেকে একটা হুইসেল বের করে ফুঁ দিল সে। ডান দিকের ওঅর্কশপের দরজা খুলে গেল, নীল ওভারঅল পরা চারজন শ্রমিক লাইন ধরে বেরিয়ে এল উঠানে। খোলা দরজার ভিতর থেকে যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে। তার সঙ্গে যোগ হলো ভারী

একটা ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ। এ-ধরনের ইঞ্জিনের আওয়াজ রিকালভারেও শুনেছে রানা।

লোক চারজন রোলসের কাছে পৌঁছাল। খর্বকায় লোকটা, সম্ভবত তাদের ফোরম্যান, কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে রোলসরয়েসটা খুলে ফেলার কাজে হাত লাগাল লোকগুলো।

চারটে দরজা, ইঞ্জিনের কাভার ও মার্ডগার্ড খোলার পর রানার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, লোকগুলো আসলে গাড়ির আর্মার প্লেটিং খুলে নিচ্ছে।

ঠিক এই সময় বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে উঠানে বেরিয়ে এল গালিবের শোফার, হুনমিন আসান। কথা বলতে না পারলেও, গালিবের সামনে দাঁড়িয়ে ঘঁ-ঘঁ করে কয়েকটা আওয়াজ করল সে। ফোরম্যানকে কিছু বলে বাড়ির ভিতর ফিরে গেল গালিব।

রানারও এখান থেকে সরে পড়বার সময় হয়েছে। চারদিকে ভাল করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে হাঁটা ধরল ও।

শহরে ফিরে এসে রানা এজেন্সির জেনেভা শাখায় ঢুকল রানা। ফোন করে এসেছে, ভিতরের চেম্বারে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল শাখাপ্রধান অমেয় হাসান। কুশল বিনিময়ের পর কাজের কথায় চলে এল রানা।

'জায়গাটার নাম কোপেট। ওখানে সুবর্ণ এন্টারপ্রাইজেস নামে একটা ফ্যাক্টরি আছে। ওটার সম্পর্কে কিছু জানো?'

'জী, মাসুদ ভাই,' একটু গর্বের সুরেই বলল অমেয় হাসান। 'খবর রাখি এই জন্যে যে ওটার মালিক আমাদের দেশেরই এক ভদ্রলোক, শাহ মির্জা গালিব।'

'এখন সে নিজেকে মির্জা বলে না, বলে সৌবর্ণ। সেটা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার এখানকার ব্যবসা সম্পর্কে কী জানো বলো তো শুনি।'

'ওখানে মেটাল ফার্নিচার তৈরি হয়, মাসুদ ভাই। বেশ উন্নত

মানের জিনিস। সুইস রেলওয়েও কেনে। তবে বড় বড় অর্ডার আসে এয়ারলাইন্স থেকে।'

'কোন্ এয়ারলাইন্স?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গালিব?'

'ওটা তো ভদ্রলোকের নিজের এয়ারলাইন্স, যা যা প্রয়োজন সব এখান থেকেই সাপ্লাই দেয়া হয়। ওটা ছাড়াও অন্য একটা চার্টার এয়ারলাইন্স আছে, নাম স্কাই ব্রিজ। এটাও ইউরোপ ও ইন্ডিয়ার মধ্যে আসা-যাওয়া করে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে এটা। স্কাই ব্রিজ-এর মালিক বেসরকারী কোম্পানি। তবে গুজব শোনা যায় বেশ বড় একটা শেয়ারের মালিক নাকি গালিব সাহেব। তাই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে সিট বানাবার অর্ডারটা ওঁরাই পেয়েছেন।'

শান্ত, গম্ভীর একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল রানার মুখে। চেয়ার ছাড়ল, হাত বাড়াল অমেয়র দিকে। 'জানো না, অথচ এক মিনিটের মধ্যে বিরাট একটা ধাঁধার সমাধান বলে দিয়েছ তুমি আমাকে। আবার যেদিন দেখা হবে বিস্তারিত সব জানাব। ধন্যবাদ, অমেয়।'

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে শেরাটনের দিকে ফিরছে রানা। আচ্ছা, ছবি একটা তা হলে পাওয়া গেল। দু'দিন ধরে একটা রোলসরয়েসকে অনুসরণ করছে ও। আর্মার প্লেটেড একটা সিলভার গোস্ট। কেন্ট-এ গাড়িতে প্লেটিং ফিট করতে দেখেছে ও। তারপর কোপেটে দেখল সব খুলে ফেলা হচ্ছে। ওই প্লেটিং, অর্থাৎ পাতগুলো এতক্ষণে ফ্যাক্টরির ফারনেসে ঢুকিয়ে গলিয়ে ফেলা হয়েছে। এবার স্কাই ব্রিজ-এর জন্য পঁচাত্তরটি সিট বানানো হবে ওই গলানো জিনিস দিয়ে। কয়েক দিন পর চেয়ারগুলো গালিবের ইন্ডিয়ান কোনও ফ্যাক্টরিতে গলানো হবে, ওগুলোর বদলে প্লেনে তোলা হবে অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ার।

সিলভার গোস্ট আসলে মোটেও সিলভার নয়। ওটা গোল্ডেন গোস্ট। দুই টন বডিওঅর্ক-এর সবটুকুই সোনা। নিরেট, আঠারো ক্যারাট. সাদা সোনা।

দশ

শেরাটনে উঠে শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টাল রানা। ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথারটা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল, সঙ্গে নেবে, নাকি হোটেলে রেখে যাবে। ঠিক করল রেখেই যাবে। গালিব এন্টারপ্রাইজে ঢুকে কারও চোখে ধরা পড়ার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। তবু দুর্ভাগ্যবশত যদি ধরা পড়ে যায়, বানিয়ে রাখা গল্পটা শুনিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করা যাবে। গল্পটা এমনিতেই দুর্বল, সঙ্গে অস্ত্র থাকলে সেটাকে আর বিশ্বাসযোগ্য করা যাবে না। তবে বিশেষ এক জোড়া জুতো পরল ও, সাধারণ জুতোর চেয়ে বেশি ভারী। এখনও জানে না, কীভাবে প্রমাণ সহ ধরে আইনের হাতে সোপর্দ করা যায় লোকটাকে।

লাউঞ্জের ডেস্কে খোঁজ নিল রানা প্রার্থনা মিশ্র আছে কিনা। রিসেপশনিস্ট যখন বলল এই নামে কোনও গেস্ট হোটেলে নেই, একটুও অবাক হলো না। প্রশ্ন হলো, রানা তার চোখের আড়াল হতেই অন্য কোনও হোটেলে উঠেছে মেয়েটি, নাকি এই হোটেলেই উঠেছে অন্য কোনও নামে?

গাড়ি চালিয়ে লেকের ধারে চলে এল রানা, একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কফি নিয়ে জানালার ধারে বসল।

সৌবর্ণ গালিবের কথা ভাবছে। তার সোনা পাচারের কৌশল এখন পরিষ্কার। দু'দুটো এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে ভারতে সোনা পাচার করছে সে। এমনই বেপরোয়া এক লোক, ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করছে না। ভারতে সোনা পাচারের কারণ হলো,

ওখানেই লাভটা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। ভারতে সোনার চাহিদাও প্রচুর, আর ওখান থেকে চোরাই পথে ওই সোনার বিরাট একটা অংশ বাংলাদেশে ঢুকছে। তার ট্রলার ও জাহাজ বহরের উপর পুলিশের সন্দেহ হওয়ার পর এই নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে সে।

প্রথমে গালিব সবাইকে জানার সুযোগ করে দিয়েছে তার একটা আর্মার্ড কার আছে। এটা অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপার নয়। ভারতীয় অনেক সাবেক রাজা ও ফিল্ম স্টার আর্মার্ড কার চালায়। প্রথম দিকে সম্ভবত তার রোলসের প্লেটিং যেমনটি হওয়ার কথা তেমনটিই ছিল, ফলে পরীক্ষা করেও কোনও সোনা পাওয়া যায়নি। পরে নিজের ওঅর্কশপে আর্মার প্লেটিং খুলে ফেলে সে, তার বদলে আঠারো ক্যারেট হোয়াইট গোল্ড ব্যবহার করে। এই সোনার খাদ হিসাবে ব্যবহার করা নিকেল ও সিলভার যথেষ্ট শক্তিশালী। গাড়ির গায়ে আঁচড় লাগলেও ধরা পড়বার কোনও ভয় নেই। এরপর ইংল্যান্ডের রিকালভার থেকে রওনা হয়ে সুইটজারল্যান্ডের ফ্যাক্টরিতে পৌঁছানো। এখানকার কারিগররাও বাছাই করা লোক। সোনার বডিওঅর্ক খুলে প্লেনের সিট বানাতে দক্ষ। সিটগুলোয় পরে গদি লাগানো হয়। দুটো এয়ারলাইন্সই গালিবের বিশ্বস্ত লোকজন চালায়। মাসে হয়তো এক কী দু'বার এই কাজ করা হচ্ছে। এই কাজে গালিব হয়তো অন্য কোনও গাড়ি ও ড্রাইভার ব্যবহার করছে।

মুম্বাই কিংবা কোলকাতায় পৌঁছাবার পর ওভারহল দরকার হয় প্লেনটার, প্রয়োজন হয় নতুন করে ইকুইপমেন্ট দিয়ে সাজানোর। প্লেনটাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্কাই হক অথবা গালিব এয়ারলাইন্সের হ্যাঙ্গারে, ওখানে ফিট করা হয় নতুন সিট। পুরানো সিট, সোনার তৈরি, চলে যায় সোনার কারবারীদের কাছে। গালিব আসল সহ লাভের টাকা গ্রহণ করবে মার্কিন ডলার কিংবা ব্রিটিশ পাউন্ডে, পৃথিবীর যে-কোনও দেশের অ্যাকাউন্টে। প্রতি ট্রিপে দুশো কী

তিনশো পারসেন্ট লাভ করছে সে।

রাত আটটা। এই সময়ে শুধু কফি বেমানান লাগছে রানার। বিল মিটিয়ে পাশের বার-এ উঠে এল ও। অর্ডার দিল হুইস্কির।

আর মেয়েটি? ভাবল রানা। যে নিজের নাম বলছে প্রার্থনা মিশ্র? কে সে? আচরণে এত দৃঢ়তা কোত্থেকে পাচ্ছে? তার গলফ খেলার গল্প কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?

টেবিল ছেড়ে বার-এর পিছনে চলে এল রানা। স্থানীয় একটা দৈনিকে ফোন করে জানতে চাইল লেডিস গলফ চ্যাম্পিয়ানশিপ কবে থেকে শুরু হচ্ছে।

না, ওটা গত মাসে শেষ হয়েছে। আবার আগামী বছর শুরু হবে।

টেবিলে ফিরে এল রানা। চিন্তিত।

তবে ওর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন শুধু গালিব ও তার রোলসকে নিয়ে যে গল্পটা বানাতে যাচ্ছে ও, সেটিকে সত্য বলে প্রমাণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় চুপিসারে ফ্যাক্টরিতে ঢুকে কীভাবে কাজটা করা হচ্ছে তার ছবি তুলতে পারলে। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

তার বদলে রাতের অন্ধকারে ফ্যাক্টরিতে ঢুকে খানিকটা গোল্ড ডাস্ট সংগ্রহ করতে পারলে হতো। কোনও একটা ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যেত ওই ধুলো সত্যি সোনা কিনা। সেটা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে নিজ চোখে সবকিছু দেখে নিশ্চিত হবে ও আগে; তারপর, পরদিন সকালে, সারা দুনিয়ায় গালিবের যত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে সব ফ্রিজ করে দেওয়ার অনুরোধ জানাবে ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যান্ড। কাল সকালেই সুইস পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সঙ্গে রানা এজেন্সির লোকজনও থাকতে পারে, নক করবে গালিব এন্টারপ্রাইজেস-এর দরজায়। এরপর বন্দি হস্তান্তর। সৌবর্ণ গালিবকে ইংল্যান্ডের কোনও জেলখানায় বেশ অনেকগুলো বছর কাটাতে হবে।

বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। কাজটা শেষ করা দরকার। কাউকে কি জানিয়ে রাখবে ও কোথায় চলেছে? নাহ্! ও তো কোনও অ্যাকশনে যাচ্ছে না, শুধু আড়াল থেকে দেখেই ফিরে চলে আসবে।

বিকেলের সেই রাস্তা ধরে পাহাড় চূড়ায় উঠে এল রানা। রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিছুদূর এগোল, হেডলাইট নিভিয়ে শুধু সাইড লাইট জ্বেলে রেখেছে। তারপর গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল। কান পেতে বসে থাকল কিছুক্ষণ। কোথাও কোনও শব্দ নেই। বাইরে বেরিয়ে এসে আস্তে করে বন্ধ করল দরজা, তারপর সরু মেঠো পথ ধরে সাবধানে এগোল।

জেনারেটার-এর ভোঁতা আওয়াজ পাচ্ছে রানা। চাঁদের আলো থাকায় পথ চিনে এগোতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। তবে ছন্দবদ্ধ যান্ত্রিক শব্দটার মধ্যে কেমন যেন একটা বিপদের– নাকি হুমকির? –সুর আছে।

বনভূমি পাতলা হয়ে আসছে। রেইলিং-এর দুটো রড আগেই ফাঁক করে রেখে গিয়েছিল, সেইখান দিয়ে গলে ভিতরে ঢুকল। বোল্ডারটাকে দেখতে পেল রানা। ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে পাশেই একটা গাছ। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও। গাছটার তলায়, মাটিতে, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে কে যেন।

উত্তেজনা কমানোর জন্য মুখ খুলে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ছে রানা। হাতের তালু দুটো সাবধানে ট্রাউজারে ঘষল। ওর চোখ দুটো ক্যামেরা লেন্সের মত বড় হয়ে উঠেছে।

গাছের তলায় শরীরটা নড়ে উঠল, সাবধানে পজিশন বদল করল। খানিকটা দমকা বাতাস গাছটার পাতায় পাতায় ফিসফাস করল। নেমে আসা চাঁদের আলো শরীরটার উপর দ্রুত একটু নাচানাচি করে পরক্ষণে আবার স্থির হয়ে গেল। কালো ও ঘন চুল দেখতে পেয়েছে রানা, পরে আছে কালো সোয়েটার ও কালো

স্ল্যাকস। আরও কী যেন একটা আছে: মাটি কামড়ে থাকা লম্বাটে কিছু, চকচকে ধাতব। কালো চুল থেকে শুরু হয়ে গাছের গোড়াটাকে ছাড়িয়ে গেছে, ঢুকে পড়েছে ঘাসের ভিতরে।

ধীরে ধীরে, সাবধানে, মাথা নিচু করে ভাল করে তাকাল রানা। শুয়ে রয়েছে মেয়েটি, প্রার্থনা। ওখান থেকে নীচের বাড়িটা দেখছে সে। তার কাছে একটা রাইফেল রয়েছে। অস্ত্রটা নিশ্চয়ই নিরীহদর্শন গলফ ক্লাবগুলোর সঙ্গে লুকানো ছিল। খোদা! কী সাংঘাতিক মেয়ে রে, বাবা!

ধীরে ধীরে শান্ত হলো রানা। মেয়েটি কে, কী তার উদ্দেশ্য, এ-সবের কোনও গুরুত্ব নেই। তবে দেখতে হবে ওর কাজে সে যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

দূরত্বটুকু আন্দাজ করল রানা, নিঃশব্দ পায়ে কিছুটা এগোল, তারপর লাফ দিয়ে পড়ল মেয়েটির উপর। বাম হাত তার ঘাড়ে পড়ল, ডান হাত রাইফেলে।

রানার বুক পড়েছে নরম নিতম্বে, তা সত্ত্বেও সংঘর্ষের ফলে মেয়েটির ফুসফুস খালি হয়ে গেল। রানার বাম হাতের আঙুল গলায় সরে এসে করোটিড ধমনী খুঁজে নিল। ডান হাত রাইফেল থেকে আঙুলগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে। অনুভব করল সেফটি ক্যাচ অন করা রয়েছে। অস্ত্রটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল ও।

মেয়েটির পিছন থেকে নিজের বুক নামিয়ে নিল রানা, গলা থেকে হাত সরিয়ে নরমভাবে চেপে ধরল মুখটা। ওর পাশে মোচড় খাচ্ছে শরীরটা, হাঁসফাঁস করছে বাতাসের অভাবে। তারই ফাঁকে রানার হাতে কামড় দিতে চেষ্টা করল।

'তোমার কোটি কোটি দেবদেবির দোহাই, প্রার্থনা, শান্ত হও। আমি শত্রু নই... বন্ধু। এখানে ভয়ানক কিছু ঘটছে, তোমার কোনও ধারণাই নেই। প্রথমে দম ফিরে পাও। তারপর কী বলি শোনো।' এভাবে ফিসফিস করায় কাজ হলো। নিজের শরীরে ঢিল দিল প্রার্থনা। মাথা ঝাঁকিয়ে স্থির হয়ে গেল সে।

'এবার বলো, তুমি কি সৌবর্ণ গালিবের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইছ?'

তীব্র ঘৃণার সঙ্গে হিসহিস করে মেয়েটি বলল, 'ওকে আমি খুন করতে এসেছি।'

একটু সরে প্রার্থনাকে উঠে বসবার সুযোগ করে দিল রানা। এখনও সামান্য হাঁপাচ্ছে সে। কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল। হাত তুলে চুল ঠিক করছে। এই সুযোগে ঢালের নীচে তাকাল রানা, গালিবের বাড়ি ও ফ্যাক্টরির দিকে।

সামান্য ফোঁপাচ্ছিল প্রার্থনা, তবে এরই মধ্যে সামলে নিয়েছে নিজেকে।

'চিন্তা কোরো না,' দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে তাকে বলল রানা। 'আমিও লোকটার শত্রু। তুমি তার যতটা ক্ষতি করতে পারবে তারচেয়ে অনেক বেশি পারব আমি। বাংলাদেশ থেকে নির্দেশ পেয়ে এই ক্রিমিনালের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে এসেছি আমি। এতে লন্ডনেরও সমর্থন আছে। আচ্ছা, তুমি কেন তাকে খুন করতে চাইছ?'

বিড়বিড় করে কথা বলল প্রার্থনা, যেন নিজের সঙ্গে। 'ওই বেজন্মাটা আমার বোনকে খুন করেছে। তুমি তাকে চেনো, সাদিয়া সিকান্দার।'

তীব্র চাপা গলায় রানা বলল, 'হোয়াট!' তারপর ধাক্কাটা সামলে নিয়ে দ্রুত জানতে চাইল, 'কী ঘটেছিল?'

'গালিব অক্ষম, চাকরি শুরু করার কিছু দিনের মধ্যেই এ-সব আমাকে জানিয়েছিল সাদিয়া। অক্ষম বলেই তার মধ্যে বিকৃতি আছে। প্রতি মাসে একটি মেয়েকে সোনা দিয়ে পেইন্ট করে সে।'

'ক্রাইস্ট! কেন?'

'তা জানি না। সাদিয়া আমাকে বলেছিল লোকটা সোনা বলতে পাগল। কারও কাছে মদটাই জীবন, কারও কাছে টাকাটা, এই লোকের জীবন হলো সোনা।

'তার কিছু কোরিয়ান চাকরবাকর আছে, তাদের একজনকে দিয়ে প্রতি মাসে একটি করে মেয়েকে পেইন্ট করায়। লোকটা ওদের শিরদাঁড়া বাদ দিয়ে কাজটা করে। সাদিয়া এটার ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। আমি জেনেছি এটা করা হয় মেয়েগুলো যাতে মারা না যায়। নগ্ন সোনালি দেহ দেখে সে, তারপর তার কোরিয়ান বডিগার্ডকে দিয়ে তাকে রেপ করায়। পরে রেজিন কিংবা অন্য কিছু দিয়ে তাদেরকে গোসল করানো হয়। সবশেষে এক হাজার ডলার দিয়ে বিদায় করে দেয়। কিন্তু গোল্ড পেইন্ট দিয়ে কারও শরীর যদি পুরোপুরি ঢেকে দেয়া হয়, ত্বকের রোমকূপগুলো তা হলে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। কাজেই তারা মারা যায়।'

কল্পনার চোখে ভীতিকর চরিত্র হুনমিন আসানকে দেখতে পেল রানা, হাতে তরল সোনা ভর্তি গামলা আর ব্রাশ; পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সৌবর্ণ গালিব, চকচক করছে চোখ দুটো। 'সাদিয়ার কী হয়েছিল?' জানতে চাইল রানা।

'সে আমাকে ই-মেইল পাঠিয়ে আসতে বলে। মায়ামির একটি হসপিটালে, ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ছিল। গালিব তাকে বের করে দিয়েছে। বেডে শুয়ে মারা যাচ্ছে সে। ডাক্তাররা কেউ বলতে পারছে না সমস্যাটা কী। কী ঘটেছে আমাকে জানাল সাদিয়া।'

'কী জানাল?'

মেয়েটি শুকনো গলায় জবাব দিল। 'ইংল্যান্ডে ফিরে একজন স্কিন স্পেশালিস্ট-এর কাছে যাই আমি। ত্বকের রোমকূপ সম্পর্কে তিনি আমাকে জানান। সিলভার স্ট্যাচু হিসেবে পোজ দেয়, এরকম একটা ক্যাবারে গার্ল-এর বেলায় যেমনটি ঘটেছে। তিনি আমাকে কেসটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন, ময়না তদন্তের রিপোর্টটাও দেখিয়েছেন। তখনই আমি বুঝতে পারলাম আমার বোন সাদিয়ার কী হয়েছিল।'

'কী হয়েছিল?' আবার জানতে চাইল রানা।

'ওই বাস্টার্ড গালিব সাদিয়ার পুরো শরীরটা পেইন্ট করে।

সাদিয়াকে খুন করেছে। এটা নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার প্রতিশোধ।' দম নেওয়ার জন্য থামল মেয়েটি। 'তোমার কথা আমাকে বলেছিল সাদিয়া।'

শক্ত করে চোখ বুজে আছে রানা, মানসিক যন্ত্রণার একটা ঢেউ-এর সঙ্গে যুজছে। আরও মৃত্যু। আরও রক্ত লাগল ওর হাতে। মাত্র দু'দিন আগে ওর প্রশ্নের জবাবে গালিব কী বলেছে মনে আছে ওর: 'আমার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে সে।' বলার সময় নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছিল।

গালিব, তোমাকে আমি ছাড়ব না!

হিস্স্স্ করে বাতাস চিরে কী যেন একটা ছুটে এল। পরমুহূর্তে থ্যাচ্ করে আওয়াজ হলো। গাছের কাণ্ডে একটা তীর বিঁধেছে।

ধীরে ধীরে মাথাটা ঘোরাল রানা।

দশ গজ দূরে, আলো-ছায়ার ভিতরে, জুডোর পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গালিবের কোরিয়ান শোফার, হুনমিন আসান। ধনুকে আরও একটা তীর লাগাচ্ছে সে, ওদের দিকে লক্ষ্য স্থির করছে আবার।

নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড় বিড় করল রানা, 'এক চুল নড়বে না।' তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'হ্যালো, হুনমিন আসান। তোমার হাত সত্যি খুব ভাল।'

তীরের মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে আকাশের দিকে তুলল আসান।

সিধে হলো রানা, মেয়েটিকে আড়াল করে রেখেছে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে আবার বিড় বিড় করল ও। 'রাইফেলটা যেন দেখতে না পায়।' তারপর কোরিয়ান বিপদের উদ্দেশে বলল, 'মিস্টার গালিবের এই জায়গাটা দারুণ। সময় করে তাঁর সঙ্গে একদিন কথা বলা যাবে। আজ সম্ভবত রাত একটু বেশিই হয়ে গেছে। তুমি তাঁকে জানাতে পার কাল আবার আসছি আমি।' মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'চলো, ডার্লিং। হাঁটাহাঁটিটা জঙ্গলেই সেরে নিই।

হোটেলে ফেরার সময় হয়েছে।' পা বাড়াল ও, আসানের কাছ থেকে দূরে সরে আসছে।

একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিল আসান। তার হাতের তীর রানার পেটের দিকে তাক করা। 'ঘঁ-ঘঁ! ঘঁ!' বিদঘুটে আওয়াজ করল সে, ইঙ্গিতে বাড়ির দিকটা দেখাল।

'ও, তুমি ভাবছ মিস্টার গালিব এখনই আমাদেরকে সাক্ষাৎ দেবেন? বেশ তো। কিন্তু তাকে আবার বিরক্ত করা হবে না তো? এসো, ডার্লিং।' মেয়েটিকে পথ দেখিয়ে গাছটার বাম দিকে এগোল রানা, ধীরে ধীরে রাইফেলটার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নামার সময় নিচু গলায় মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে রানা। 'তোমার আসল নামটা।'

'শাকিলা সিকান্দার।'

'এই নাম ভুলেও মুখে আনবে না,' বলল রানা। 'সাদিয়াকে তুমি চেনো না। আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড। ইংল্যান্ড থেকে আমিই তোমাকে এনেছি। সব কিছুতে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখাবে, আর অবাক হওয়ার ভান করবে। কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছি আমরা। কোনও রকম চালাকি করতে যেয়ো না।' মাথা ঝাঁকিয়ে কোরিয়ান লোকটাকে দেখাল। 'এই লোক খুনি।'

চাপা রাগের সঙ্গে শাকিলা বলল, 'তুমি নাক না গলালেই পারতে!'

'কী লাভ হত তাতে? রাইফেল সহ ধরা পড়তে তুমি।'

'ধরা পড়তাম না। আমার অন্য রকম প্ল্যান ছিল। কাজ সেরে মাঝরাতের মধ্যে সীমান্তে পৌঁছে যেতাম।'

কিছু বলল না রানা। কী যেন ধরা পড়েছে ওর চোখে। উঁচু চিমনির মাথায়, রেইডার-এর চৌকো মুখটা চিনতে পারল এবার। সন্দেহ নেই, ওটাই ওদের সন্ধান দিয়েছে; আসলে শুনতে পেয়েছে। আগেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা উচিত ছিল ওর। সনিক ডিটেক্টর টাইপের কোনও যন্ত্র ওটা।

পাঁচিলের গায়ে ছোট একটা খোলা গেট। সেটা দিয়ে বাড়ির পিছনের উঠানে ঢুকল ওরা। এই সময় দালানের পিছনের দরজা খুলে গেল। ইলেকট্রিক আলো লাফিয়ে পড়ল বাইরে, পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল দুজন কোরিয়ান, তাদের হাতে একটা করে চকচকে মোটা লাঠি।

'স্টপ!' একযোগে বলল তারা। 'হ্যান্ডস আপ!'

লোকগুলোর মুখে কুৎসিত, হিংস্র হাসি। তাদের একজন বলল, 'সার্চ করা হবে। কোনও ঝামেলা করলে...' হাতের লাঠিটা সবেগে বাতাসে চালাল সে।

হাত দুটো ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলল রানা। শাকিলাকে বলল, 'রিয়্যাক্ট করো না... যাই করুক ওরা।'

একটু এগিয়ে হুমকি দেওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াল হুনমিন আসান, যেন তল্লাশি তদারক করছে। দক্ষ হাতে সার্চ করা হচ্ছে ওদেরকে। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে দেখছে রানা মেয়েটির গায়ে কী করছে হাত দুটো।

'ঠিক আছে, এসো!'

খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকানো হলো ওদেরকে। মোজাইক করা একটা প্যাসেজ ধরে এগোল। বাড়ির সামনের সরু এন্ট্রান্স হল-এ পৌঁছাল ওরা। বাড়িটার ভিতর সোঁদা, গুমোট একটা গন্ধ। দরজাগুলো সাদা। একটার কপাটে নক করল আসান।

'ইয়েস?'

দরজা খুলল আসান। পিঠে লাঠির গুঁতো খেয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা।

বড় একটা ডেস্কে বসে রয়েছে সৌবর্ণ গালিব। প্রচুর কাগজপত্র পরিপাটি করে সাজানো তাতে। ডেস্কের এক পাশে হলুদ রঙের ফাইলিং কেবিনেট। আরেক পাশে নিচু টেবিল, তাতে রেইডার স্ক্রিন সহ একটা রিসিভিং সেট রয়েছে।

বুক খোলা সাদা সিল্ক শার্টের উপরে ছাই রঙা ভেলভেট জ্যাকেট পরেছে গালিব। শার্টের বোতাম খোলা থাকায় বুক ভর্তি

কালো চুল দেখা যাচ্ছে। চেয়ারের খাড়া পিঠের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেও শিরদাঁড়া টান টান করে বসে আছে সে। কালো চোখ দুটো রানার উপর স্থির। বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নেই ওগুলোয়। অন্তর্ভেদী কাঠিন্য ছাড়া অন্য কোনও ভাব নেই সেখানে।

রানা বলল, 'এই যে, মিস্টার গালিব। গোটা ব্যাপারটা কী নিয়ে আমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে আপনার। ওই দশ হাজার পাউন্ড ফেরত পাবার জন্যে আমার পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছেন আপনি। বান্ধবী প্রার্থনাকে নিয়ে বেড়ানোর প্ল্যান করেছিলাম, বাধ্য হয়ে আপনার সন্ধানে এদিকে আসতে হয়েছে। আমাকে জানতে হবে কেন আপনি এ-সব করছেন। ব্লেইলিং টপকে ভেতরে ঢুকেছি... জানি এটা অনধিকার প্রবেশ, কিন্তু আপনি অন্য কোথাও চলে যাবার আগেই আপনাকে আমি ধরতে চেয়েছিলাম। তারপর কী হলো? আপনার শোফার, আসান না ফাঁসান কী যেন নাম, তীর ছুঁড়ে আরেকটু হলে আমাদেরকে মেরেই ফেলেছিল। এখানেই শেষ নয়! আপনার দুজন চাকর আমাদেরকে হ্যান্ডস আপ করিয়ে সার্চ পর্যন্ত করল! আপনি যদি এ-সবের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে না পারেন, আমি পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য হব।'

রানার এত কথার উত্তরে স্রেফ চুপ করে থাকল গালিব। তার চোখের পাতা এতটুকু কাঁপল না। রানার ভদ্রোচিত প্রতিবাদ যেন শুনতেই পায়নি সে। তারপর তার ঠোঁট ফাঁক হলো। 'প্রথমে মায়ামিতে। তারপর স্যান্ডউইচে। এখন জেনেভায়। নাহ্, এটা হঠাৎ দেখা হতেই পারে না। তোমাকে নিঙড়ে আসল সত্যটা বের করা হবে এবার, মাসুদ রানা।' তার দৃষ্টি অলসভঙ্গিতে রানার মাথাকে ছাড়িয়ে গেল। 'আসান,' বলল সে। 'টরচার রুম!'

এগারো

রানার এই প্রতিক্রিয়ার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। অকস্মাৎ ওর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। চোখের পলকে সামনে বাড়ল এক পা, তারপর লাফ দিল গালিবকে লক্ষ্য করে। প্রথমে ডেস্কের উপর পড়ল ও। সাজানো কাগজ-পত্র ছিটকে পড়ল চারদিকে। ওর মাথা গালিবের ব্রেস্টবোন-এ সজোরে ঠুকে যেতে ভারী একটা শব্দ হলো। সংঘর্ষের ফলে পিছন দিকে উল্টে যাওয়ার উপক্রম করল গালিভের ভারী চেয়ারটা। ডেস্কের কিনারায় পা বাধিয়ে নিয়ে আবার মাথা দিয়ে গুঁতো মারার ভঙ্গিতে সামনে এগোল রানা। এবার গালিবকে নিয়ে পিছনের মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে চেয়ারটা। ডেস্কের কিনারা থেকে রানাও তার উপর পড়ল, হাত দিয়ে চেপে ধরল তার গলাটা।

পরমুহূর্তে যেন গোটা বাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার উপর। মোটা লাঠির প্রচণ্ড বাড়ি লাগল ওর ঘাড়ে। গালিবের উপর থেকে একটা বস্তার মত গড়িয়ে মেঝেতে পড়ল ও, তারপর স্থির হয়ে গেল।

একটা বালতি খালি করা হলো রানার মুখে। ওর মুখের ভিতরটা ভরে উঠল পানিতে, চোখের পাতায় আটকে থাকল। বমি করার চেষ্টা করল ও, চেষ্টা করল নড়তে, কিন্তু পারছে না।

তারপর ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হলো। মাথাটাও এতক্ষণে কাজ শুরু করল। ঘাড়ের পিছনে ব্যথাটা দপদপ করছে। মুখের উপর ঝুলে রয়েছে হেলমেট আকৃতির শেড, তাতে একশো

ওয়াটের বালব জ্বলছে। এক ধরনের টেবিলের উপর শোয়ানো হয়েছে ওকে, সেটার কিনারার সঙ্গে ওর হাত-পায়ের কবজি আর গোড়ালি বাঁধা। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল। অনুভব করল জিনিসটা মসৃণ ধাতব।

একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। কথা বলছে গালিব। সুরটা একঘেয়ে। 'হাঁ, এখন আমরা শুরু করতে পারি।'

আওয়াজটার দিকে মাথা ফেরাল রানা। আলোর উজ্জ্বলতা চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। চোখের পাতা কুঁচকে তাকাবার চেষ্টা করল। একটা ক্যানভাসের চেয়ারে বসে রয়েছে গালিব। জ্যাকেটটা নেই, গায়ে শুধু শার্ট। তার গলার নীচের দিকটায় লাল দাগ ফুটে উঠেছে। পাশের ফোল্ডিং টেবিলে বিভিন্ন ধরনের টুলস ও মেটাল ইন্সট্রুমেন্ট সাজানো রয়েছে, আরও রয়েছে একটা কন্ট্রোল প্যানেল।

টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসিয়ে রাখা হয়েছে শাকিলাকে। চেয়ারের হাতল ও পায়ার সঙ্গে তার কব্জি ও গোড়ালি বাঁধা। শিরদাঁড়া খাড়া করে আছে সে, যেন স্কুলে বসে ক্লাস করছে। আশ্চর্য সুন্দর লাগছে তাকে, তবে খানিকটা বিমূঢ় ও দিশেহারা। রানার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হয় তাকে ড্রাগ দেওয়া হয়েছে, নয়তো সম্মোহনের শিকার।

ডানদিকে মাথা ঘোরাল রানা। কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোরিয়ান হুনমিন আসান। মাথায় এখনও বোলার হ্যাটটা থাকলেও, কোমরের উপরে কিছু পরেনি সে। তার প্রকাণ্ড হলুদ ধড় চকচক করছে ঘামে। কোথাও কোনও লোম নেই। বুকের চ্যাপ্টা পেশিগুলো ডিনার প্লেটের মত চওড়া। বাইসেপ ও ফোরআর্ম, এগুলোও লোমবিহীন, উরুর মত মোটা। চোখ এত সরু, যেন ঘড়ির কাঁটা: একটায় নয়টা বাজতে তেরো মিনিট বাকি, অপরটায় তিনটা বেজে তেরো মিনিট; দৃষ্টিতে সন্তুষ্টি ও লোভ। মুখে দাঁত বের করা প্রত্যাশার নিঃশব্দ হাসি।

মাথাটা তুলল রানা। দ্রুত চোখ বুলাতে গিয়ে ব্যথা অনুভব করল ঘাড়ের পিছনে। কোনও একটা ফ্যাক্টরির ওঅর্করুমে রয়েছে ওরা। দুটো ইলেকট্রিক ফারনেস দেখতে পেল ও, ওগুলোর লোহার দরজার চারপাশে সাদা আলো জ্বলছে। কাছেই কাঠের ফ্রেমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নীলচে ধাতব পাত। কোথাও থেকে জেনারেটারের আওয়াজ ভেসে আসছে। হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর ভোঁতা শব্দও পাচ্ছে রানা। কোথাও একটা পাওয়ার প্লান্টও চলছে বলে মনে হলো।

চোখ নামিয়ে টেবিলটার উপর দৃষ্টি বুলাল রানা, ওকে যেটায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথাটাকে নেমে আসতে দিল। ইস্পাতের মসৃণ টেবিলে সরু একটা ফাটল রয়েছে, মাঝখান থেকে শুরু হয়ে দূরে সরে গেছে। ফাটলটার দূর প্রান্তে, ফাঁক করা ওর দুই পায়ের মাঝখানে, বৃত্তাকার একটা করাতের চকচকে দাঁত দেখা যাচ্ছে।

চোখ তুলে বালবটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ঘরোয়া আলাপের সুরে বলতে শুরু করল গালিব।

'রানা, তুমি বোধহয় জানো না পেইন শব্দটা এসেছে ল্যাটিন পিনা থেকে, যার অর্থ পেনালটি, যা কিনা উসুল করতেই হবে। ক্ষেত্র বিশেষে বেশি জানতে চাওয়াটা অপরাধ। কেন, শোননি, কৌতূহলী বিড়াল খুন হয়ে যায়? সেই কৌতূহলে এখন দুটো বিড়াল মারা যাচ্ছে। কেন? কারণ, মন ও মাথা বলছে মেয়েটিকেও আমার শত্রু বলে গণ্য করতে হবে।

'লোক পাঠিয়ে তোমাদের লুকানোর জায়গা থেকে রাইফেলটা আনিয়েছে আসান। সম্মোহনের সাহায্যে এ-ও জেনেছি, মেয়েটি আমাকে খুন করতে এসেছিল। কী জানি, তোমার উদ্দেশ্যও হয়তো তাই ছিল। যাই হোক, এখন তুমি টের পাবে একজন বিশাল ধনী ও ক্ষমতাবান লোকের পেছনে লাগলে তার পরিণতি কী হতে পারে।'

কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিল গালিব। রানার টেবিলের শেষ মাথায় চাপা ধাতব গর্জন শুরু হলো। আওয়াজটা দ্রুত বদলে গিয়ে একটানা কর্কশ গুঞ্জনের মত হয়ে উঠল।

মাথাটা এক পাশে ঘুরিয়ে নিল রানা। মৃত্যুটাকে কতক্ষণে ম্যানেজ করা যাবে? এগিয়ে নিয়ে আসার, দ্রুত ঘটানোর কোনও উপায় আছে?

'কী বলছি মন দিয়ে শোনো, রানা,' আবার মুখ খুলল গালিব। 'আমি চাই তুমি কথা বলো। শুনে যদি মনে হয় তুমি সত্যি কথা বলছ, মৃত্যুটা হবে দ্রুত, কোনও ব্যথা ছাড়াই। ভেবে দেখো, কী শান্তি! এটা মেয়েটির বেলায়ও খাটবে। আর যদি মুখ না খোলো, প্রচণ্ড ব্যথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিৎকার করবে তুমি। আর মেয়েটাকে আমি তুলে দেব আমার মুশকিল আসানের হাতে। ডিনার খাওয়ার জন্যে বিড়ালটিকে যেমন ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। বলো, কীসে রাজি তোমরা?'

'বোকামি কোরো না, গালিব। আমি আমার বন্ধুর অফিসকে বলে এসেছি কোথায়, কেন যাচ্ছি। মেয়েটির মা-বাবা জানেন আমার সঙ্গে এসেছে ও। এখানে আসার আগে তোমার ফ্যাক্টরি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি। লোকজন আমাদেরকে এখানেই খুঁজতে চলে আসবে। আমরা না ফিরলে কালই তোমার এই জায়গা ঘিরে ফেলবে পুলিশ। তুমি বোকার মত মস্ত একটা ভুল করতে যাচ্ছ। আমরা নেহাতই নিরীহ মানুষ।'

গালিবের গলার আওয়াজে বিরক্তি প্রকাশ পেল। 'পুলিশ? ধ্যাত, পুলিশকে ভয় পাব কেন? ওরা তো আমার বন্ধু! তা ছাড়া, পুলিশ এখানে এসে কোথায় খুঁজবে তোমাদেরকে? আমার কোরিয়ান কর্মচারীরা তোমাদেরকে ফারনেসে ঢুকিয়ে দেবে, তোমাদের সমস্ত জিনিস-পত্র সহ। দুই হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় স্রেফ বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে তোমরা। না, রানা,

বোকামি করছ তুমি। তাড়াতাড়ি বাছাই করো। আমি বোধহয় তোমাকে উৎসাহিত করতে পারি–' করাত-এর লোহার দাঁতে একটা লিভার নড়াচড়ার আওয়াজ হলো। 'স-টা এখন প্রতি মিনিটে প্রায় এক ইঞ্চি করে তোমার শরীরের দিকে এগোচ্ছে। এই সুযোগে,' হুনমিন আসানের দিকে ফিরে একটা আঙুল খাড়া করল সে, 'আসানের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করো। প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষা, আশা করি তাতেই কাজ হবে। মাধ্যমিক অব্যর্থ মহৌষধ, মরা মানুষও সহ্য করতে না পেরে কেঁদে ওঠে।'

চোখ বুজল রানা। কাছে এসে দাঁড়াল আসান। চিড়িয়াখানার উৎকট দুর্গন্ধ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। লোকটার বড় বড় আঙুল সাবধানে ওর শরীরটাকে নিয়ে কাজ শুরু করল। এখানে টিপছে। ওখানে চাপ দিচ্ছে। হঠাৎ একটা জায়গা খামচে ধরল। একটু বিরতি। তারপর দ্রুত একটা ঘুসি। কী হয় না হয় জানা নেই। ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে আছে রানা। ঘামছে।

পাঁচ মিনিটে পাঁচটা ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো রানার।

'এর কি সত্যি কোনও দরকার আছে, রানা?' একটু তাগাদার সুরে জানতে চাইল গালিব। 'সত্যি কথাটা বলে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তারপরই তো··· ওহ্, কী শান্তি! তোমাদের দুজনকেই একটা করে ট্যাবলেট দেয়া হবে। এতটুকু ব্যথা অনুভব করবে না। মারা যাবে ঘুমের মধ্যে। এবার বলো, কে তুমি? কে তোমাদেরকে পাঠাল? কতটুকু কী জানো তোমরা?'

আসানের টরচার বন্ধ হয়েছে। কথার আওয়াজ থামতে সেদিকে মাথাটা ঘুরিয়ে চোখ খুলল রানা। বলল, 'গালিব, বলার মত সত্যি আর কিছু নেই। তুমি যদি মানো তা হলে আমি একটা প্রস্তাব দিতে পারি তোমাকে। প্রার্থনা ও আমি তোমার হয়ে কাজ করব। ভেবে-চিন্তে জবাব দাও। আমরা ভাগ্যান্বেষী হতে পারি, কিন্তু মানুষ। আমাদেরকে তুমি কাজে লাগালে ভাল ফল পাবে।'

'পিঠে ছুরি খাওয়ার জন্যে? ধন্যবাদ, রানা– না।'

রানা বুঝল, এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। এখন ইচ্ছেশক্তি এক করা দরকার, নির্যাতন যাতে সহ্য করতে পারে, যাতে দুর্বল কোনও মুহূর্তে গালিবের মত ইতরপ্রাণীর কাছে প্রাণভিক্ষা না চেয়ে বসে।

গালিব অর্ডার করল, 'আসান, মাধ্যমিক!'

টেবিলের লিভারটা লোহার দাঁতের উপর ঘষা খেলো। এখন রানা করাত কলের বাতাস অনুভব করছে দুই হাঁটুতে। আসানের হাত দুটো আবার ফিরে এল ওর শরীরে।

চোখ বুজে নিজের পালস গুণছে রানা। ওর গোটা শরীরই যেন মস্ত একটা রগ-এ পরিণত হয়েছে, প্রতি মিনিটে একশো বিশবার লাফাচ্ছে সেটা। ফ্যাক্টরির আরেক অংশে সচল পাওয়ার প্লান্ট-এর মত সারাক্ষণ হাঁপাচ্ছে, তবে ওর বেলায় প্রাণ স্পন্দন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছে। এই নিস্তেজ হওয়াটা শুধু যদি দ্রুত ঘটত। বাঁচার এই আকুতিটা কোত্থেকে আসে, যে আকুতি মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে চায় না? ফুয়েল নেই, ট্যাংক শুকনো খটখটে, তারপরও কে চালাচ্ছে ইঞ্জিনটাকে? মনটাকে ওর খালি করে ফেলতে হবে। হারিয়ে যেতে হবে চৈতন্যহীনতার অন্ধকার রাজ্যে।

এখনও পাতা ভেদ করে আলো লাগছে চোখে। এখনও কপালে আঙুলের চাপ অনুভব করছে ও। এখনও কানে বাজছে জীবনের ধীরগতি স্পন্দন। শক্তভাবে এক হয়ে থাকা দু'সারি দাঁতের ভিতর থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইল। ব্যথা! অসহ্য ব্যথা! মরিয়া হয়ে নিজের মৃত্যু কামনা করল রানা।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

বারো

পাখিরা মিষ্টি সুরে গাইবে। পায়ে নূপুর বেঁধে হুর-পরীরা নাচবে। কিন্তু কোথায় কী! কে যেন ধাক্কা মেরে বসল। রানা বলল, 'অ্যাই!' কনুইটা ডলবার জন্য অপর হাতটা বাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু নড়ল না সেটা।

বেহেশতে এরা দেখছি ইংরেজি বলছে, তা-ও আমেরিকান উচ্চারণ। 'ওহে, মাইকেল, ইনি দেখছি নড়াচড়া করতে চাইছেন। তাড়াতাড়ি খবর দাও ডাক্তারকে।'

রানা অনুভব করল, মাথাটা ঘোরাতে পারছে। চারদিকে চোখ মেলে দেখল: নাহ্, কোথায় স্বর্গ! একটা স্ট্রেচারে শুয়ে রয়েছে ও। এটা বোধহয় এয়ারপোর্ট-এ হেলথ ডিপার্টমেন্টের কোন আয়োজন। এক শ্বেতাঙ্গ ঝুঁকে রয়েছে ওর মুখের উপর। হাসল সে। 'কেমন বোধ করছেন, মিস্টার?'

'আমি কোথায়?' ওর দু'পাশে আরও কয়েকটা স্ট্রেচার দেখতে পাচ্ছে রানা।

'আপনি সুস্থ আছেন। এই জায়গার নাম আইডলউয়াইল্ড, নিউ ইয়র্ক। আপনি এখন আমেরিকায়। আর কোন সমস্যা হবে না, দেখবেন।' লোকটা সিধে হলো। পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীকে বলল, 'তাড়াতাড়ি, মাইকেল। এই লোক এখনও ঘোরের মধ্যে রয়েছে, শক-টা নিশ্চয়ই খুব বড় ছিল।'

ওয়ার্ড-এর একটা দরজা খুলে গেল। সাদা কোট পরা একজন ডাক্তার ভিতরে ঢুকে খোলা দরজাটা ধরে আছেন। চোখে-মুখে

অমায়িক ভাব নিয়ে ভিতরে ঢুকল সৌবর্ণ গালিব। তার পিছু নিয়ে এল হুনমিন আসান। ক্লান্ত ভঙ্গিতে চোখ বুজল রানা। খোদা! তার মানে বিপদ কাটেনি।

মেঝেতে পড়ে থাকা স্ট্রেচারের চারধারে কয়েক জোড়া পা জড়ো হলো। 'বেশ, বেশ,' সহাস্যে বলল গালিব। 'ওরা এখন ভাল আছে বলেই মনে হচ্ছে, কী বলেন, ডাক্তার? অঢেল টাকা থাকার এই একটা ভাল দিক। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আত্মীয় কিংবা বন্ধুরা তার জন্যে সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।'

'এদের ঠিক কী...

ডাক্তারের সহকারীকে প্রশ্নটা শেষ করতে দিল না গালিব, বলল, 'নার্ভাস ব্রেকডাউন, দুজনেরই। শুধু কি তাই? একই হপ্তায়! অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে, তাই না? আসলে এর জন্যে আমিই দায়ী। ওদেরকে প্রচণ্ড খাটিয়েছি। কাজেই আবার ওদেরকে সুস্থ করে তোলাটা আমারই দায়িত্ব। ডক্টর হচ, জেনেভায় তিনি সবচেয়ে বড় ডাক্তার, জানিয়েছেন ওদের বিশ্রাম দরকার। তিনিই তো ওদেরকে সেডেটিভ দিয়েছেন। এখন ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছি ওয়াল্টার রিড হসপিটালের নিউ ইয়র্ক শাখায়।

'ওটা যখন উদ্বোধন করা হলো, উপস্থিত ছিলাম। প্রতিটি ওয়ার্ডের সমস্ত বেড আমিই দান করেছি। কয়েক লাখ ডলার খরচ পড়েছে। কখনও ভাবিনি প্রতিদানে ওদের কাছ থেকে কিছু নেব। কিন্তু এখন? আমি শুধু একটা ফোন করেছি, সঙ্গে সঙ্গে এদের জন্যে দুটো কেবিন রেডি করে ফেলেছে তারা। এখন তা হলে,' কাগুজে নোটের খসখস আওয়াজ শোনা গেল, '...ইমিগ্রেশনে সাহায্য করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাক্তার। ভাগ্যক্রমে দুজনেরই ভ্যালিড ভিসা ছিল, আর তা ছাড়া অফিসাররা নিশ্চয়ই ভেবেছেন যে স্বয়ং মিস্টার সৌবর্ণ গালিব যখন গ্যারান্টি দিচ্ছেন তখন ওরা কেউ মার্কিন সরকারকে উৎখাত করতে চাইবে বলে মনে হয় না, কি?'

'হ্যাঁ, না, অবশ্যই। ধন্যবাদ, মিস্টার গালিব। আপনি তো,

সার, প্রেসিডেন্টের ওঅর এগেইনস্ট টেরর ফান্ডেও এক মিলিয়ন ডলার চাঁদা দিয়েছেন... '

'শ্-শ্-শ্-শ্-শ্–' ঠোঁটে আঙুল রাখল গালিব, সারা মুখে চাপা হাসি। 'লাদেন শুনে ফেলবে!'

'সার, বাইরে আপনাদের জন্যে একটা প্রাইভেট অ্যামবুলেন্স অপেক্ষা করছে... '

চোখ খুলল রানা। তাকাল যেদিক থেকে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। চশমা পরা এক তরুণ। মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল। শান্ত অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে শুরু করল ও। 'ডাক্তার, আমার ও আমার বান্ধবীর কিছুই হয়নি। ড্রাগের সাহায্যে অজ্ঞান করে প্লেনে তোলা হয়েছে, তারপর এখানে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদেরকে। আমরা কেউ গালিবের কাজ করি না। প্লিজ, আপনি পুলিশকে খবর দিন... '

ডাক্তারকে উদ্বিগ্ন দেখাল। গালিবের দিকে ফিরল সে।

কাতর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল গালিব, রানাকে আড়াল করে, ও যাতে অপমানিত বোধ না করে। নিজের মাথার এক পাশে একটা আঙুল ছোঁয়াল, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল রানার ওটা বিগড়েছে। 'এখন দেখছেন তো আমার কথা সত্যি কিনা, ডাক্তার? এই অবস্থাই চলছে কদিন ধরে। টোটাল নার্ভাস প্রসট্রেইশন, সঙ্গে পারসিকিউশন ম্যানিয়া। ডক্টর হচ বললেন, এ দুটো প্রায়ই একসঙ্গে দেখা দেয়। তবে ওকে অবশ্যই সুস্থ করে ছাড়ব। অচেনা পরিবেশ অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না... ইঞ্জেকশন দিলে কেমন হয়? ঘুমিয়ে পড়ত... '

নিজের কালো ব্যাগটার দিকে ঝুঁকল ডাক্তার। 'ঠিক বলেছেন, মিস্টার গালিব।' ডাক্তারি সরঞ্জাম নাড়াচাড়ার শব্দ ভেসে এল।

রানার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল গালিব। হাইপডারমিক সিরিঞ্জে ঘুমের ওষুধ ভরে এগিয়ে এল ডাক্তার।

এরপর ঘুম ভাঙল বাক্স আকৃতির একটা কামরায়। চারদিকে চোখ

বুলাল রানা। কোনও জানালা নেই। সিলিঙের মাঝখানে আটকানো নিঃসঙ্গ ইলেকট্রিক ল্যাম্প থেকে আলো আসছে। ওটার পাশেই একটা এয়ারকুলার। শক্ত একটা বিছানায় শুয়ে রয়েছে ও। হাত-পা খোলা। মনে হলো চেষ্টা করলে উঠে বসতে পারবে।

বসবার পর একটু আচ্ছন্ন বোধ করল, তবে অসুস্থ লাগছে না। পা দুটো নামিয়ে মেঝেতে রাখল। হঠাৎ অনুভব করল রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে ওর। শেষবার কবে খেয়েছে? দু'দিন··· তিন দিন আগে?

সম্পূর্ণ নগ্ন ও। শরীরটা পরীক্ষা করল। আসান ব্যাটা সত্যিই সতর্ক ছিল। ডান হাতে সুই বেঁধানোর দাগ ছাড়া কোথাও আর কিছু নেই।

আচ্ছন্ন ভাবটাকে অগ্রাহ্য করে দাঁড়াল রানা। খাটের নীচের দিকে একটা দেরাজ রয়েছে। ঝুঁকে খুলল ওটা। হাতঘড়ি আর পিস্তল ছাড়া ওর সুটকেসের প্রতিটি জিনিস রয়েছে এখানে। এমনকী ভারী জুতো জোড়াও।

ডানপাটির জুতোটার সোল-এর মধ্যে গোপন কমপার্টমেন্ট আছে। সেটার ভিতর ছোট একটা ফোল্ডিং নাইফ থাকার কথা। তবে এখন দেখা যাবে না। এ ঘরে গোপন ক্যামেরার চোখ বা কান আছে কি না খুঁজে দেখার পর পরীক্ষা করবে ওটা।

কামরায় দুটো দরজা। তবে হাতল আছে মাত্র একটায়। সেটাই খুলল রানা। বাথরুম। গোসল ও দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম যত্ন করে রাখা। ওগুলোর পাশে রাখা রয়েছে একটি মেয়ের যা যা লাগতে পারে।

বাথরুমের দ্বিতীয় দরজাটা খুলল রানা। বাক্স আকৃতির আরেকটা ঘর। বিছানায় ঘুমাচ্ছে শাকিলা। বালিশে স্তূপ হয়ে আছে তার কালো রেশমী চুল। ঘুমের মধ্যে ভারি সুন্দর লাগছে মেয়েটিকে। ঠোঁটে আধো হাসি ফুটে আছে।

বাথরুমে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করল রানা। আয়নায় চোখ

রেখে খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি দু'দিনের নয়, সম্ভবত তিনদিনের পুরানো। নিজেকে পরিচ্ছন্ন করার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও। সেই ফাঁকে তীক্ষ্নদৃষ্টি খুঁজছে সিলিং আর দেয়াল, চোখ নেই দেখে তন্ন তন্ন করে খুঁজল মাইক্রোফোন; না ওটাও নেই। শোবার ঘরে ফিরেও কিছুই পেল না ও। দেখল জুতোর গোড়ালিতে তিন ইঞ্চি ব্লেডের ছুরিটা আছে।

আধ ঘণ্টা পর, বিছানার কিনারায় বসে চিন্তা করছে রানা, এই সময় হঠাৎ হাতলবিহীন দরজাটা খুলে গেল। দোবগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে হুনমিন আসান। রানার দিকে তাকাল সে, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও। তারপর কামরার চারদিকে চোখ বুলাল।

তীক্ষ্নকণ্ঠে রানা বলল, 'আসান, প্রচুর খাবার দরকার আমার, জলদি। আর এক বোতল হুইস্কি, বরফসহ। কিছু হাভানা চুরুটও লাগবে। তা ছাড়া, হয় আমার হাতঘড়িটা, তা না হলে ওটার মত ভাল আরেকটা। যাও, যত তাড়াতাড়ি পার। কুইক মার্চ! ও, হ্যাঁ, গালিবকে বলো, তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। তবে খালি পেটে নয়। এখনও সং সেজে দাঁড়িয়ে আছ কী মনে করে? যাও! আমার খিদে পেয়েছে।'

চোখ-মুখ লাল করে রানার দিকে তাকাল আসান, যেন ভাবছে কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গটা ভাঙবে। মুখ খুলে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করল সে, মেঝেতে থুথু ফেলার কদর্য ভঙ্গি করল, তারপর পিছিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

ছোট্ট ঘটনাটা রানার ভিতর হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। যে-কোনও কারণেই হোক, ওকে মেরে না ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌবর্ণ গালিব। ওদেরকে তার জীবিত দরকার। অচিরেই জানা যাবে কী কারণে ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে সে। তবে যতক্ষণ বেঁচে আছে, সময়টা নিজের শর্তে কাটাবে রানা। যেমন, সেরকম একটি শর্ত হলো, আসানের মত নিকৃষ্ট প্রাণীর সঙ্গে কুকুর-বিড়ালের মত আচরণ করবে ও।

সবই নিয়ে এল একজন কোরিয়ান চাকর। এমনকী রানার ঘড়িটাও। তবে নিউ ইয়র্কের ঠিক কোথায় রয়েছে সেটা বুঝতে পারল না রানা। শুধু মনে হলো ওর কামরাটা নদী ও রেলওয়ে ব্রিজের কাছে। নদীটা হাডসনও হতে পারে, আবার ইস্ট রিভার হওয়াও বিচিত্র নয়। ওর হাতঘড়িটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সম্ভবত গালিব চায় না ও জানুক এখন কটা বাজে। প্রশ্ন করেও কোনও জবাব পেল না।

ট্রে-র সমস্ত উপাদেয় খাবার গোগ্রাসে সাবাড় করল রানা। বরফ মেশানো হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে একটা চুরুট ধরাল।

এক সময় দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল গালিব। একা এসেছে সে। বিজনেস সুট পরেছে, পেশিতে ঢিলে-ঢালা ভাব, মুখে হাসি। দরজাটা বন্ধ করে কবাটের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

'আমি শুনছি,' উৎসাহ দেওয়ার সুরে বলল রানা।

'গুড মর্নিং, রানা। দেখতে পাচ্ছি নিজেকে আবার খুঁজে পেয়েছ তুমি। আশা করি মৃত্যুর চেয়ে বেঁচে থাকতেই ভাল লাগছে তোমার। জানি অনেক প্রশ্ন জমেছে তোমার মনে। জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমি এখন যা বলব, তোমার সব প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়ে যাবে। আমার কথার মধ্যে একটা প্রস্তাবও থাকবে। সেটার ব্যাপারে তোমার মতামত জানতে হবে আমাকে। তার আগে অন্য একটা কথা।

'তোমাকে আমার আর দশজনের চেয়ে আলাদা মনে হয়েছে। তুমি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, প্র্যাকটিকাল মানুষ। তাই শুরু করার আগে ছোট্ট একটা ওয়ার্নিং। কোনও রকম ড্রামার আশ্রয় নিয়ো না। বোতল, ফর্ক কিংবা ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো না আমার ওপর। সেরকম কিছু করতে দেখলে এটা ব্যবহার করব আমি।' গালিবের ডান হাতে কালো আঙুলের মত গজাল ছোট একটা পিস্তল। হাতসহ অস্ত্রটা পকেটে ঢোকাল সে। 'এ-সব জিনিস খুব কমই ব্যবহার করি আমি। যখন করি, .২৫ ক্যালিবারের ওপরে যাই না।

মানুষ ঠিকই মরে। তার কারণ গুলিটা আমি সব সময় ডান চোখে করি। আর আমার লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না।'

'ভয় পেয়ো না,' বলল রানা। 'মদের বোতল ছুঁড়ে কাউকে লাগাতে পারি না আমি।' পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে বসল ও। 'ঠিক আছে, গো অ্যাহেড।'

'দেখো রানা,' গালিবের কণ্ঠস্বর শান্ত ও আন্তরিক, 'মেটাল ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে এক্সপার্ট আমি। যে-কোনও জিনিসে ওয়ান থাউজেন্ড ফাইন দেখলে চিনতে পারি। ওয়ান থাউজেন্ড ফাইন বলা হয় বিশুদ্ধতম সোনাকে। সবাই আমরা জানি সোনার মত অত খাঁটি হয় না মানুষ। তবে মাঝে মধ্যে এক-আধজনকে পেয়ে যাই, যারা আর দশজনের চেয়ে বেশি খাঁটি। এ-ধরনের লোককে কাছে টেনে নিয়ে নিচু স্তরের কাজে লাগাই আমি। তার একটা উদাহরণ হুনমিন আসান, সরল, অপরিশীলিত, তবে স্থূল কাজগুলো করানো যায়। এরকম একটা কাজের যন্ত্র ধ্বংস করতে যাচ্ছিলাম, একেবারে শেষ মুহূর্তে আমার হাতটা ইতস্তত করতে লাগল। সেই যন্ত্রটা তুমি। তোমার ভেতরে খাঁটি সোনার অন্তত কিছুটা আমি দেখতে পেয়েছি। তবে শুধু এই দেখতে পাওয়াটাই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট ছিল না। এর পেছনে তোমার একটা কথারও অবদান আছে।

'তুমি বলেছিলে তোমরা দুজন আমার হয়ে কাজ করতে চাও। এমনিতে তোমাদের কোনও সার্ভিস আমার দরকার হত না, তবে ঘটনাচক্রে শিগ্‌গির জরুরি একটা অপারেশনে হাত দিতে যাচ্ছি আমি, তাতে হয়তো তোমরা আমার কিছুটা সাহায্যে লাগতে পার। কাজেই জুয়াটা আমি খেললাম।

'দুজনকেই যতটুকু প্রয়োজন সেডেটিভ দেয়া হয়। তোমাদের বিল মিটিয়ে হোটেল শেরাটন থেকে লাগেজ আনিয়ে নিই। ওখানে দেখা গেল তোমার বান্ধবী নিজের নাম প্রার্থনা নয়, শাকিলা ব্যবহার করেছে। তোমার বন্ধুর অফিসের যে ঠিকানা আমাকে তুমি

দিয়েছিলে সেখানে একটা ই-মেইল পাঠিয়েছি; নিজেকে মাসুদ রানা বলে। ওখান থেকে জানানো হয়েছে, তোমার এমপ্লয়াররা চায় তুমি তাদের জন্য কানাডায় গার্মেন্টস-এর বাজার ধরার চেষ্টা করো।

'কানাডায় কাজের পরিবেশ কেমন দেখার জন্যে ওখানে যেতে রাজি হয়েছ তুমি। মিস শাকিলাকে সঙ্গে নিচ্ছ প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে। আরও বিশদ জানিয়ে ওদেরকে একটা ই-মেইল পাঠাবে তুমি। আধ-খাপচা একটা ই-মেইল, তবে অল্প যেটুকু সময় তোমার সার্ভিস নেব আমি তার জন্যে যথেষ্ট। তারপরও তুমি যদি মনে করো আমার এত সব সাবধানতা অবলম্বন যথেষ্ট নয়, তোমাকে ট্রেস করা হবে, তা হলে তোমার জ্ঞাতার্থে শুধু এটুকু বলতে চাই: এখন আর আমি তোমার আসল পরিচয় জানতে ইচ্ছুক নই, এ-ও জানতে চাই না তুমি কার হয়ে কী কাজ করো।'

রানা ভাবছে অন্য কথা। রানা এজেন্সির যে সেফ হাউসে ই-মেইল পাঠিয়েছে গালিব, তাতে ওর সাংকেতিক চিহ্ন নেই, অফিশিয়াল প্রতিটি ফোন-কল, চিঠি, ই-মেইল ইত্যাদিতে যেমন থাকে। অর্থাৎ রানা এজেন্সির মাধ্যমে বিসিআই, বিসিআই-এর মাধ্যমে বিএসএস এরইমধ্যে জেনে ফেলেছে, বেঁচে আছে ও, তবে শত্রুপক্ষের নির্দেশ মেনে থেকে কাজ করতে হচ্ছে ওকে। স্বভাবতই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না তারা।

'কেন এ-কথা বলছি? কেন তোমার সম্পর্কে কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করছি না?' আবার শুরু করল গালিব। 'কারণ তুমি আর শাকিলা নিঃশেষে গায়েব হয়ে গেছ। একইভাবে গায়েব হয়ে গেছি আমিও, আমার স্টাফসহ। এয়ারপোর্টে খোঁজ নিলে ওয়াল্টার রিড হসপিটালের ঠিকানা পাবে পুলিশ। কিন্তু হসপিটাল কর্তৃপক্ষ জানাবে, তারা কোনও সৌবর্ণ গালিবকে চেনে না, তার রোগী সম্পর্কেও তাদের কোনও ধারণা নেই।

'এফবিআই কিংবা সিআইএ-র কাছে সৌবর্ণ গালিবের নামে কোনও রেকর্ড নেই, কারণ ক্রাইম করে কখনও ধরা পড়েনি সে।

ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আসা-যাওয়ার বিশদ বিবরণ আছে, কিন্তু সে-সব কারও কোনও উপকারে আসবে না।

'গায়েব হবার পর কোথায় আছি আমরা? আছি "স্পিডি ট্রাকিং করপরেশন"-এর ওয়্যারহাউসে। এক সময় বিখ্যাত একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল, নমিনির মাধ্যমে কিনে নিয়েছি আমি। খানিক আগে যে অপারেশনের কথা বললাম, তার সিক্রেট হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করা হবে এটাকে। প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট কিনে সব নতুন করে সাজানো হয়েছে। এদিকটায় তোমাদের দুজনের থাকার ব্যবস্থা।'

'অনেক কথাই বললে তুমি, কিন্তু আমাদের কাজটা কী হবে তা তো বললে না?'

এই প্রথম সৌবর্ণ গালিবের চোখ দুটো আলোকিত হয়ে উঠল। 'রানা, সারাটা জীবন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি। আমার প্রেম সোনার সঙ্গে। সোনার রং ভালবাসি আমি, ভালবাসি ওটার উজ্জ্বলতা, ওটার অলৌকিক ওজন। ছোটবেলা থেকে নাড়াচাড়া করছি, শুধু স্পর্শ করেই বলে দিতে পারি একটা বার কত ক্যারাটের। ভালবাসি গলাবার পর তরল সিরাপ। তবে, রানা, সবচেয়ে ভালবাসি সোনা তার মালিককে যে ক্ষমতাটা এনে দেয়: শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ম্যাজিক, যে-কোনও ইচ্ছে ও খেয়াল পূরণ করার সাধ্য, শরীর-মন-আত্মা কিনে ফেলার সামর্থ্য। তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করি, সোনা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনও বস্তু আছে, যা মালিককে এত কিছু দেয়?'

'এমন লোক অনেক পাওয়া যাবে যাদের এক আউন্স সোনাও নেই, অথচ বিপুল টাকা ও ক্ষমতা অর্জন করেছে,' বলল রানা। 'তবে তোমার পয়েন্টটা আমি ধরতে পারছি। কত সোনা আছে তোমার, সেই সোনা দিয়ে তুমি কী করো?'

'আমার কাছে যে সোনা আছে তার বাজারদর দুশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিশ্বাস করতে পার? পৃথিবী প্রায় সব দেশের ব্যাঙ্কে

আমার তুলে নেয়ার প্রতীক্ষায়। ওগুলো সব সময় এক জায়গায় রাখি না, এখানে সেখানে সরিয়ে নিই। তবে যেখানেই রাখি না কেন, ওগুলো বাচ্চা দেয়, অর্থাৎ পরিমাণে বাড়ে।'

'তোমার ব্যবসাটা তা হলে কী? আমার বোধহয় জিজ্ঞেস করা উচিত, তুমি ঠিক কীভাবে সোনা সংগ্রহ করো?'

'ব্যবসা-ট্যবসা বুঝি না। কাজ বুঝি। আমার কাজ হলো সোনার পরিমাণ বাড়ানো। যাই আমি করি, উদ্দেশ্য থাকে একটাই: সোনার মজুদ বাড়ানো। সেজন্যে বিনিয়োগ করি, স্মাগল করি, প্রয়োজনে চুরি করি।'

'তোমার লেটেস্ট প্রজেক্টটা কী? সেটার সঙ্গে আমার ও শাকিলার কী সম্পর্ক?'

'লেটেস্টটাই লাস্ট, রানা,' জবাব দিল গালিব। 'সবচেয়ে বড়ও বটে।' তার চেহারায় ধ্যানমগ্ন একটা ভাব চলে এসেছে। 'মানুষ কত অসাধ্যসাধনই না করেছে, তাই না? এভারেস্টে চড়েছে, সমুদ্রের তলায় নেমেছে, অ্যাটমকে ভেঙেছে, চাঁদে গেছে। সভ্যতার ইতিহাস রেকর্ড ভাঙা আর রেকর্ড গড়ার ইতিহাস, মিরাকল অর্জনের প্রতিযোগিতা। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে খুব অবহেলা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রটিকে ঢালাওভাবে ক্রাইম বলা হয়।

'ক্রাইম অনেক রকম হয়। যুদ্ধও ক্রাইম। ব্যাঙ্ক ডাকাতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, লোক ঠকানো– এ সবও ক্রাইম। আমি এগুলোর কথা বলছি না। আমি বলছি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ক্রাইমটার কথা। যেটা করার কথা আজ পর্যন্ত ভাবতেই সাহস পায়নি কেউ।

'মঞ্চ তৈরি হয়ে আছে, রানা। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, মাত্র কয়েকশো মাইল। ওই মঞ্চে এখন শুধু অভিনেতাদের দরকার।'

'মঞ্চ রেডি, অভিনেতা দরকার,' বিড়বিড় করল রানা। 'পরিচালক কে?'

নিজের বুকে ভাঁজ করা আঙুলের গিঁট ঠুকল গালিব। 'আমি। কুশীলবও বাছাই করে ফেলেছি। আজ বিকেলে প্রধান পাত্র-পাত্রীদের সামনে চিত্রনাট্য পড়ে শোনানো হবে। তারপর শুরু হবে রিহার্সেল। পরদা উঠবে এক হপ্তার মধ্যে। সেই সঙ্গে শোনা যাবে করতালি। পরবর্তী কয়েক শো বছর ধরে প্রশংসা করবে দুনিয়ার মানুষ।'

গালিবের চোখ দুটো লোভে এত বেশি চকচক করছে, রানার মনে হলো আগুনের মত জ্বলছে ওগুলো। 'বেশ, বলে ফেলো। কাজটা কী? তাতে আমাদের কী ভূমিকা?'

'এটা একটা ডাকাতি, রানা। ব্যাপারটা কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়। খুঁটিনাটি সব কিছু মাথায় রেখে নিখুঁত একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে। প্রচুর পেপারওঅর্ক দরকার। সব একা আমিই করতে যাচ্ছিলাম, এখন তুমি দায়িত্ব নিয়ে কিছু কিছু করবে। শাকিলা কাজ করবে তোমার সেক্রেটারি হিসেবে। এই কাজের জন্যে এরইমধ্যে সম্মানী পেয়ে গেছ তুমি: নতুন জীবন। অপারেশনটা সফল ভাবে সম্পন্ন হবার পর দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম-পরিমাণ সোনা পাবে। পাঁচ মিলিয়ন পাবে শাকিলা।'

'এতক্ষণে কথাগুলো কানে মধুবর্ষণ করছে,' উৎসাহের সঙ্গে বলল রানা। 'কী করতে হবে বলো। রঙধনুর লেজ চুরি করে আনব?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল গালিব। 'ঠিক সেটাই করতে যাচ্ছি আমরা। বেশি না,' হাসছে সে, 'মাত্র পনেরো শো বিলিয়ন ডলার দামের সোনার বার তুলে আনব। হ্যাঁ, রানা, আমরা লুঠ করব ফোর্ট নক্স।'

তেরো

'ফোর্ট নক্স।' রানা গম্ভীর, মাথা নাড়ছে। 'দুজন পুরুষ ও একটি মেয়ে? অসম্ভব একটা ব্যাপার না?'

'হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার কৌতুক-বোধ সুটকেসে তালা দিয়ে রাখো, রানা।' অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল গালিব। 'তারপর যত খুশি প্রাণ খুলে হেসো। আমার অধীনে এক হাজার নারী-পুরুষ কাজ করবে। আমেরিকার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ছয়টা মাফিয়া পরিবার থেকে বেছে বের করে আনা হয়েছে তাদেরকে।'

'ভেরি গুড! তা হলে আমাদের দুজনের প্রয়োজন কোথায়?'

'প্রয়োজন আছে, রানা। আমি তোমাকে দেখাতে চাই আমার ক্ষমতার দৌড়। তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই, তোমার চেয়ে অনেক উঁচু লেভেলের মানুষ আমি। দুইবার সামান্য খেলায় হারিয়ে তুমি নিজেকে আমার সমান ভাববে, এটা মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাকে দেখাব ঠিক কোন্ পর্যায়ের মানুষ আমি। তার আগে তোমাকে খুন করতে মনটা সায় দিচ্ছিল না।'

'তার মানে, কাজটা শেষ হলে তখন করবে?'

'ঠিক নেই, রানা। ছেড়েও দিতে পারি, খেয়ালের বশে চলি আমি। যাই হোক, এবার কাজের কথা–'

'বেশ। ফোর্ট নক্স-এর ভল্ট কজন লোক পাহারা দেয়?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে গালিব। নিজের পিছনের দরজায় নক করল সে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল সেটা। দোরগোড়ায় একটু কুঁজো হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে হুনমিন আসান, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি।

ঘরের ভিতর অশান্তির কোন লক্ষণ নেই দেখে সোজা হলো সে, নির্দেশের অপেক্ষায় থাকল।

গালিব বলল, 'তোমার মনে হাজারটা প্রশ্ন জাগছে, রানা। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব আজ দুপুরে পেয়ে যাবে তুমি। মিটিংটা শুরু হবে আড়াইটায়। এখন বাজে বারোটা।' নিজের হাতঘড়ি অ্যাডজাস্ট করে নিল রানা। 'শাকিলাকে নিয়ে ওই মিটিঙে উপস্থিত থাকবে তুমি। ছয়টা অর্গানাইজেশনের হেডকে প্রস্তাবটা দেয়া হবে। সন্দেহ নেই তারাও অনেক প্রশ্ন করবে। যে-সব প্রশ্ন তোমার মনে জাগছে, ওদের মনেও জাগবে সে-সব; সবই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। পরে শাকিলাকে নিয়ে বসবে তুমি, কাজটার খুঁটিনাটি দিকগুলো লিখে ফেলার জন্যে। কী দরকার জানিয়ো শুধু, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করবে আসান। সে তোমাদের পার্মানেন্ট গার্ডের দায়িত্বও পালন করবে। ভুলেও কোনও গোলমাল করতে যেয়ো না, করলে ফিরে পাওয়া জীবনটা এক পলকে খুইয়ে বসবে। পালাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না। তোমার সার্ভিস কিনছি আমি, প্রতিটি আউন্স কাজে লাগাতে চাইব। তুমি রাজি? তোমার পোষাবে?'

শুকনো গলায় রানা বলল, 'জীবনে আমি একটা স্বপ্নই কেবল দেখেছি। কোটিপতি হব।'

এই মুহূর্তে রানার দিকে তাকিয়ে নেই গালিব, নিজের নখ দেখছে সে। তারপর চোখ তুলে কঠিন দৃষ্টিতে একবার দেখল ওকে, ঘুরে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল আসান দরজাটা।

বসে থাকল রানা, বন্ধ দরজার উপর চোখ। দ্রুত হাত চালাল মাথার চুলে। 'বেশ, বেশ!' খালি কামরার ভিতর স্বগতোক্তি করল, বিছানা ছেড়ে পায়চারি করছে। তারপর বাথরুমে ঢুকে নক করল শাকিলার বেডরুমে।

'কে?'

'আমি। তুমি অপ্রস্তুত অবস্থায় নেই তো?'

'না,' কণ্ঠস্বরে কোনও উৎসাহ নেই। 'এসো।'

বিছানার কিনারায় বসে পায়ে জুতো গলাচ্ছে শাকিলা। প্রথমবার তাকে যে ড্রেসে দেখেছিল, এখনও তাই পরে আছে সে: রঙচটা জিনস, নীল শার্ট। ঠাণ্ডা, ধীর ও কঠিন লাগছে মেয়েটিকে। পরিস্থিতিটা তাকে মোটেও বিচলিত করতে পারেনি। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। চোখ দুটো নির্লিপ্ত। 'আমাদের এই অবস্থার জন্যে তুমি দায়ী। এখন তোমাকেই এর একটা বিহিত করতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে কামরাটা প্রথমে সার্চ করে দেখে নিল রানা। না, লুকানো কোনও লেন্স নেই, মাইক্রোফোনও পাওয়া গেল না। তারপর হাসিমুখে বলল, 'তা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব। কবর থেকে নিজেদেরকে এই বান্দাই তো বের করে আনল।'

'ওখানে আমাদেরকে ফেলেওছিলে তুমি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। খালি পেটে তার সঙ্গে কথা বলাটা ঠিক হচ্ছে না। বলল, 'ঝগড়া করে লাভ নেই। পরস্পরকে আমরা পছন্দ করি বা না করি, দুজনকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। সোয়া বারোটা বাজে। ব্রেকফাস্ট খাবে, নাকি লাঞ্চ? অর্ডার দিলেই চলে আসবে। আমার বেলায় এসেছে আর কী।'

'আমরা কোথায়?' জানতে চাইল শাকিলা।

'নিউ ইয়র্কে। পালাবার কথা চিন্তা করো না। একটি মাত্র দরজা, কোরিয়ান গরিলা হুনমিন আসান সেটা পাহারা দিচ্ছে।'

একটু নরম হলো শাকিলা। 'ব্রেকফাস্ট। ডিম পোচ, চিনি ও মাখন লাগানো পাউরুটি, কফি। ধন্যবাদ।'

নিজের কামরায় ফিরে এসে দরজায় নক করল রানা। ইঞ্চিখানেক খুলল সেটা।

'ভয় পেয়ো না, আসান। আমি এত তাড়াতাড়ি তোমাকে খুন করতে চাইছি না।'

দরজার কবাট আরও ফাঁক হলো। কোরিয়ান শোফারের চোখ-

মুখ থমথম করছে। কী কী লাগবে হুকুমের সুরে তাকে জানাল রানা। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

নিজের জন্য গ্লাসে সামান্য হুইস্কি ঢেলে বিছানার কিনারায় বসল রানা। ভাবছে মেয়েটিকে কীভাবে নিজের দলে আনা যায়। শুরু থেকেই ওর মধ্যে একটা বৈরী ভাব লক্ষ করছে সে।

শাকিলার কামরায় ফিরে এল রানা। দুটো দরজাই খোলা রাখল ও, যাতে আওয়াজ হলে শুনতে পায়। এখনও বিছানায় বসে রয়েছে শাকিলা, যেন অটল একটা মূর্তি। রানার দিকে সতর্ক চোখে তাকাল সে।

দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে রানা, হাত দুটো বুকে বেঁধে। 'তোমার জানা দরকার যে আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আসছি,' বলল ও। ওর ধারণা, বিসিআই কিংবা বিএসএস বললে মেয়েটি হয়তো কিছুই বুঝবে না। 'আমরা সৌবর্ণ গালিবের পেছনে লেগেছি। কিন্তু এ-সব গ্রাহ্য করছে না সে। তার ধারণা, অন্তত এক হপ্তা কেউ আমাদেরকে খুঁজে পাবে না...'

এরপর ধীরে ধীরে গালিবের ফোর্ট নক্স লুঠ করার প্রস্তাবটা ব্যাখ্যা করল রানা।

সব শোনার পর কঠিন চোখে রানার দিকে তাকাল শাকিলা। 'কী করবে বলে ভাবছ তুমি?'

'ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলব, আমরা দুজনেই,' জবাব দিল রানা। 'মূল উদ্দেশ্য থাকবে সোনা উদ্ধার ও নিজেদের প্রাণ বাঁচানো।'

'কীভাবে সেটা সম্ভব?'

'এই মুহূর্তে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। তবে উপায় একটা বেরিয়েই আসবে।'

'হুম। ঠিক আছে, বুঝলাম। আছি তোমার সঙ্গে। কিন্তু ভুলেও আমাকে ছুঁতে চেষ্টা করো না, স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

রানার বেডরুমের দরজা থেকে ক্লিক করে একটা আওয়াজ

ভেসে এল। নরম দৃষ্টিতে শাকিলার দিকে তাকাল ও, হাসল। 'আকর্ষণীয় চ্যালেঞ্জ। তবে ওটা আমি গ্রহণ করছি না। কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমিও, যত ইচ্ছেই হোক, খবরদার, আমাকে ছোঁয়ার চেষ্টা কোরো না!' মেয়েটাকে খেপিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে নিজের কামরায় ফিরে গেল রানা।

একজন কোরিয়ান পাশ কাটাল ওকে, হাতে ব্রেকফাস্টের ট্রে। আরও দুজন কোরিয়ান কামরার একধারে চাকা লাগানো টেবিল-চেয়ারসহ একটা কমপিউটার ও প্রিন্টার নিয়ে এসে সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে কানেকশন দিচ্ছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মুশকিল আসান। একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরল সে। এগিয়ে এসে সেটা নিল রানা।

কাগজের মাথায় স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছে: 'এই এজেন্ডার দশটা কপি তৈরি করতে হবে।'

তারপর লেখা হয়েছে:

মিটিং-এর আহ্বায়ক মিস্টার সৌবর্ণ গালিব
মিটিং-এ সভাপতিত্ব করবেন সৌবর্ণ গালিব
সেক্রেটারি: এম. রানা। শাকিলা সিকান্দার
অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ:
হেনেরিক পি. হয়েনডার: ওয়াইল্ড গ্যাঙ/ডেট্রয়েট
ম্যাক বোলান: ব্ল্যাকহোল সিন্ডিকেট/মায়ামি ও হাভানা
ক্লিফ মরটন: রেড শ্যাডো/ শিকাগো
জ্যাক হোপ: কুইক মব/ লাস ভেগাস
মিস্টার অ্যালোন: বুলডোজার।
জেনিফার টোপাজ: অ্যাসিড টেস্ট। হারলেম/নিউ ইয়র্ক সিটি

এজেন্ডা

একটি প্রজেক্ট, সাংকেতিক নাম: অপারেশন গোল্ড
[আপ্যায়ন]

সবশেষে লেখা: শাকিলা ও তোমাকে আনতে দুটো বিশ মিনিটে লোক যাবে। নোট নেয়ার জন্যে দুজনেই তৈরি থেকো। ফরমাল ড্রেস, প্লিজ।

মৃদু হাসল রানা। কোরিয়ানরা কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কমপিউটারের সামনে বসে টাইপ শুরু করল ও। অন্তত শাকিলাকে দেখানোর একটা সুযোগ পাওয়া গেল যে ও নিজের ভূমিকায় অভিনয় শুরু করেছে। খোদা, কেমন সব অতিথি! মাফিয়া পর্যন্ত চলে এসেছে। গালিব এদেরকে আসতে রাজি করাল কীভাবে? আর এই জেনিফার টোপাজটা কে?

টাইপ শেষ করে প্রিন্ট করল রানা। এরপর পাশের কামরায় এসে তালিকাটা পড়তে দিল শাকিলাকে, বলল, 'নামগুলো মাথায় রেখো। আমি যাই, ফরমাল ড্রেস পরি।' চোখে চোখ রেখে হাসল। 'বিশ মিনিট বাকি আছে।'

মাথা ঝাঁকাল শাকিলা।

হুনমিন আসানের পিছু নিয়ে করিডর ধরে হাঁটছে রানা। নদীর আওয়াজ পাচ্ছে ও, ওয়্যারহাউসের নীচে পিলারের গায়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। ফেরি চলাচল করছে, দূর থেকে ভেসে আসছে ডিজেলের আওয়াজ। আশপাশে কোথাও একটা ট্রাক স্টার্ট নিল।

করিডরের দেয়ালে হালকা নীল রঙটা নতুন। দু'পাশে কোনও দরজা নেই। আলো আসছে সিলিঙের আড়াল থেকে। শেষ মাথায় পৌঁছাল ওরা। নক করল আসান। প্রথমে ইয়েল লক খোলার শব্দ হলো, তারপর দুটো বোল্ট সরাবার। চৌকাঠ টপকে রোদ ঝলমলে বড়সড় কামরায় ঢুকল ওরা।

কামরাটা ওয়্যারহাউসের শেষ প্রান্তে। একদিকের পুরো দেয়ালটাই জানালা, বাইরে নদী ও শহর; শহরটা বেশ খানিক দূরে। মিটিং-এর উপযোগী করে সাজানো হয়েছে ঘরটাকে। জানালার দিকে পিছন ফিরে বৃত্তাকার একটা টেবিলে বসে রয়েছে

সৌবর্ণ গালিব। হালকা অ্যাশ কালারের সুট পরেছে সে।

টেবিলের সামনে আটটা দামি লেদার মোড়া আর্মচেয়ার ফেলা হয়েছে। দুটো চেয়ারের সামনে লেখার জন্য নোটবুক ও পেনসিল। ছয়টা চেয়ারের সামনে, ডেস্কের উপর চারকোনা সাদা একটা করে পার্সেল; সোনালি গালা দিয়ে সিল করা।

ডান দিকে, দেয়াল ঘেঁষে ফেলা হয়েছে লম্বা বুফে টেবিল। তাতে সিলভার ও কাট গ্লাস ঝলমল করছে। শ্যাম্পেনের বোতল খাড়া করে রাখা রয়েছে সিলভার কুলার-এ। এক সারিতে রাখা আরও অনেকগুলো সরু-মোটা-বেঁটে-লম্বা নানান জাতের মদের বোতল। নানা রকম সুস্বাদু খাবারের মধ্যে রানার চোখে পড়ল কেভিয়ার ভর্তি পাঁচ পাউন্ডের দুটো টিনের কৌটা।

বুফে টেবিলের উল্টোদিকে একটা ব্ল্যাকবোর্ড দেখা যাচ্ছে, পাশের টেবিলে কাগজ ও একটা চৌকো কার্টন।

লাল কার্পেটের উপর দিয়ে ওদেরকে হেঁটে আসতে দেখছে গালিব। ইঙ্গিতে নিজের বাম পাশের চেয়ারটা শাকিলাকে, ডান পাশেরটা রানাকে দেখাল। বসল ওরা।

'এজেন্ডা?' কপিগুলো নিল গালিব, উপরেরটা পড়ে দেখে ফেরত দিল শাকিলাকে। হাত তুলে শূন্যে একটা বৃত্ত আঁকল সে। চেয়ার ছেড়ে টেবিলের চারদিকে, প্রতিটি চেয়ারের সামনে একটা করে রেখে এল শাকিলা।

টেবিলের নীচে হাত গলিয়ে লুকানো একটা বোতামে চাপ দিল গালিব। কামরার পিছন দিকের একটা দরজা খুলে গেল। একজন কোরিয়ান ভিতরে ঢুকল, কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকল নির্দেশের অপেক্ষায়।

'সব রেডি?' প্রশ্ন করল গালিব।

লোকটা মাথা ঝাঁকাল।

'মনে আছে তো, তোমার তালিকায় যাদের নাম আছে শুধু তারাই এই কামরায় ঢুকতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল গালিব।

আবার মাথা ঝাঁকাল লোকটা। ‘গুড। ওদের কেউ কেউ, কিংবা হয়তো সবাই, এক বা একাধিক সঙ্গী নিয়ে আসবে। তাদেরকে বসাতে হবে অ্যান্টিরুমে। খেয়াল রেখো যা চায়, তাই যেন পায় তারা। তাস আর ডাইস রাখা হয়েছে ওখানে? গুড। আসান?’ আসান দাঁড়িয়ে আছে রানার চেয়ারের পিছনে। মালিকের ডাক শুনে শিরদাঁড়া খাড়া করল সে। ‘যাও, তুমি তোমার পজিশনে গিয়ে দাঁড়াও। সংকেতটা যেন কী?’

দুটো আঙুল খাড়া করল আসান।

‘হ্যাঁ। দু’বার বেল বাজবে। যাও তুমি। খেয়াল রাখবে স্টাফ সবাই যেন যে-যার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করে।’

রানা শান্তকণ্ঠে জানতে চাইল, ‘তোমার লোক এখানে কত?’

‘বিশজন। কোরিয়ান দশ, জার্মান দশ। বাছাই করা লোক, সবাই দক্ষ।’ হাত দুটো টেবিলের উপর লম্বা করে শুইয়ে রাখল গালিব। ‘এবার, তোমাদের কার কী কাজ বুঝিয়ে দিই। মিস শাকিলা, মিটিঙে গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিকাল যে-সব পয়েন্ট উঠবে, সেগুলো নোট করবে তুমি। বিশেষ করে এমন সব পয়েন্ট, যেগুলোয় আমার অ্যাকশন নেয়ার দরকার হতে পারে। তর্ক, কৌতুক ইত্যাদি লিখতে যেয়ো না। ঠিক আছে?’

শাকিলাকে সতর্ক ও মনোযোগী হতে দেখে খুশি হলো রানা। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি, বলল, ‘ইয়েস, ওকে।’

‘রানা,’ বলল গালিব। ‘অতিথিদের সবাইকে আমি চিনি। আমার কথা শুনে তাদের কী প্রতিক্রিয়া হয়, চেহারা দেখেই বুঝতে পারব আমি। তবে এ-ধরনের ব্যাপারে ভুল হবার কিছু আশঙ্কা থেকেই যায়। আমি চাই বক্তাদের কার মনে কী চলছে এটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করবে, এবং নামের পাশে তা লিখে রাখবে। কার সম্পর্কে কী ভাবছ তুমি, এটা জানা আমার জন্যে জরুরি। এদের মধ্যে দু’একজন হয়তো পিছু হটবে, ভয়ে হোক কিংবা অন্য কোনও কারণে, আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইবে না। তবে আমার প্রস্তাবটা

এত মজার, কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সত্যি আমি খুব অবাক হব।'

'কেউ যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে না চায়, তার কী হবে?'

'তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আমাদের সমস্ত গোপন তথ্য জানার পর বলবে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, এ তো হয় না।' একটু থেমে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল গালিব। 'একটা কথা ভুলো না, রানা। ওদের মধ্যে যদি একজনও বেঈমান থাকে, হয় আমরা মারা যাব, নয়তো সারাজীবন জেলে পচব।'

'হারলেমের এই জেনিফার টোপাজটা কে?' জানতে চাইল রানা।

'মেয়ে মস্তান। কিছু মেয়ে আমার দরকার হবে এই অপারেশনে, তাই ওকেও ডেকেছি। আগে সার্কাস পার্টি ছিল টোপাজের, সুবিধে করতে না পেরে শুধু মেয়েদের নিয়ে একটা মস্তান বাহিনী গড়ে তুলেছে। সিঁধেল চুরি, গুণ্ডামি, স্ট্রিট ফাইট, বোমাবাজি– সব করে। ওরা সত্যিই টাফ, দলের নাম অ্যাসিড টেস্ট।'

মৃদু শব্দে একটা বেল বেজে উঠল। কামরার শেষ প্রান্তের দরজা খুলে গেল। চটপটে ভঙ্গিতে পাঁচজন লোক ঢুকল ভিতরে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল গালিব। প্রত্যেকে এরা মার্কিন অপরাধ জগতের এক একজন দিকপাল।

একে একে সবাই করমর্দন করল গালিবের সঙ্গে। কথা ও হাবভাব দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা কী এক অজ্ঞাত কারণে সৌবর্ণ গালিবকে সেরা পাঁচ মাফিয়া পরিবারের কর্তারা রীতিমত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। ও ভাবল, ব্যাপারটা লোক দেখানোও হতে পারে। তবে সেটারও তাৎপর্য কম নয়।

সবাই আসন গ্রহণ করার পর গালিব বলল, 'বন্ধুরা, তোমাদের প্রত্যেকের সামনে একটা করে পার্সেল দেখতে পাচ্ছ। প্রতিটিতে সোনার বার আছে, দাম এক লাখ ডলার। তোমরা আমার আহ্বানে

সাড়া দিয়ে এখানে এসেছ, ওটা তার পুরস্কার। মিস টোপাজ যতক্ষণ না পৌঁছাচ্ছে, আমার সেক্রেটারির সঙ্গে তোমাদের পরিচয়টা সেরে ফেলি।'

পিছনের দরজা খুলে গেল আবার। কালো সুট পরা এক স্মার্ট তরুণী ঢুকল ভিতরে। লম্বা-চওড়া কাঠামো, পুরুষালি চেহারা।

'হাই এভরিবডি! হাই গালিব!' বলে খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল সে।

রানা ও শাকিলার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর জেনিফার টোপাজকে সাদা পার্সেলটার কথা বলল গালিব।

'শুধু এখানে আসার জন্যে এক লাখ ডলার?' হেসে উঠে পার্সেলটা খুলতে শুরু করল টোপাজ। 'তা হলে যে দাঁওটা নিয়ে আলোচনা করতে ডেকেছ সেটা কত টাকার?'

'ধীরে, টোপাজ, ধীরে!' গালিবকে গম্ভীর দেখাল। 'টাকার অঙ্কটা হঠাৎ শুনলে তুমি হার্টফেল করতে পার।'

'ওমা, কী সুন্দর!' পার্সেল থেকে বেরিয়ে আসা সোনার হলুদ বারগুলোয় আলো লাগায় চকচক করছে।

গালিবের সামনে বসেছে শিকাগোর মাফিয়া বস্ ক্লিফ মরটন, তার দলের নাম রেড শ্যাডো। এমনই তার বিদঘুটে চেহারা, ঠিক যেন একটা লালমুখো বাঁদর। তার কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। 'কথাটা আরেকবার বলো, মিস্টার গালিব। টাকার অঙ্কটা শুনলে একা টোপাজের হার্টঅ্যাটাক করবে, নাকি আমাদেরও?'

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে গালিব বলল, 'তোমাদেরও।'

কামরার ভিতর হঠাৎ করে পিন-পতন নীরবতা নেমে এল। সেই নীরবতা ভাঙল ব্ল্যাকহোল সিন্ডিকেটের ম্যাক বোলান। 'জানি এটা স্রেফ একটা কথার কথা। তবু, বোঝা যাচ্ছে, আমরা খুব বড় কোনও অপারেশন নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। কত, মিস্টার গালিব? কত টাকার অপারেশন? এক বিলিয়ন ডলার?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল গালিব।

'আরও বেশি? দুই বিলিয়ন?' গালিব তারপরও মাথা নেড়ে যাচ্ছে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল সবার।

'তিন? চার? পাঁচ?... ওহ্, গড!' বলে শক-এ নেতিয়ে পড়ার ভঙ্গি করল বোলান।

'পঞ্চাশ বিলিয়ন?' ওয়াইল্ড গ্যাঙ-এর বস হয়েনডার চিৎকার করে জানতে চাইল। 'একশো বিলিয়ন?'

স্থির হয়ে আছে গালিব। সবার উপর চোখ বুলাল একবার। তারপর বলল, অঙ্কটা পনেরো।'

'পনেরো?' সমস্বরে উচ্চারণ করল ছয় মাফিয়া বস্। 'মানে?'

'পনেরোশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার,' থেমে থেমে বলল গালিব।

চোদ্দ

ট্রেনের কাঁপা কাঁপা হুইসেলের মত আওয়াজ ভেসে আসছে; নদীর কোথাও থেকে একটা টাগবোট ডাকল, আরেকটা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল। একটা ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

লাস ভেগাসের গডফাদার জ্যাক হোপ, কুইক মব-এর বস্, কামরার নীরবতা ভাঙল। 'ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করছি না। তবু সবটুকু শুনতে চাই। এর মধ্যে আমি কত পাব?'

'যদি বলি যত খুশি পাবে, খুব একটা ভুল বলা হবে না,' বলল গালিব। 'এই ধরো মাথা পিছু একশো বিলিয়ন করে পাবে তোমরা। বাকিটা আমার।'

হেনেরিক হয়েনডার কীভাবে যেন বিষম খেয়ে কাশতে শুরু

করল। 'বিশ্বাস আমিও করছি না,' নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে বলল সে।

'না, টোটালি ইমপসিবল একটা ব্যাপার,' সায় দিল সিসিলিয়ান মিস্টার অ্যালোন, তার দলের নাম বুলডোজার।

হঠাৎ গমগম করে উঠল গালিবের কণ্ঠস্বর। 'তোমরা আমাকে অপমান করছ। তোমাদের লজ্জা করছে না, মুখের ওপর বলে ফেলছ: বিশ্বাস করি না?' একটু বিরতি নিল সে, দেখল সবাই থতমত খেয়ে গেছে। 'অতীতে আমি কি অবিশ্বাস করার মত কিছু করেছি? তোমরা যখন ড্রাগ পরিবহনের সমস্যায় পড়েছিলে, আমি আমার এয়ার লাইন্সের প্লেন দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করিনি? সেজন্যে আমি কি অতিরিক্ত টাকা চেয়েছিলাম? তোমাদের টাকা আমি হোয়াইট করতে সাহায্য করিনি? কেউ বলতে পারবে, আমি কোনও ফি নিয়েছি সেজন্যে? বিয়ে করিনি, কাজেই আমার ছেলেমেয়েও নেই, কোনদিন হবেও না। অথচ তোমাদের প্রত্যেকের ছেলেমেয়ের বিয়েতে উপহার হিসেবে লাখ ডলার পাঠিয়েছি, কিছু পাবার প্রত্যাশা না করেই। এরকম একজন মানুষকে তোমরা মুখের ওপর বলে দিচ্ছ, বিশ্বাস করতে পারছ না? আলোচনা কি তা হলে বন্ধ করতে বলো?'

রানা ভাবল, এটা বোধহয় চলতি বছরের সবচেয়ে বড় ধাঁধা: ওরা ভাবছে, এক চোর এত টাকা দান করে কীভাবে?

মিটিঙের পরিবেশ বদলে গেল।

ম্যাক বোলান বলল, 'সত্যি আমরা দুঃখিত, মিস্টার গালিব। তবে এ-কথা ঠিক যে টাকার অঙ্কটা আমরা কেউ হজম করতে পারছি না। যাই হোক, আমার জানামতে যুক্তরাষ্ট্রের তিনটে জায়গায় এই পরিমাণ নগদ টাকা কিংবা সোনার বার থাকতে পারে: ওয়াশিংটনের ফেডারেল মিন্ট-এ, নিউ ইয়র্ক সিটির ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এ, আর কেন্টাকির ফোর্ট নক্স-এ। এগুলোর একটার কথা নিশ্চয়ই বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'কোনটা?'

'এই পর্যায়ে তোমাদের সবাইকে জানানো দরকার, এখনই বিদায় নেয়ার উপযুক্ত সময়। যে বা যারা এই অপারেশনে থাকতে না চাও, এখনই আমার দেয়া উপহার সহ বেরিয়ে যেতে পার; কেউ কোনও প্রশ্ন তুলবে না।'

নড়ার লক্ষণ দেখা গেল না কারও মধ্যে। মাথা ঝাঁকাল গালিব মৃদু হেসে। আগের প্রশ্নটাই আবার জিজ্ঞেস করল ম্যাক বোলান, 'কোনটা?'

'শেষেরটা।'

সবাই যেন একযোগে গুঙিয়ে ওঠার সুরে কথা বলে উঠল:

'ওহ্, নো!'

'হোয়াট!'

'দ্যাট'স ইমপসি...'

'নো, নেভার!'

জবাবে মৃদুকণ্ঠে হাসল সৌবর্ণ গালিব, তারপর বলল, 'জেন্টেলমেন অ্যান্ড লেডি, তোমাদের এই প্রতিক্রিয়া অপ্রত্যাশিত নয়। ব্যাপারটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও, প্লিজ। ফোর্ট নক্স কী? একটা ব্যাঙ্ক। তবে অন্য যে-কোন ব্যাঙ্কের চেয়ে অনেক বড় এটা, আর এটার সিকিউরিটির আয়োজন ভয়ানক শক্তিশালী। সেই আয়োজনকে টপকে ভেতরে ঢুকতে হলে অনেক শক্তিকে এক করতে হবে, দরকার হবে দুর্লভ মেধার।

'ফোর্ট নক্স পাহারা দিচ্ছে কয়েকটা মিলিটারি ইউনিট: থার্ড আর্মার্ড ডিভিশন, সিক্সথ আর্মার্ড ক্যাভলরি রেজিমেন্ট, ফিফটিনথ্ আর্মার্ড গ্রুপ, ওয়ান সিক্সটিয়েথ ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ সহ আরও অন্তত ছয়টা ইউনিটের প্রায় আধা ডিভিশন আর্মি। আরও আছে পুলিশ ফোর্স: বিশজন অফিসার, চারশো কনস্টেবল। সব মিলিয়ে সিকিউরিটির লোক হবে কমবেশি ষাট হাজার। তার মধ্যে বিশ

হাজারের মত কোনও না কোনও ধরনের কমব্যাট ট্রুপস।'

'আর আমরা বুঝি তাদেরকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেব?' খেঁকিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রেড শ্যাডো-র চিফ ক্লিফ মরটন। কথাটা শুনে বাকি সবাই হেসে উঠল।

চেয়ার ছেড়ে উঠল গালিব, যেন কিছুই পৌঁছায়নি তার কানে, লম্বা পা ফেলে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটা সুতো ধরে টান দিল সে, মঞ্চে পরদা নেমে আসার মত ব্ল্যাকবোর্ডের মাথার দিক থেকে নামল একটা ম্যাপ। ফোর্ট নক্সের ডিটেইলড টাউন ম্যাপ এটা; গডম্যান আর্মি এয়ারফিল্ড, রেল ও সড়কপথ সহ। পয়েন্টার দিয়ে বুলিয়ান ডিপজিটারি দেখাল গালিব। বাঁ দিকের কোণে ওটা ডিক্সি হাইওয়ে, বুলিয়ান বুলেভার্ড ও ভাইন গ্রোভ রোড যে ত্রিভুজটা তৈরি করেছে তার কাছাকাছি।

ম্যাপের দিকে চোখ রেখে গালিব বলল, 'এখানে আমরা শহরটা দেখতে পাচ্ছি। এই লম্বা কালো রেখাটা রেলপথ, উত্তর দক্ষিণে পঁয়ত্রিশ মাইল লম্বা। ব্রানডেনবার্গ স্টেশনটা শহরের মাঝখানে, তবে ওটার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে বুলিয়ান ভল্ট-এর লাগোয়া এই সাইডিং কমপ্লেক্স-এর সঙ্গে। ওয়াশিংটনের মিন্ট থেকে আসা বুলিয়ান, সোনার বার, ওখানে লোডিং-আনলোডিং করা হয়।

'আরও ট্র্যান্সপোর্ট মেথড আছে, তবে সিকিউরিটির কারণে নির্দিষ্ট কোনও ছক ধরে সেগুলো অপারেট করা হয় না। ডিক্সি হাইওয়ে ধরে ট্রাক কনভয় আসে। গডম্যান এয়ারফিল্ডে নামে ফ্রেইট প্লেন। একটু ভাল করে তাকাও সবাই; এ-সব রুট থেকে দূরে, নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ভল্টটা পঞ্চাশ একর ঘাসজমির মাঝখানে, কোনও ধরনের প্রাকৃতিক আড়াল ছাড়াই। মাত্র একটা রোড ভল্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে, পঞ্চাশ ফুটী একটা ড্রাইভওয়ে। বুলিয়ান বুলেভার্ড গেট দিয়ে ঢুকেছে ওটা, গেটে হেভি গার্ড। আর্মার্ড স্টকেইড-এর ভেতরে ঢোকার পর সার্কুলার রোড ধরে

এগোয় ট্রাক বহর। ভল্টকে চক্কর দিয়ে ওই রোড পেছনের প্রবেশপথে পৌঁছেছে। ওখানেই বুলিয়ান আনলোড করা হয়।

'সার্কুলার রোড ইস্পাতের প্লেট দিয়ে তৈরি। প্লেটগুলোয় কবজা আছে, ইমার্জেন্সির সময় ইস্পাতের পুরোটা সারফেস হাইড্রলিকালি রাস্তা থেকে ওপরে তুলে ফেলা যায়, ইস্পাতের আরেকটা ইন্টারনাল স্টকেইড উন্মোচিত করার জন্যে। সহজে চোখে পড়ে না, তবে আমার জানা আছে, বুলিয়ান বুলেভার্ড ও ভাইন গ্রোভ রোডের মাঝখানে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ডেলিভারি টানেল আছে। ভল্টে পৌঁছানোর অতিরিক্ত একটা উপায় এটা, টানেলের দেয়ালে বসানো ইস্পাতের দরজা পার হয়ে ডিপজিটারির প্রথম সাব-গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাওয়া যায়।'

থামল গালিব। ম্যাপের কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়াল। 'ভল্টটা দেখছ সবাই। পৌঁছাবার পথগুলোও দেখলে। আরও 'পথ আছে: রিসেপশন হল ও অফিস হয়ে। কোনও প্রশ্ন?'

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না। গালিবের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। তার কথায় নিশ্চয়ই এমন কিছু পেয়েছে তারা, এ বিষয়ে তার জ্ঞান মেনে নিতে বাধছে না কারও। সন্দেহ নেই ফোর্ট নক্স সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য জানে এই লোক।

ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ফিরে প্রথমটার উপর আরেকটা ম্যাপ নামাল গালিব। এটা গোল্ড ভল্ট-এর বিশদ নকশা। 'দেখতেই পাচ্ছ,' বলল সে, 'অত্যন্ত নিরেট দু'তলা একটা দালান, দুই স্তরে তৈরি চৌকো একটা কেকের মত। বোমার বিরুদ্ধে প্রোটেকশন দেয়ার জন্যে ছাদে ধাপ তৈরি করা হয়েছে। ওটার চার কোণে চারটে পিলবক্স দেখতে পাচ্ছ। এগুলো ইস্পাতের তৈরি, দালানটার ভেতরকার কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত। ভল্টের বাইরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ: একশো একুশ ফুট ও একশো পাঁচ ফুট। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে বিয়াল্লিশ ফুট উঁচু। তৈরি করা হয়েছে টেনিসি গ্র্যানিট দিয়ে, কিনারাগুলো ইস্পাত দিয়ে মোড়া। উপকরণের পরিমাপ: ষোলো

হাজার কিউবিক ফুট গ্র্যানিট, চার হাজার কিউবিক গজ কংক্রিট, সাড়ে সাতশো টন রি-ইনফোর্সিং স্টিল, সাতশো ষাট টন স্ট্রাকচারাল স্টিল। ঠিক? এবার দালানের ভেতর নজর দেয়া যাক। ইস্পাত ও কংক্রিটের দুইতলা ভল্ট, কয়েকটা কমপার্টমেন্টে ভাগ করা। ভল্টের দরজার ওজন বিশ টনেরও বেশি। ভল্টের কেসিং স্টিল প্লেট দিয়ে তৈরি। ভল্টের ছাদও একইভাবে তৈরি, দালানের ছাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। দুই লেভেলেই ভল্টকে ঘিরে আছে একটা করিডর। এই করিডর ধরে ভল্টে যেমন যাওয়া যায়, তেমনি দালানের বাইরের দেয়াল সংলগ্ন অফিস ও স্টোররুমেও যাওয়া যায়। ভল্ট ডোরের কমবিনেশন একা কোনও লোককে দেয়া হয় না। ডিপজিটারি স্টাফ-এর কয়েকজন সিনিয়র অফিসার আলাদা ভাবে ডায়াল ঘোরাবেন, শুধু নিজের জানা কমবিনেশন নাম্বার অনুসারে।

'এবার ভল্টের ভেতরে ঢুকি। আগেই বলেছি পনেরশো বিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনার বার আছে ওখানে। সোনার মান: ওয়ান থাউজেন্ড ফাইন। প্রতিটি বার-এর ওজন সাড়ে সাতাশ পাউন্ড। এগুলো কোন মোড়ক ছাড়াই রাখা আছে ভল্টের কমপার্টমেন্টে। আমার তথ্য সরবরাহ পর্ব এখানেই শেষ হলো। এই পর্যায়ে কারও কোনও প্রশ্ন না থাকলে আমি এখন ব্যাখ্যা করতে পারি ডিপজিটারি পেনিট্রেট করে কীভাবে ওই সোনা দখল করা যায়।'

প্রথমে নীরব হয়ে থাকল কামরাটা। তারপর নড়েচড়ে বসে একজন একটা প্রশ্ন করল, সে থামতে আরেকজন। কেউ একজন জানতে চাইল এই প্রজেক্টের গোপনীয়তা সম্পর্কে কী ভাবা হয়েছে।

প্রত্যেকের কথাই মন দিয়ে শুনছে রানা, হাবভাবও লক্ষ করছে।

জবাব দেওয়ার পালা শেষ করল গালিব, তারপর সবাইকে

দিয়ে শপথ করাল এই প্রজেক্টের সমস্ত তথ্য গোপন রাখা হবে। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসল সে। 'প্রথম প্রশ্ন, কত সোনা নেব আমরা। এটার জবাব পেতে হলে আগে জানতে হবে দখল করা সোনা কীভাবে আমরা সরাব। ব্যাপারটাকে সহজে বোঝার জন্যে হিসেবটা আমরা এভাবে করতে পারি। ধরা যাক, দশ হাজার টন সোনা সরাব আমরা। এই পরিমাণ সোনা পরিবহনের জন্য দশ টনী ট্রাক লাগবে এক হাজারটা, কিংবা দুশো ষাটটা হেভি ইনডাস্ট্রি রোড ট্র্যান্সপোর্টার। দ্বিতীয়টাই সুপারিশ করব আমি। এগুলো ভাড়া করার জন্যে কয়েকটা ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। এই প্রজেক্টে যারা অংশ নেবে তাদেরকে নিজ উদ্যোগে এটা করতে হবে। ভাল কথা, ড্রাইভার ও হেলপার হতে হবে নিজেদের লোক।

'এরপর ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের সমস্যা। কতগুলো রাস্তা পাওয়া যাবে, কে কোন্‌টা ব্যবহার করবে, এ-সব নিয়ে ডিটেলস প্ল্যান দরকার। কনভয় ভর্তি সোনা কে কোথায় নিয়ে যাবে, সেটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার কথা যদি জানতে চাও, আমি হয়তো রেলপথ ব্যবহার করব। আমার সোনা পরিমাণে বেশি, তাই।

'তুলনায় বাকি সমস্যাগুলো কিন্তু সহজ। যেমন আমার প্রস্তাব হলো, সোনালি দিনটিতে ফোর্ট নক্স শহরের সমস্ত বাসিন্দাকে সাময়িক ভাবে অচল করে দেয়া। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও আয়োজন আগেই করে রাখা হবে, বাকি থাকবে শুধু আমার কাছ থেকে সংকেত পাওয়া। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এরকম: শহরটার খাবার ও অন্যান্য কাজের পানি সরবরাহ করা হয় দুটো ট্যাঙ্ক ও দুটো ফিল্টার প্ল্যান্ট থেকে, দৈনিক কমবেশি সাত মিলিয়ন গ্যালন। ওগুলো পোস্ট ইঞ্জিনিয়ার-এর নিয়ন্ত্রণে। এই ভদ্রলোক টোকিও মিউনিসিপাল ওয়াটারওঅর্কস্‌-এর একটা টিমকে অতিথি হিসেবে পেয়ে খুব খুশি। জাপানি টিম ফোর্ট নক্সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে

এসেছে, ফিরে গিয়ে যাতে টোকিওতে এ-ধরনের বড় প্ল্যান্ট তৈরি করতে পারে। বলাই বাহুল্য যে জাপানি টিমের সদস্যরা আমার লোক। তাদের কাছে যুদ্ধে ব্যবহার যোগ্য জমাট বাঁধানো কেমিকেল থাকবে। মাত্র কয়েকটা ক্যাপসুল। যে পরিমাণ পানির কথা বলা হয়েছে তার জন্য গোটা চারেক ক্যাপসুলই যথেষ্ট। পানির সংস্পর্শে আসার পর দ্রুত গলে যায় ওগুলো, বিশ মিনিটের মধ্যে সবটুকু পানি দূষিত হয়ে পড়বে। এরপর আধ গ্লাস পানি কারও পেটে গেলেই হবে, ঘুমের কোলে ঢলে পড়বে সে। সেই ঘুম ভাঙবে তিনদিন পর। এরকম গরমের দিনে আধ গ্লাস পানি না খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে কেউ, এ আমি বিশ্বাস করি না। আমরা ধরে নিতে পারি, শহরের প্রতিটি মানুষকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় পাব আমরা।'

'কিন্তু শহরে আমরা ঢুকছি কীভাবে, গালিব?' এতক্ষণ বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়েছিল জেনিফার টোপাজ। প্রশ্নটা করার পর বিস্ফারিত চোখে অপেক্ষায় থাকল।

'শহরে ঢুকব আমরা স্পেশাল একটা ট্রেনে চড়ে,' বলল গালিব। সোনালি রাতে নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে রওনা হবে ওটা। ওটায় প্রায় পাঁচশো লোক থাকব আমরা। পোশাকে ও কাগজ-পত্রে আমরা হব রেড ক্রস-এর ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক। আমার বিশ্বাস, টোপাজ, তুমি একশোর মত নার্স সাপ্লাই দিতে পারবে।'

'ওহ্, নিশ্চয়ই!' দ্রুত একটা ঢোক গিলে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো অ্যাসিড টেস্ট-এর চেয়ারপারসন। 'এটা আমার জন্যে কোনও ব্যাপারই নয়।'

'লুইভিল স্টেশনে, ফোর্ট নক্স থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে, আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়ে ট্রেনের ইঞ্জিনরুমে উঠব আমি। আমাদের, অর্থাৎ ডাক্তারদের সঙ্গে জটিল ইন্সট্রুমেন্ট থাকবে। বলব, ফোর্ট নক্সে পৌঁছাবার আগে থেকেই বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করাটা জরুরি। ইতিমধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে যে শহরের সমস্ত

লোকজন কী এক রহস্যময় রোগে আক্রান্ত হয়ে যে যেখানে ছিল সেখানেই ঢলে পড়েছে। স্বভাবতই আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়াবে। তারপর গোটা দেশে।

'আমরা ভোরে পৌঁছাব। ফোর্ট নক্সে মারাত্মক কোনও বিপর্যয় ঘটেছে, এ-খবর ছড়িয়ে পড়বে, জানা কথা। এ-ও জানা কথা যে বহু মানুষ সাহায্য করার জন্যে ছুটবে। তবে প্রস্তুতি থাকায় আমরা সবার আগে পৌঁছাব। আর কেউ পৌঁছাবার আগে কাজ সেরে কেটেও পড়ব। আকাশ-পথে রেসকিউ প্লেনও পৌঁছাবে। গডম্যান এয়ারফিল্ডের কন্ট্রোল টাওয়ার তখন আমাদের দখলে থাকবে। যে প্লেনই আসুক, পাইলটকে বলা হবে এয়ারফিল্ড বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, রুট বদলে লুইভিলে চলে যাও।

'ট্রেনের ইঞ্জিনরুমে উঠে ড্রাইভারদেরকে যতটা সম্ভব মানবিক পদ্ধতিতে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। তারপর ট্রেনটাকে আমি নিজে চালিয়ে ফোর্ট নক্সে নিয়ে যাব, থামাব ডিপজিটারির পাশে বুলিয়ান সাইডিংস-এ।' বিরতি নিল গালিব। এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। তারপর আবার শুরু করল।

'ইতিমধ্যে রেড ক্রসের ছাপ মারা তোমাদের ট্র্যান্সপোর্ট কনভয় পৌঁছে যাবে। ট্র্যাফিক কন্ট্রোলার আগে তৈরি করা প্ল্যান ধরে ডিপজিটারির আশপাশে পাঠিয়ে দেবে ওগুলোকে। এরপর আমরা ডিপজিটারিতে ঢুকব। যাবার সময় ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে সতর্ক নজর রাখার দরকার নেই, গোটা শহরটাই... কী বলে... অলঙ্কৃত করে রাখবে তারা। ঠিক?'

মিস্টার অ্যালোন বলল, 'এখন পর্যন্ত... হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু বিশ টনী দরজার কথাটা কি তুমি ভুলে গেলে, মিস্টার গালিব?' চুটকি বাজাল সে। 'ওটা কী এভাবে উড়িয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ,' সহাস্যে বলল গালিব। 'প্রায় ওভাবেই।' আবার চেয়ার ছেড়ে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে চলে গেল সে, বড়সড় ও ভারি কার্টনটা

তুলে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এল। টেবিলে রাখল ওটা, বলল, 'আমার দশজন লোক ভল্ট খোলার প্রস্তুতি নেবে। এই ফাঁকে স্ট্রেচার টিমগুলো ডিপজিটারিতে ঢুকে যে-কজন ঘুমন্ত লোককে পাবে তাদের সবাইকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবে।

'এবার দেখা যাক, ভল্টের দরজা কীভাবে খুলব। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে জার্মানিতে মিত্রশক্তির একটা সামরিক ঘাঁটি থেকে আমি একটা জিনিস সংগ্রহ করেছি। খরচ পড়েছে দশ মিলিয়ন ডলার। ওটা একটা অ্যাটমিক ওঅরহেড, করপোরাল ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ গাইডেড মিসাইল-এর জন্যে ডিজাইন করা।'

টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরে আঁতকে উঠল জ্যাক হোপ। 'জিযাস খ্রাইস্ট! অ্যাটমিক ওঅরহেড?'

টেবিলের চারধারে বসা সবার চেহারা ম্লান হয়ে গেছে, শুধু একজনের বাদে। রানাও অনুভব করল ওর শক্ত চোয়ালের চামড়ায় টান পড়ল। ওহ্, খোদা! এ কার পাল্লায় পড়েছে ও! এ লোক তা হলে পারে না কী?

একটা হাত তুলে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিল গালিব। 'সবাইকে আশ্বস্ত করে বলছি আমি, জিনিসটা বিপজ্জনক নয়, স্রেফ নিরীহ একটা বোমা মাত্র। এখনও আর্ম করা হয়নি। হাতুড়ি পেটালেও ফাটবে না। আর্ম করা হবে অপারেশন গোল্ডের সেই সোনালি দিনে। ফাটানো হবে যেদিন।'

'কিন্তু রেডিয়েশন?' চিৎকার করে জানতে চাইল হয়েনডার।

'দালানটায় প্রথমে যারা ঢুকবে তাদের গায়ে প্রোটেকশন সুট থাকবে। তারাই প্রথম হিউম্যান চেইন তৈরি করবে, তারপর সোনা বের করে তুলতে শুরু করবে ট্রাকগুলোয়। কারও আর কোন প্রশ্ন আছে?'

অনেকেই হাত তুলল। ধৈর্য ধরে সবার প্রশ্ন শুনল গালিব, জবাবও দিল। সবশেষে বলল, 'বিশদ প্ল্যানটা সময় নিয়ে তৈরি করছি আমরা, তাতে আমাকে সাহায্য করছে আমার দুজন

সেক্রেটারি।' ইঙ্গিতে শাকিলা ও রানাকে দেখাল সে। 'এবার, ভোট। এই অ্যাডভেঞ্চারে কে যোগ দিতে চাও? টাকার অঙ্ক অবিশ্বাস্য। ঝুঁকি নামমাত্র। ইয়েস?' একটু বিরতি। 'নাকি, নো?'

'মিস্টার গালিব,' রেড শ্যাডো-র ক্লিফ মরটন বলল। 'আদমের বড় ছেলে তার ছোট ভাইকে খুন করে জগতের এক নম্বর অপরাধী হয়ে আছে। তোমাকে আমি তার পরের আসনটা দিতে চাই। দুজনের মাঝখানে যে-সব অপরাধী আছে, তারা তুচ্ছ। এই প্রজেক্টে তোমার সঙ্গে আমি থাকতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব।'

'ধন্যবাদ, ক্লিফ। তুমি, হেনেরিক?'

হেনেরিক হয়েনডার নিজের সমস্যার বর্ণনা দেওয়ার জন্য প্রচুর সময় নিল, তারপর সংক্ষেপে জানাল, 'ইয়েস।'

'মিস্টার অ্যালোন?' জিজ্ঞেস করল গালিব।

'সোনা না পেলে তোমাকে আমি খুন করব, গালিব। ইয়েস!'

'জ্যাক?'

'এখনই কিছু বলতে পারছি না। সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে,' জবাব দিল জ্যাক হোপ। 'বেশি নয়, মিনিট পাঁচেক সময় চাই।'

'ম্যাক?'

'ইয়েস!'

'জেনিফার?'

'ইন।'

কনফারেন্স ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল জ্যাক হোপ। ঠিক পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল সে।

'জ্যাক? কী সিদ্ধান্ত নিলে?' জিজ্ঞেস করল গালিব। 'তার আগে আরেকটা তথ্য জেনে রাখো সবাই, চলতি মাসের বিশ তারিখ হলো সেই সোনালি দিন।'

'দুঃখিত,' বলল হোপ। 'আমার কুইক মব-এর পার্টনাররা

তোমার প্রজেক্টটাকে বাস্তব বলে ভাবতে পারছে না।' কামরা ছেড়ে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে সে, বগলের নীচে উপহারের ভারী প্যাকেটটা।

ক্লিক করে আওয়াজের সঙ্গে তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। রানা দেখল গালিবের একটা হাত টেবিলের তলায় নেমে গেল। ধারণা করল, মুশকিল আসানের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ যাচ্ছে।

এরপর সবাইকে আপ্যায়ন করল গালিব। ঝুঁকে টেবিলের চারপাশে ভিড় করল সবাই। খানাপিনা চলছে, এই সময় কামরার শেষ মাথার দরজা খুলে একজন কোরিয়ান ঢুকল ভিতরে। গালিবের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলল সে। গালিবের চোখ-মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

'জেন্টলমেন অ্যান্ড ম্যাডাম,' বলল সে। 'এইমাত্র দুঃসংবাদটা পেলাম। আমাদের সুপ্রিয় বন্ধু জ্যাক হোপ হঠাৎ দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসেছে। সিঁড়ির মাথা থেকে পড়ে গেছে সে। আমরা যে কিছু করব তার সুযোগই দিল না। মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে।'

'হো, হো!' হেসে উঠল ক্লিফ মরটন। 'আর তার দুই সঙ্গী, স্টিফেন ও চার্লি? তারা বেঁচে আছে তো?'

আরও গম্ভীর হলো গালিব। 'সত্যিই খুব মর্মান্তিক। স্টিফেন ও চার্লিও সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছে।'

অবশেষে গভীর রাতে বিছানায় ওঠার সুযোগ পেল রানা। খুব ক্লান্ত, তবু ঘুম আসছে না। বোতাম টিপে মুশকিল আসানকে সংকেত দিয়েছে গালিব, সে তার কয়েকজন কোরিয়ান বন্ধুর সাহায্যে মাফিয়ার তিন সদস্যকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। তারা কেউ নয় রানার, হয়তো এ-ধরনের মৃত্যুই তাদের প্রাপ্য। কিন্তু এখন যদি কিছু না করতে পারে ও, গালিবের হাতে মারা যাবে আরও ষাট হাজার মানুষ।

কার কী দায়িত্ব গালিবের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে অতিথিরা চলে গেছে, শাকিলাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কামরায়, কিন্তু রানাকে অনেক রাত পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হলো কনফারেন্স রুমে।

'আমি বলি, তুমি নোট নাও,' বলল গালিব।

পরবর্তী দু'ঘণ্টা অপারেশন গোল্ডের খুঁটিনাটি হাজারটা দিক সম্পর্কে নির্দেশনা দিল গালিব। একেবারে শেষদিকে পানির দুটো ট্যাঙ্কে বিষাক্ত কেমিকেল মেশানোর প্রসঙ্গ উঠল। ড্রাগটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইল রানা। জিনিসটার নাম কী? কত দ্রুত কাজ করে?

'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'কেন? এটার ওপরই তো সব কিছু নির্ভর করছে।'

'ঠিক আছে, রানা।' গালিব যেন অনেক দূরে তাকিয়ে আছে। 'ব্যাপারটা তোমাকে জানানো যায়, কারণ কাউকে কিছু বলার কোনও সুযোগই তুমি পাবে না। এখন থেকে হুনমিন আসান সারাক্ষণ তোমার এক গজের মধ্যে থাকবে। কাজেই তোমাকে জানাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই যে ফোর্ট নক্সের বাসিন্দারা সবাই সোনালি দিন শুরু হবার প্রথম প্রহরে, অর্থাৎ রাত তিনটের মধ্যে হয় মারা যাবে, নয়তো চিরকালের জন্যে পঙ্গু হয়ে যাবে। পানিতে যে জিনিসটা মেশানো হবে। সেটা GB-র হাইলি কনসেনট্রেটেড একটা ফর্ম।'

'তুমি পাগল নাকি? সত্যি সত্যি ষাট হাজার লোককে খুন করতে চাইছ?'

'এতে এত আবেগপ্রবণ হবার কী আছে? আমেরিকায় গাড়ির ড্রাইভাররা প্রতি বছর এরচেয়ে অনেক বেশি লোককে মেরে ফেলছে।'

গালিবের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ভাবছে, এ লোকের মন কী দিয়ে তৈরি? ধাতব নিশ্চয়ই, তবে অবশ্যই সেটা সোনা নয়। নাকি ওর সঙ্গে কৌতুক করছে সে? চাপা গলায় জানতে চাইল ও,

'এই জিবি-টা কী জিনিস?'

'জিবি হলো ট্রিলোন গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী নার্ভ পয়জন। এটাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, উনিশশো তেতাল্লিশ সালে ভেরস্যাক্সট-এ ডেভেলপ করা হয়েছিল, তবে পাল্টা প্রতিশোধ নেয়া হতে পারে ভেবে ব্যবহার করেনি জার্মানরা। পোলিশ সীমান্তে জার্মানদের পুরো স্টক দখল করে নিয়েছিল রাশিয়ানরা। মস্কোয় আমার বন্ধু আছে, এই কাজে যতটুকু দরকার তারাই আমাকে সাপ্লাই দিয়েছে।'

রানা বলল, 'গালিব, তুমি একটা··· বাস্টার্ড।'

'ছেলেমানুষি কোরো না। হাতে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

পরে হাজার হাজার টন সোনা পরিবহনের প্রসঙ্গটা যখন আবার উঠল, গালিবকে বাধা দেওয়ার শেষ একটা চেষ্টা করে দেখল রানা। বলল, 'গালিব, তুমিও আসলে জানো যে এত সোনা নিয়ে কোথাও পালানো সম্ভব নয়। হাজার হাজার টন তো দূরের কথা, ওখান থেকে কয়েক শো টন সোনাও তুমি বের করে আনতে পারবে না। যে পথেই যাও, দেখবে মার্কিন আর্মি তোমার পিছু নিয়েছে। ফোর্ট নক্সের কিছু সোনা গামা রশ্মি বিকিরণ করে বলে শুনেছি। ষাট হাজার মানুষকে মেরে তা হলে তোমার লাভটা কী হবে, যদি ধরাই পড়ে যাও?'

গালিব ধৈর্য হারাতে জানে না। শান্ত কণ্ঠে, হাসিমুখে জবাব দিচ্ছে সে। 'ঘটনাচক্রে আমার একটা ক্রুজার ঠিক ওই সময় ভার্জিনিয়ার নরফোক-এ অবস্থান করবে। সোনালি দিন, অর্থাৎ ডে ওয়ান-এর পরদিন নোঙর তুলবে ওটা। ট্রেন ও ট্র্যান্সপোর্ট কনভয়ে ভর্তি হয়ে আমার কার্গো ওই ক্রুজারে পৌঁছাবে সোনালি দিনের শেষ প্রহরে। তারপর ভেসে পড়ব আমার গোপন আস্তানার উদ্দেশে।' হাসল গালিব। 'আমি যে কাঁচা কাজ করি না, তার প্রমাণ পেলে?'

কী বলবে রানা? এই লোককে বোঝানোর সাধ্য ওর অন্তত নেই।

'সব যে একেবারে নিখুঁত ভাবে ঘটবে, তা-ও আমি বলি না,' বলল গালিব। 'রিহার্সেলের জন্যে যথেষ্ট সময় দেয়া যায়নি। এই মাফিয়াদের লোকবল আর অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে উপায় ছিল না আমার। তারা অনেক ভুল করবে। সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়বে নিজেদের ভাগের সোনা সরাবার সময়। কেউ কেউ ধরা পড়ে যাবে, বাকিরা খুন হবে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ওসবে আমার কিছু আসে যায় না।'

রানা উপলব্ধি করছে, সারা দুনিয়ায় মাত্র একজনই আছে যে এই অপারেশন গোল্ড বন্ধ করতে পারে। কিন্তু কীভাবে?

পরদিন।

ঝড়ো গতিতে পেপার-ওঅর্ক শুরু হওয়ার পর আর থামতেই চাইছে না। গালিবের অপারেশন রুম থেকে আধ ঘণ্টা পরপর নোট আসছে: এটার শেডিউল জানাও, ওটার কপি তৈরি করো, এস্টিমেট কোথায়, টাইমটেবিল চাই, স্টোরস-এর তালিকা তৈরি করো ইত্যাদি। আরেকটা কমপিউটার আনা হয়েছে, সঙ্গে ম্যাপ ও রেফারেন্স বুক। এত কিছুর মধ্যেও নিজের দায়িত্ব ভোলেনি মুশকিল আসান। খানিক পরপর দরজায় নক করছে রানা, প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করে একবারও দরজা খুলছে না সে। তারপর প্রতিটি সেকেন্ড রানার চোখের দৃষ্টি, হাতের নড়াচড়া ইত্যাদি খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। সন্দেহ নেই রানা ও শাকিলাও টিমের সদস্য। বিপজ্জনক ক্রীতদাস, তার বেশি কিছু নয়।

শাকিলা দম দেওয়া পুতুলের মত আচরণ করছে। তার কাজে দ্রুততা আছে, ভুলভাল না করার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ, কিছু শুনতে বা বলতে তেমন উৎসাহী নয়। সন্ধের মধ্যে রানা শুধু এটুকু জানতে পারল: লন্ডনের একটা মেডিসিন কোম্পানির ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি শাকিলা। ইনডোর পিস্তল ও রাইফেল শ্যুটিং তার হবি, দুটো মার্কসম্যান ক্লাবের মেম্বার। কোনও বন্ধু নেই। কখনও প্রেমে পড়েনি। আর্লস কোর্টে দুই কামরার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে একা

থাকে। ফোর্ট নক্স লুঠ করার এই ব্যাপারটা তার দৃষ্টিতে নেহাতই পাগলামি, অবাস্তব একটা পরিকল্পনা।

দিনের শেষে গালিব আরও একটা নোট পাঠাল: পাঁচ জন পার্টনারকে নিয়ে কাল সকাল এগারোটায় আমি লা গোয়ারদিয়া এয়ারপোর্টে যাচ্ছি। চার্টার করা প্লেন আমার পাইলটরা চালাবে। উদ্দেশ্য আকাশ থেকে ফোর্ট নক্স সার্ভে করা। তুমিও যাচ্ছ। শাকিলা এখানে থাকবে। –সৌবর্ণ গালিব।

বিছানার কিনারায় বসে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। দু'মিনিট পর বিছানা ছেড়ে কমপিউটারের সামনে বসল। এক ঘণ্টা ধরে টাইপ করল ও। ফোর্ট নক্স অপারেশন সম্পর্কে যে-সব তথ্য গুরুত্বপূর্ণ, সব উল্লেখ করেছে, নির্দিষ্ট তারিখসহ। এরপর রিপোর্টটা প্রিন্ট করল, দুই পৃষ্ঠায়। সবশেষে কাগজটা ভাঁজ করে গোল পাকাল। ওর কড়ে আঙুলের আকৃতি পেল সেটা। সবশেষে গাম দিয়ে সিল করল। তারপর একটা বিজ্ঞপ্তি টাইপ করল। বাংলা করলে সেটা এরকম দাঁড়ায়:

জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ!!!

'দশ হাজার ডলার নিশ্চিত পুরস্কার। কোনও বিপদে কিংবা ঝামেলায় পড়ার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। টিম সেবাস্তিয়ান ডিটেকটিভ এজেন্সি, ১০ নম্বর স্টেডিয়াম রোড, নিউ ইয়র্ক সিটি, এই ঠিকানায় মেজেসটা পৌঁছে দিতে হবে। পৌঁছে দেয়া মাত্র নগদ পুরস্কার।'

এটাও প্রিন্ট করল রানা, তারপর গোল পাকানো কাগজটার চারধারে জড়াল সেটা, বাইরের গায়ে লাল কালিতে লিখল '১০০০০ ডলার পুরস্কার', সবশেষে পুরো প্যাকেজটাকে তিন ইঞ্চি চওড়া স্কচ টেপ দিয়ে নিজের উরুর সঙ্গে আটকে রাখল।

টিম সেবাস্তিয়ান ডিটেকটিভ এজেন্সি সিআইএ-র একটা ফ্রন্ট, পরিচালনা করে রানার বন্ধু সেবাস্তিয়ান। তার এখন সিআইএ

হেডকোয়ার্টার ভার্জিনিয়ার ল্যাংলিতে থাকার কথা। তবে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে রানার জানা আছে গুরুত্বপূর্ণ এই ফ্রন্ট অফিসে কোনও মেসেজ গেলে কর্মকর্তারা সঙ্গে সঙ্গে সেবাস্তিয়ানকে জানাবেন।

পনেরো

'বস্, ফ্লাইং কন্ট্রোল বিরক্ত করছে আমাদেরকে। জিজ্ঞেস করছে আমরা কারা। বলছে এটা নিষিদ্ধ এলাকা।'

নিজের সিট ছেড়ে ককপিটের দিকে এগোল সৌবর্ণ গালিব। ভিতরে ঢুকে দরজাটা খোলাই রাখল সে। রানা তাকে হ্যান্ড মাইকটা তুলে নিতে দেখল। টেন-সিটার এগজিকিউটিভ বিচক্রাফট-এর মৃদু গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠল তার ভারী কণ্ঠস্বর।

'গুড মর্নিং। গুডউইশ পিকচার করপোরেশনের শাহ সৌবর্ণ গালিব বলছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই এলাকায় সার্ভে করতে এসেছি আমরা। ১৮৬১ সালের বিখ্যাত সেই কনফেডারেট হামলার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হতে যাচ্ছে আমাদের এই ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র, যে হামলায় জেনারেল শেরমান ধরা পড়েছিলেন। ...হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, টম ক্রুজ, মাইকেল ডগলাস ও নিকোল কিডম্যান মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন। ...কী বললেন? ...অনুমতি? অবশ্যই অনুমতি নেয়া আছে। দাঁড়ান, দেখতে দিন।' কিছুই দেখল না গালিব। 'হ্যাঁ, এই তো রয়েছে এখানে। সই করেছেন পেন্টাগনের স্পেশাল সার্ভিস-এর চিফ। অবশ্যই আর্মার্ড সেন্টারের কমান্ডিং অফিসারের কাছে একটা কপি থাকবে। ওকে,

ধন্যবাদ। আশা করি ছবিটা উপভোগ করবেন। বাই।'

মাইক্রোফোন ফেরত দিয়ে কেবিনে বেরিয়ে এল গালিব। পায়ের উপর পা তুলে বসল সে, প্যাসেঞ্জারদের উপর চোখ বুল্যচ্ছে। 'আশা করি যা দেখার সবই দেখা হয়েছে। আরেকটা চক্কর দিয়ে ফিরে যেতে পারি আমরা। আসান, গলা ভেজাবার ব্যবস্থা করো, হে।'

পাঁচ আরোহী প্রশ্ন করছে। জবাব দিচ্ছে গালিব। রানার পাশ থেকে উঠে প্লেনের পিছন দিকে রওনা হলো আসান। তার পিছু নিল রানা। কিছুদূর। ঘাড় ফিরিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে ওকে দেখল আসান। চোখ টিপে বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা।

চুপচাপ বসে চিন্তা করছে রানা। লা গোয়ার্দিয়ায় আসার পথে কিছু করার কোনও সুযোগ পাওয়া যায়নি। ক্যাডিলাকের পিছনে ওর পাশে সতর্ক হয়ে বসে ছিল আসান। রওনা হওয়ার আগে গাড়ির দরজা-জানালা লক করে দিয়েছিল ড্রাইভার। সামনের ও পিছনের সিটের মাঝখানে কাঁচের পার্টিশন আছে, গালিব বসেছিল সামনে। পাশে বসা আসান চোখের পলক না ফেলে সারাক্ষণ তাকিয়ে ছিল রানার দিকে। তারপর চার্টার হ্যাঙ্গারে ক্যাডিলাক পৌঁছাল, গালিব ও আসান ওকে স্যান্ডউইচ বানিয়ে তুলে আনল প্রাইভেট প্লেনটায়। দশ মিনিট পর বাকি সবাই এসে পৌঁছাল। সংক্ষেপে কুশল বিনিময় ছাড়া তাদের কারও সঙ্গে কোনও আলাপ হয়নি রানার।

লা গোয়ার্দিয়ায় ফেরার পর একই রুটিন ধরে শুরু হবে সব। কাজেই যা করার এখনই। কিন্তু রিপোর্টটা কোথায় রাখবে? ল্যাভেটরি পেপার-এর ভিতরে? কিন্তু এই পেপার একটু পরেও ব্যবহার করা হতে পারে, আবার এক হপ্তার মধ্যে কেউ না-ও ছুঁতে পারে। অ্যাশট্রে কি খালি করা হবে? বোধহয় না। তবে একটা জিনিস হবে।

দরজার হাতল আওয়াজ করছে। সন্দেহ নেই অস্থির হয়ে

উঠেছে হুনমিন আসান। রানা হয়তো আগুন ধরাচ্ছে প্লেনে। গলা চড়িয়ে বলল ও, 'আসছি, উল্লু কাঁহিকে!' দাঁড়াল ও, সিটটা তুলল। উরুর ভিতর দিক থেকে প্যাকেজটা খুলে নিল, তারপর সেটাকে আটকে দিল সিটের সামনের কিনারার ভেতর দিকটায়। ভিতরে জমে থাকা বর্জ্য তোলবার জন্য সিটটা খুলতে হবে। তার আর খুব বেশি দেরি নেই, প্লেন হ্যাঙ্গারে ফিরলেই করা হবে কাজটা। আর সিট খোলার সময় লাল কালিতে লেখা ঘোষণাটা অবশ্যই চোখে পড়বে কারও।

সিটটা নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল রানা। বেসিনের কল খুলে মুখ ধুলো। হাত দিয়ে ঠিকঠাক করল মাথার চুল, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

অপেক্ষার সময়টা রাগে ফুলছে আসান। রানাকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটাল সে, বাথরুমের ভিতরটা সতর্ক চোখে দেখল, তারপর বেরিয়ে এসে বন্ধ করে দিল দরজাটা। এসওএস এখন বোতলে, আর বোতলটা স্রোতের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কার হাতে পড়বে ওটা? কতক্ষণে?

ল্যান্ড করার আগে পাইলট, কো-পাইলট পর্যন্ত বাথরুমে গেল। যখনই কেউ বেরিয়ে আসছে, রানা আশঙ্কা করল পিস্তলের ঠাণ্ডা মাজল ওর ঘাড়ে চেপে ধরা হচ্ছে। তবে না, ভাগ্য সহায়তা করল। অবশেষে প্লেন থেকে নেমে ক্যাডিলাকে চড়ল ওরা। ওয়্যারহাউসে ফিরে এসে ডুবে গেল পেপারওঅর্ক-এর স্তূপে।

এখন এটা একটা প্রতিযোগিতা। গালিবের শান্ত, কৌশলী আয়োজনের সঙ্গে খুদে গানপাউডার ট্রেইলের প্রতিযোগিতা, যেটা জ্বালিয়ে দিয়েছে রানা। কী ঘটছে বাইরে?

পরবর্তী তিনটে দিনের প্রতিটি ঘণ্টা রানার কল্পনায় ধরা দিতে লাগল সম্ভাব্য কী ঘটতে পারে। ওর বন্ধু টিম তার চিফকে ব্যাপারটা জানাচ্ছে, গোপন কনফারেন্স শুরু হচ্ছে, প্রেসিডেন্টকে সব কথা জানাবার সিদ্ধান্ত হলো, এফবিআই ও আর্মিকে ডাকা

হলো। টিম জিদ ধরে বলছে, রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে হঠাৎ সন্দেহজনক কিছু করা যাবে না। আটলান্টিকের ওপারে যোগাযোগ করবে সিআইএ, মারভিন লংফেলোর সঙ্গে? কিংবা সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে, বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল [অবসরপ্রাপ্ত] রাহাত খানের সঙ্গে? যোগাযোগ করা হলে বস্ কি বলবেন, মিলিটারি অ্যাকশন শুরু করার আগে রানাকে বের করে আনতে হবে?

নাকি গোটা ব্যাপারটা লেজেগোবরে করে ফেলবে টিম?

অপারেশন শুরু হওয়ার আগের দিন গালিবের একটা নোট পেল রানা।

'অপারেশন-এর প্রথম পর্ব সফল হয়েছে। প্ল্যান অনুসারে আমার সঙ্গে মধ্যরাতে ট্রেনে উঠবে তোমরা। সমস্ত ম্যাপ, শেডিউল, অপারেশন অর্ডার সঙ্গে করে আনবে।'

প্রায় খালি পেনসিলভেনিয়ার স্টেশনে পৌঁছাল দলটা। রানা পরেছে সার্জেন-এর কোট, শাকিলা সেজেছে নার্স। সৌবর্ণ গালিবসহ বাকি সবার পরনেও ডাক্তারের সাদা ইউনিফর্ম, আস্তিনে রেডক্রসের চওড়া ফিতে জড়ানো।

প্ল্যাটফর্মে বিশেষ একটা ট্রেন অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে মাফিয়া দলগুলোর নারী-পুরুষরাও। তারাও সবাই রেডক্রসের ড্রেস ও আর্ম ব্যান্ড ব্যবহার করছে। পরিস্থিতির গাম্ভীর্য বজায় রাখা হচ্ছে, বিষক্রিয়ায় বিধ্বস্ত জনপদে যাচ্ছে ইমার্জেন্সি মেডিকেল ফোর্স। স্ট্রেচার ও ডিকনটামিনেশন সুট তোলা হলো একটা কমপার্টমেন্টে। নাটকীয় বাস্তবতা ফুটে উঠল দৃশ্যটায়।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সুপারিনটেনডেন্ট কে জানে কোত্থেকে। মাফিয়া বস্ ও গালিবের সামনে থামলেন তিনি। সবাই তারা ডাক্তারের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, খবর ভাল নয়। আন্দাজ করছি আজ রাতের পেপারে খবরটা ছাপা হবে।

সব ট্রেন লুইভিল-এ থামিয়ে দেয়া হয়েছে। ফোর্ট নক্স থেকে কারও কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আপনাদেরকে আমরা ঠিকই পৌঁছে দেব। গড অলমাইটি!' গালিবের উদ্দেশে কথা বলছেন তিনি, 'কী ঘটছে ওখানে? লুইভিলে গুজব ছড়িয়েছে, আল কায়েদার লোকজন আকাশ থেকে কিছু ছড়িয়ে গেছে।' তাঁর দৃষ্টি কঠিন ও তীক্ষ্ণ হলো। 'এ-সব আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু কী হতে পারে, ডক? আমার ছেলে আছে ওখানে। ফুড পয়জনিং?'

গালিবের চোখ-মুখ থমথম করছে। মৃদুকণ্ঠে বলল সে, 'মাই ফ্রেন্ড, সেটাই আমরা জানতে যাচ্ছি। তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এটা এক ধরনের স্লিপিং সিকনেস। ডাক্তারী ভাষায় এটাকে আমরা বলি ট্রিপানাসোমাইয়াসিস।'

'তাই?' শব্দটার ওজন অনুভব করে প্রভাবিত হলেন সুপারিনটেনডেন্ট। 'ধন্যবাদ, ডক। আপনার ইমার্জেন্সি টিমের সাফল্য কামনা করি আমি।' হাত বাড়ালেন তিনি। গালিব ধরল সেটা। 'গুড লাক, ডক। আপনারা উঠলেই ট্রেন ছেড়ে দিতে পারি আমরা।'

শাকিলাকে নিয়ে একটা বিলাসবহুল পুলম্যান কোচে চড়ল রানা। ওদের চারপাশে কোরিয়ান ও জার্মানরা ভিড় করে আছে। রানার সিটকে পাশ কাটাবার সময় থামল জেনিফার টোপাজ। 'হ্যালো, হ্যান্ডসাম,' বলল সে। 'খবর কী তোমার? গত কয়টা দিন পালিয়ে বেড়ালে আমার কাছ থেকে। ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না, বুঝলে, ভুয়া কী যেন একটা আছে তোমার মধ্যে। এরকম একটা আউটফিটে একটা পুতুলকে নিয়ে ঠিক কী করছ তুমি বলো তো?'

'আমরা দুজন খেটে মরছি।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। শিরদাঁড়া খাড়া করল টোপাজ। 'তা হয়তো খাটছ। তবে এই অপারেশনে খারাপ যদি কিছু ঘটে, আমি বাজি ধরে বলব আমাদের হ্যান্ডসাম কারণটা জানে। কী বলছি বুঝতে

পারছ?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কোচের সামনের দিকে চলে গেল সে। ওদিকে মাফিয়া বস্‌দের নিয়ে মিটিং করছে গালিব।

ট্রেন দুলছে। তার সঙ্গে আরোহীরাও। একটু পর রানা দেখল শাকিলা ঝিমাচ্ছে। চোখ বুজল ও।

ধীরে ধীরে সীমাহীন খোলা প্রান্তরে লাল আভা নিয়ে হাজির হলো ভোর। ছ'টার দিকে কমতে শুরু করল ট্রেনের গতি। লুইভিল শহরতলি মাত্র জাগছে। প্রায় খালি স্টেশনে হাইড্রলিক নিঃশ্বাস ফেলে থামল ট্রেন।

কর্মকর্তাদের একটা ছোট গ্রুপ ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। রাত্রি জাগরণের ফলে চোখের নীচে কালি পড়েছে গালিবের, একজন জার্মানের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে ধাপ বেয়ে নেমে গেল প্ল্যাটফর্মে, হাতে ছোট একটা কালো ব্যাগ। দু'তিন মিনিট ধরে সিরিয়াস আলোচনা হলো। কথা বলছে লুইভিল স্টেশনের সুপারিনটেনডেন্ট। মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করছে গালিব, উত্তর শোনার সময় গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তারপর থমথমে চেহারা নিয়ে ট্রেনের কাছে ফিরে এল সে।

উপস্থিত 'ডাক্তারদের' মধ্যে থেকে মিস্টার অ্যালোনকে কাছে ডেকে ঘটনা অবহিত করল গালিব। 'ডক্টর অ্যালোন, আমরা যতটা ধারণা করেছিলাম, পরিস্থিতি ঠিক ততটাই খারাপ। আমি এখন সামনের ইঞ্জিনরুমে যাচ্ছি। ইনফেক্টেড এরিয়ায় ধীরে ধীরে ঢুকবে ট্রেন। ব্যাগে যন্ত্রপাতি আছে, বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করব আমি। আপনি কর্মীদেরকে বলুন তারা যেন মাস্ক পরে নেয়। ড্রাইভার ও ফায়ারম্যানের জন্য মাস্ক নিয়ে যাচ্ছি আমি। রেলওয়ের সমস্ত লোকজন ট্রেন থেকে নেমে যাবে এখানে।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল মিস্টার অ্যালোন। 'রাইট, প্রফেসর।' ট্রেনের দরজা বন্ধ করে দিল সে। প্ল্যাটফর্ম ধরে এগোচ্ছে গালিব, তার পিছু নিয়েছে ডাক্তারের ড্রেস পরা জার্মান অনুচর ও

কর্মকর্তাদের গ্রুপটা। গ্রুপের সবাই শোকে কাতর, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

দু'মিনিট পর ধীর গতিতে আবার রওনা হলো ট্রেন। প্ল্যাটফর্মে এখন কর্মকর্তারা ছাড়াও বিষণ্নবদন চারজন কনডাক্টর রয়েছে, সবাই হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবীদের।

পঁয়ত্রিশ মাইল বাকি, তার মানে আর আধ ঘণ্টা। নার্সরা কফি ও বিস্কিট পরিবেশন করল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। ট্রেনের পরিবেশ উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে।

দশ মিনিট পর হঠাৎ কমে গেল স্পিড, ব্রেক থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ হিস-স্-স্। কাপের কফি ছলকে পড়ল। ট্রেন প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর একটা ঝাঁকি খেয়ে আবার বাড়তে শুরু করল স্পিড। মরা মানুষের হাত সরিয়ে অ্যাক্সিলারেটরের হাতলটা দখল করে নিয়েছে নতুন একটা হাত।

কয়েক মিনিট পর মিস্টার অ্যালোন ট্রেনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ছুটল। 'আর দশ মিনিট বাকি! তৈরি হও সবাই! স্কোয়াড এ.বি.সি, নিজেদের ইকুইমেন্ট বের করো। সব ঠিকঠাক মত এগোচ্ছে। শান্ত থাকো সবাই। যে যার দায়িত্ব মনে রাখবে।'

হুনমিন আসানের দিকে ফিরল রানা। 'শোন্ ব্যাটা, উল্লুক। আমি বাথরুমে যাচ্ছি। সম্ভবত মিস শাকিলাও যাবেন।' মেয়েটির দিকে তাকাল ও। 'কী?'

'হ্যাঁ,' নির্লিপ্ত সুরে বলল শাকিলা। 'যেতে হতে পারে।'

রানা বলল, 'যাও তা হলে।'

মেয়েটির পাশের কোরিয়ান অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আসানের দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল আসান।

রানা বলল, 'তুমি যদি সহযোগিতা না করো, মারামারি শুরু করব আমি। গালিব সেটা পছন্দ না-ও করতে পারে।' মেয়েটির দিকে ফিরল ও। 'তুমি যাও, শাকিলা। দেখি কে বাধা দেয়!'

দুর্বোধ্য শব্দ ছাড়ল আসান, তার সঙ্গী সেগুলোর অর্থ বোধহয় বুঝতে পারল। দাঁড়াল সে, বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু দরজা বন্ধ করতে পারবেন না।' মেয়েটির পিছু নিয়ে এগোল সে, বাথরুমের বাইরে পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকল।

রানার পিছু নিয়ে আসানও একই দায়িত্ব পালন করছে। ভিতরে ঢুকেই ডান পায়ের জুতো খুলে ছুরিটা বের করল রানা, তারপর সাবধানে গুঁজে রাখল বেল্টের ভিতর। মুখ-হাত ধুলো ও। আয়নায় ম্লান দেখাল চেহারা, চোখে টেনশন। বেরিয়ে এসে নিজের সিটে বসল।

সামান্য কুয়াশা আছে। তার ভিতরে এতক্ষণে কিছু নিচু দালানের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কন্ট্রোল টাওয়ার সহ একটা হ্যাঙ্গার... গডম্যান এয়ারফিল্ড! ট্রেনের স্পিড একটু কমল বলে মনে হলো। আধুনিক কিছু ভিলা দেখা গেল, পিছিয়ে যাচ্ছে। ওগুলোয় লোকজন আছে বলে মনে হলো না। বাম দিকে কালো ফিতের মত ব্রানডেনবার্গ স্টেশন রোড। গলা লম্বা করল রানা। কুয়াশার ভিতরে আধুনিক ফোর্ট নক্স শহরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। শহরের এবড়োখেবড়ো আউটলাইনের মাথায় কোনও নড়াচড়া নেই। ট্রেনের গতি আরও কমল। স্টেশন রোডে মারাত্মক একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে। দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্য। হাত-পা ছড়ানো এক লোকের লাশ বিধ্বস্ত দরজার বাইরে অর্ধেকটা বেরিয়ে রয়েছে। মরা পোকার মত উল্টে পড়ে আছে দ্বিতীয় গাড়িটা। বুক ধক ধক করছে রানার। মেইন সিগনাল বক্স এল, তারপর চলে গেল। লিভার-এর উপর কী যেন চাপা দেওয়া। একটা শার্ট। শার্টের ভিতর দেহটা ঝুলে আছে, মাথাটা জানালার লেভেল থেকে নীচে। সবুজ ঘাস ছাঁটা সুন্দর একটা লনে লাল গেঞ্জি ও সাদা ট্রাউজার পরা এক লোক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রশিতে বেশ কিছু কাপড় শুকাচ্ছিল, তুলতে এসে সব নিয়ে পড়ে গেছে এক মহিলা।

ট্রেন এখন হাঁটা গতিতে এগোচ্ছে। শহরের সব জায়গায়, বাড়ির উঠান থেকে শুরু করে অলিগলিতেও, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা নারী-পুরুষদের দেখা যাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে? বলা মুশকিল। দেখে মনে হচ্ছে বেঁচে নেই।

ব্রানডেনবার্গ স্টেশনের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে ট্রেন। নিঃসাড় পড়ে থাকা শরীর দ্রুত সংখ্যায় বাড়ছে। নারী, পুরুষ, সৈনিক, পুলিশ, হকার। কারও কারও মুখ আকাশের দিকে তোলা, চোখও খোলা। কেউ কেউ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

সিট ছেড়ে দাঁড়াল আসান। দাঁড়াল গালিবের গোটা টিম। কোরিয়ানরা চুপচাপ, তাদের কারও চোখের পাতা নড়ছে না। জার্মানরা গম্ভীর, ম্লান। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল তারা। বুলিয়ান ডিপজিটারি সাইডিং-এ দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেন। নামতে হবে।

এরপর সব কাজ সামরিক শৃংখলা বজায় রেখে এগোল। যুদ্ধ করবে, এমন কিছু লোককে কয়েক গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অ্যাসল্ট গ্রুপকে সরবরাহ করা হলো সাব-মেশিনগান। দ্বিতীয় গ্রুপ পেল স্ট্রেচার, এরা ভল্ট থেকে গার্ড ও অন্যান্য লোকজনকে তুলে আনবে। তৃতীয় গ্রুপ গালিবের ডিমলিশন টিম, সদস্য সংখ্যা দশ, তাদের সঙ্গে তারপুলিনে মোড়া প্যাকেজটা রয়েছে। একটা গ্রুপে নানা পেশার লোককে জড়ো করা হলো: অতিরিক্ত ড্রাইভার, ট্র্যাফিক-কন্ট্রোল কর্মী। এরপর নার্সদের গ্রুপ, এখন তাদের সবাইকে একটা করে পিস্তল দেওয়া হচ্ছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রিজার্ভ গ্রুপের পিছনে থাকবে তারা। রিজার্ভ গ্রুপের দায়িত্ব হলো অপ্রত্যাশিত হামলা অথবা বাধা দেখা দিলে সেটার মোকাবিলা করা। গালিব বলেছে, 'বলা তো যায় না, যদি কেউ জেগে ওঠে!'

রানা ও শাকিলাকে রাখা হলো গালিবের গ্রুপে। এ-দলে আরও রয়েছে পাঁচ মাফিয়ার পাঁচটা মাথা ও হুনমিন আসান। এরা পজিশন

নেবে দুটো ডিজেল লোকোমটিভের সমতল ছাদে, ওখান থেকে ওদের টার্গেট ও টার্গেটে পৌঁছানোর সবগুলো রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে। রানা ও শাকিলার দায়িত্ব ম্যাপ, টাইম-টেবল ও স্টপওয়াচ-এর উপর নজর রাখা। রানার অতিরিক্ত দায়িত্ব কাজে কোথাও কেউ গাফিলতি করছে কিনা, অন্য কোনও কারণে শিথিলতা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা দেখা। সরাসরি গালিবকে রিপোর্ট করবে ও। গালিব ওয়াকি-টকির সাহায্যে গ্রুপ লিডারকে সতর্ক করবে। বোমাটা ফাটাবার সময় হলে ডিজেল-এর পিছনে আড়াল নেবে ওরা।

পর পর দু'বার ট্রেনের হুইসেল বাজিয়ে সংকেত দেওয়া হলো। প্রথম ইঞ্জিনের মাথায় উঠে নিজেদের পজিশনে দাঁড়াল রানা ও শাকিলা। ওদিকে অ্যাসল্ট স্কোয়াড, অন্যান্য সেকশনকে পিছনে নিয়ে, মার্চ করে এগোল; গন্তব্য রেলওয়ে ও বুলিয়ান বুলেভার্ড-এর মাঝখানের ফাঁকা বিশ গজ জায়গা।

যতটা সম্ভব গালিবের কাছাকাছি সরে এল রানা। চোখে বিনকিউলার সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে সে। বুকের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আঁটকানো মাইক্রোফোনের কাছে মুখ। তবে রানা ও গালিবের মাঝখানে রয়েছে মুশকিল আসান। চার দিকে কী ঘটছে না ঘটছে খেয়াল নেই কোরিয়ান লোকটার, শুধু রানা ও শাকিলার উপর স্থির রেখেছে নজর।

প্লাস্টিকের ম্যাপ-কেসে চোখ বুলাবার ও স্টপ-ওয়াচে নজর রাখার ছলে ইঞ্চি ও কোণ মাপছে রানা। ট্রেনের কাছাকাছি পড়ে থাকা ছোট একটা দলকে দেখছে ও। চারজন পুরুষ, একজন মহিলা। তারা স্থির, অপলক চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দৃশ্যের দিকে। ওর আরেক পাশ থেকে উত্তেজনায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ক্লিফ মরটন। 'প্রথম গেট পার হয়ে গেছে ওরা!' মনের একটা অংশকে নিজের প্ল্যান তৈরিতে ব্যস্ত রেখে দ্রুত একবার রণক্ষেত্রের দিকে তাকাল রানা।

অসাধারণ একটা দৃশ্য। বড়সড় খোলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ, ওটার পালিশ করা গ্র্যানিট-এর গা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ।

মাঠের বাইরে ডিক্সি হাইওয়ে, ভাইন গ্রোভ ও বুলিয়ান বুলেভার্ড, এই তিনটে রাস্তাই সারি সারি লাইনবন্দি ট্রাক ও ট্র্যান্সপোর্টার-এ এরই মধ্যে ভরে উঠেছে।

কনভয়ের এখানে সেখানে নানা রঙের পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছে, ছয়টা গ্রুপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করছে ওগুলো। পরিবহন ড্রাইভাররা ভল্টের চারদিকের গার্ড ওয়ালের গা ঘেঁষে জড়ো হয়েছে। ওদিকে মেইন গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে ট্রেন থেকে নামা সুশৃংখল স্কোয়াড। এত রকম তৎপরতার বাইরে সব কিছু স্থির ও অচল হয়ে আছে, কোথাও একটা টু-শব্দ পর্যন্ত নেই, যেন এতবড় একটা ক্রাইম অনুষ্ঠিত হতে দেখে দম আটকে রেখেছে গোটা আমেরিকা।

বাইরে আরও রয়েছে সৈনিকদের দেহ, যেখানে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে সেখানেই হাত-পা ছড়িয়ে ঢলে পড়েছে তারা। পিল বক্সগুলোর পাশে সেন্ট্রিদের দেখা যাচ্ছে, এখনও অটোমেটিক পিস্ত ল আঁকড়ে ধরে আছে। প্রোটেকটিং ওয়াল-এর ভিতর দেখা যাচ্ছে ব্যাটলড্রেস পরা দুই স্কোয়াড সৈন্যকে। এলোমেলো দুটো স্তূপের আকৃতি পেয়েছে তারা, একজনের উপর আরেকজন ঢলে পড়েছে। বাইরে, মেইন গার্ড ও বুলিয়ান বুলেভার্ডের মাঝখানে, পরস্পরকে ধাক্কা দিয়েছে দুটো আর্মার্ড কার। জোড়া লেগে এক হয়ে রয়েছে কার দুটো, একটার মেশিন গান জমিনের দিকে তাক করা, আরেকটার আকাশের দিকে। ডান দিকের ভেহিকেলের টারিট থেকে ড্রাইভারের শরীর অর্ধেকটা বেরিয়ে এসেছে।

মরিয়া হয়ে জীবনের লক্ষণ খুঁজছে রানা। ক্ষীণ একটু নড়াচড়ার সামান্য আভাস। যা দেখে বোঝা যাবে গোটা ব্যাপারটা সযত্নে, সতর্কতার সঙ্গে সাজানো একটা অ্যামবুশ। কিচ্ছু না! কোথাও

একটা বিড়াল পর্যন্ত নড়ছে না। রাস্তার ওপারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা দালানগুলো থেকেও ভেসে আসছে না কোনও শব্দ।

মাইক্রোফোনে শান্ত স্বরে কথা বলছে গালিব। 'শেষ স্ট্রেচার বেরিয়ে গেল। বম্ব স্কোয়াড রেডি। টেক ওভার-এর জন্যে তৈরি হও।'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে রানা বলল, 'সময়ের চেয়ে এক মিনিট এগিয়ে আছে ওরা।'

গালিবের দৃষ্টি মুশকিল আসানের কাঁধকে ছাড়িয়ে এল। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। 'দেখলে তো, রানা? তোমার ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। আর দশ মিনিট পর দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মানুষ হতে যাচ্ছি আমি। বলা উচিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী মানুষ। আমি ইতিহাস সৃষ্টি করছি, রানা। একজন বাঙালীর এই কৃতিত্বে তোমার গর্ব হচ্ছে না?'

মৃদু হেসে রানা জবাব দিল, 'আগে ওই দশ মিনিট পার হোক।'

'আচ্ছা? এখনও তোমার সংশয় কাটছে না?' হেসে উঠল গালিব। তারপর আবার মাইক্রোফোনে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

একটু পর রানাকে ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে গেল গালিবের দৃষ্টি। দ্বিতীয় ইঞ্জিন রুমের মাথায় দাঁড়ানো গ্রুপটার উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বলল, 'আর পাঁচ মিনিট, বন্ধুরা, তারপরই দখলে চলে আসবে ভল্ট।' রানার উপর ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি। নরম সুরে বলল, 'তারপর আমরা গুডবাই জানাব, রানা। তুমি ও মেয়েটা আমাকে যে সাহায্য করলে, সেজন্যে ধন্যবাদ।'

চোখের কোণে কী যেন নড়তে দেখল রানা, আকাশে। জিনিসটা কালো, সচল একটা ফোঁটা। যতটুকু সাধ্য উপরে উঠে থামল ওটা, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কান ফাটানো আওয়াজের সঙ্গে টকটকে লাল রঙ, সংকেত, বিস্ফোরিত হলো।

বুকের ভিতর লাফিয়ে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। চট করে একবার তাকাতেই দেখতে পেল সৈনিকদের সারি সারি লাশ লাফ দিয়ে জ্যান্ত হচ্ছে, লক করা আর্মার্ড কার-এর মেশিন গান ঘুরে গিয়ে কাভার দিতে যাচ্ছে গেটগুলো। কোত্থেকে কে জানে একটা লাউডস্পিকার থেকে যান্ত্রিক গর্জন ভেসে এল। 'খবরদার! জায়গা ছেড়ে নড়বে না কেউ। হাতের অস্ত্র ফেলে দাও।'

গ্যাঙ লিডারদের যে-সব লোক গার্ড হিসেবে পিছনে রয়ে গেছে, পিস্তল তুলে দু'চারটে গুলি করল তারা। ব্যস, ওইটুকুই। তারপর যেন নরক ভেঙে পড়ল তাদের উপর।

এক হাতে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরল রানা, ইঞ্জিন রুমের ছাদ থেকে একসঙ্গে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ল ওরা। আড়াল পাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব ট্রেনের গা ঘেঁষে ছুটেছে রানা। গালিবের চিৎকার শুনতে পেল, 'ধরো ওদের, খুন করো।' তার অটোমেটিক গর্জে উঠল। বুলেটটা রানার বাম পায়ের কাছাকাছি খানিকটা সিমেন্টের মেঝে ভাঙল। তবে গালিবকে নয়, রানার ভয় আসানকে। মেয়েটিকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ধরে ছোটার সময় পিছনে তার বিদ্যুৎগতি পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ও।

হয় হাঁপিয়ে গেছে বলে, নয়তো ভয়ে থামতে চেষ্টা করছে শাকিলা, ফলে ছোটার গতি কমিয়ে আনতে বাধ্য হলো রানা। ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মেয়েটি, ট্রেনের একটা খোলা দরজার দিকে লাফ দিল। সর্বনাশ, ভাবল রানা, আর পালানো হয়েছে! বেল্ট থেকে ঝট করে ছুরিটা বের করে ঘুরে দাঁড়াল ও।

দশ গজ দূরে রয়েছে আসান। ছোটার গতি কমল কি কমল না, এক ঝটকায় মাথা থেকে নামাল মারাত্মক হ্যাটটা। লক্ষ্যস্থির করার জন্য একবার শুধু চোখ বুলাল, তারপরই ছুঁড়ে দিল কালো ইস্পাতের তৈরি আধখানা চাঁদ। ওটার কিনারা ঠিক মেয়েটির ঘাড়ের পিছনে লাগল। এতটুকু শব্দ না করে আসানের পথে ঢলে পড়ল সে।

রানার মাথা লক্ষ্য করে লাথি মারতে যাচ্ছিল আসান, সামনে বাধা দেখতে পেয়ে বাধ্য হলো লাথি না মেরে লাফ দিতে, তার বাম হাত বাতাস কেটে তলোয়ারের মত ছুটে আসছে রানার দিকে। ঝট করে নিচু হলো রানা, ছুরি চালাল উপরদিকে।

লোকটার ঘাড়ের পাশে ঢুকল ফলা, কিন্তু সামান্য। উড়ন্ত শরীরের গতি ওর মুঠো থেকে টেনে নিল ছুরিটাকে। ধাতব শব্দ তুলে প্ল্যাটফর্মের কোথাও পড়ল সেটা, দেখতে পাওয়া গেল না।

আবার ওর দিকে ফিরে আসছে আসান, রক্ত ঝরছে ওর জামায়। ভাব-ভঙ্গি দেখে গুরুতর আহত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। হাত সামনে বাড়ানো, হাঁটু ভাঁজ করা, আবার লাফ দেবে। তার চোখ দুটো লাল হয়ে আছে, মুখ খুলে শ্বাস নিচ্ছে।

স্টেশনের বাইরে অসংখ্য রাইফেল ও সাব মেশিনগান গর্জন করছে, এক মুহূর্তের জন্য সব চাপা পড়ে গেল ট্রেনের হুইসেল পরপর তিনবার বেজে উঠতে। সন্দেহ নেই এটা একটা সংকেত। আক্রোশে খেঁকিয়ে উঠে লাফ দিল আসান। এক পাশে ডাইভ দিতে চেষ্টা করল রানা। কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল। প্ল্যাটফর্মের পাকা মেঝেতে পড়ার সময় ভাবল ও, এবার ওকে মেরেই ফেলবে লোকটা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিধে হলো ও, আঘাতটা সামলাবার জন্য ঘাড়টাকে গুঁজে রেখেছে দুই কাঁধের মাঝখানে। তবে কোনও আঘাত এল না, ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল আসানের উড়ন্ত শরীরটা সরে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে।

এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে ট্রেন। নাগাল পেয়ে সামনের ইঞ্জিনরুমের পাদানিতে পড়ল আসান। এক মুহূর্ত ঝুলে থাকল, তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল কেবিনের ভিতর। ট্রেনও ইতিমধ্যে গতি পেয়ে গেছে।

রানার পিছনে স্টেশন মাস্টারের অফিস রুমের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। চিৎকার শোনা গেল, 'রানা! মাই ফ্রেন্ড!'

চরকির মত আধ পাক ঘুরল রানা। বন্ধু টিম সেবাস্তিয়ানকে ছুটে আসতে দেখল ও, হাতে পিস্তল। তার পিছু নিয়ে আসছে সামরিক ইউনিফর্ম পরা দশ-বারোজন সৈনিক, প্রত্যেকের হাতে বাগিয়ে ধরা অটোমেটিক রাইফেল। তবে কোনও লাভ নেই। ফুলস্পিডে ছুটছে ট্রেন, বাঁক নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে শহর ছেড়ে।

দুই বন্ধু পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টিমের কাঁধে একটা ঘুসি মারল রানা। 'এই গর্দভ,' বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল ও, 'লাইনটাকে ব্লক করোনি কেন?'

'কোনও অভিযোগ থাকলে আমাদের প্রেসিডেন্টকে জানাতে হবে। গোটা ব্যাপারটা তিনি নিজে দেখছেন। তবে চিন্তার কিছু নেই, আকাশে একটা স্পটার প্লেন আছে।' রানার কাঁধ আঁকড়ে ধরল টিম। 'তোমাকে এখানে পেয়েছি, খোদাকে ধন্যবাদ। আমাদের এই তেরোজনের ওপর তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।'

রানা খেয়াল করল, ইতিমধ্যে ওদের দুজনকে ঘিরে ফেলেছে সৈনিকের দলটা। 'আয়োজন, অভিনয় ইত্যাদি সবই চমৎকার,' টিমকে বলল রানা, 'তবে টাইমিং ঠিক হয়নি, একটু দেরি করে ফেলেছ। আমরা বোধহয় শাকিলাকে হারিয়েছি। প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটছে ও, পাশে রয়েছে টিম, পিছনে সৈনিকরা।

শাকিলার শরীরটা নিঃসাড় পড়ে রয়েছে। ঘাড়টা যেভাবে বাঁকা হয়ে আছে, তারপর আর কিছু বুঝতে বাকি থাকে না। তবু তার পাশে হাঁটু গাড়ল রানা, পালস পাওয়ার জন্য আঙুল দিয়ে কবজিটা ধরল। একটু পর নিঃশব্দে সিধে হলো। 'আমি হয়তো বাঁচাতে পারতাম ওকে,' টিমকে বলল ও। 'কিন্তু শেষ দিকে এমন ভয় পেল, আমার সঙ্গে দৌড়াতে চাইছিল না।'

রানার বাহু ধরে মৃদু চাপ দিল টিম। 'টেক ইট ইজি, মাই ফ্রেন্ড।' সৈনিকদের দিকে ঘুরে গেল সে। 'স্ট্রেচারে তুলে মেয়েটিকে নিয়ে যাও। এখানে একটা অ্যামবুলেন্স দরকার আমার।

কেউ একজন কমান্ড পোস্টে গিয়ে রিপোর্ট করো, বলবে মাসুদ রানাকে পেয়েছি আমরা, একটু পর তাঁকে নিয়ে আসছি আমি।'

এই সময় তীক্ষ্ণ শব্দে আকাশে বিস্ফোরিত হলো আরেকটা ছোট্ট ফোঁটা। ঝলসে উঠল লাল আলো। এটা অস্ত্র বিরতির সংকেত।

ষোলো

দু'দিন পর। ওয়াশিংটন।

সন্ধ্যার লন্ডন ফ্লাইট ধরতে এয়ারপোর্টে যাচ্ছে রানা। বন্ধু টিম সেবাস্তিয়ান নিজের গাড়িতে তুলে পৌঁছে দিচ্ছে ওকে।

'সৌবর্ণ গালিবের ব্যাপারটা কী বলো তো?' গাড়িতে ওঠার খানিক পরেই জানতে চাইল রানা। এখনও তোমরা তাকে ধরতে পারলে না কেন?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টিম। 'অবিশ্বাস্য মনে হলেও, আমাদের কাছে সত্যিই কোনও ক্লু নেই। চালু অবস্থায় ট্রেনটা পাওয়া গেছে। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলে স্পিডে ছুটছিল। নিজের লোকজনকে নিয়ে মাঝপথে নেমে এই স্পিড সেট করে দিয়ে কেটে পড়েছে গালিব। সঙ্গে বোধহয় জেনিফার টোপাজ ও বাকি চার মাফিয়া লিডারও রয়েছে, কারণ তাদেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

'তার মানে গালিব ও তার সঙ্গীরা লুকিয়ে আছে কোথাও,' বিড় বিড় করল রানা, চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে।

'নরফোকে গিয়ে নিজের ক্রুজারে অন্তত লুকায়নি,' বলল টিম।

'ওদিকের ডকে সাদা পোশাকে কয়েকজন এজেন্টকে রাখা হয়েছিল। তারা রিপোর্ট করেছে, নতুন কোনও আগন্তুক বা মালামাল না নিয়েই শেডিউল ধরে চলে গেছে ক্রুজারটা। ইস্ট রিভারের ওদিকেও কাউকে দেখা যায়নি। আর মেক্সিকো ও কানাডা সীমান্ত তো আগেই সিল করে দেয়া হয়েছে। আমার সন্দেহ, মাফিয়াদের সাহায্য নিয়ে কিউবায় চলে যেতে পারে গালিব।'

'কীভাবে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'যদি একটা গাড়ি হাইজ্যাক করে থাকে, ফ্লোরিডায় পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগেনি ওদের। ডেটোনা বিচ থেকে সাগর পাড়ি দেয়ার জন্যে ইয়টে উঠতে পারে। কোস্ট গার্ড ও এয়ার ফোর্সকে বলা হয়েছে, সার্চও শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনও কিছু জানা যায়নি।'

'এমনও হতে পারে দিনের বেলা লুকিয়ে ছিল, সাগর পাড়ি দিয়েছে রাতের অন্ধকারে।'

'হতে পারে।' কাঁধ ঝাঁকাল টিম।

গালিব ধরা পড়েনি, রানার জন্য এটা খারাপ খবর।

বাকি সব অবশ্য ঠিকঠাক মতই ঘটেছে। বিচক্রাফট প্লেনটা পরিষ্কার করার সময় রানার নোটটা একজন ক্লিনার দেখতে পায়। দেরি না করে টিমের এজেন্সিতে ছুটে যায় সে। টিমও মেসেজের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সিআইএ ও এফবিআইকে জানায় কী ঘটতে চলেছে। গোপন মিটিঙে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কৌশলটা কী হবে। টিমের প্রস্তাবটা পছন্দ হয় সবার: গালিব ও তার সঙ্গী-সাথীদের বুঝতে দেওয়া হবে বিষাক্ত পানি খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে গোটা শহর।

তার আগে জাপানি দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের ব্রিফকেসে ক্যাপসুল ভর্তি দুটো বোতল পাওয়া গেছে। ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে ওগুলো। ওই এক মুঠো ক্যাপসুলে যে পরিমাণ জিবি আছে, ফোর্ট নক্সের সব মানুষকে খুন করার জন্য তা

যথেষ্ট। এরপরেই গোটা ব্যাপারটা আর্মির হাতে চলে যায়। ট্রেনে চড়ে ফোর্ট নক্সে ঢোকার সময় যে-সব নারী-পুরুষকে পথে-ঘাটে পড়ে থাকতে দেখেছে রানা তারা কেউ সাধারণ নাগরিক ছিল না, সবাই তারা সামরিক বাহিনীর সদস্য।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। মনটা খারাপ। যে কাজে এসেছিল তা আধ-খাপচা অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে ফিরছে ও লন্ডনে। শুধু এইটুকু প্রমাণ করা গেছে যে, শাহ্ সৌবর্ণ গালিব একজন ক্রিমিনাল। ওর সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। কিন্তু রানার আসল যে কাজ– বাংলাদেশের চুরি যাওয়া দুই টন সোনা উদ্ধার করা– সে ব্যাপারে এক কদমও এগোতে পারেনি ও।

টার্মিনাল ভবনে ঢুকতেই সুরেলা নারী কণ্ঠের ঘোষণা ভেসে এল লাউডস্পিকার থেকে। 'প্যান আমেরিকান গ্লোবাল এয়ারওয়েজ-এর প্যাসেঞ্জাররা ডিপারচার লাউঞ্জে চলে আসুন, প্লিজ।'

হাতে ব্রিফকেস, বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিল রানা। 'ধন্যবাদ, টিম। সময়টা ভালই কাটল। ই-মেইল করো।'

বুকে টেনে নিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিল টিম। 'কিছু বলার ভাষা নেই আমার। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তোমার জন্যে কত উঁচুতে উঠে গেছি আমি সরকারী কর্মকর্তাদের চোখে। আমি ভাগ্যবান, তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছি।'

ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকল রানা। গ্লাস পার্টিশনের ভিতর দিয়ে দেখল টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল টিম। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরে ছুটল গাড়িটা।

এই সময় একটা ভারি, পুরুষালি কণ্ঠস্বর ভেসে এল লাউডস্পিকার থেকে। 'প্যান আমেরিকান, লন্ডন ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনি দয়া করে আমাদের প্যান আমেরিকান কাউন্টারে চলে আসুন, প্লিজ।'

অগত্যা ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসতে হলো

রানাকে। প্যান আমেরিকান কাউন্টারে এসে দেখল ওর জন্য অপেক্ষা করছেন একজন অফিসার। নরম সুরে, ভদ্রভাবে জানতে চাইলেন, 'আমি আপনার হেলথ সার্টিফিকেট দেখতে পারি, প্লিজ, মিস্টার রানা?'

পাসপোর্ট থেকে ফর্মটা বের করে বাড়িয়ে ধরল রানা।

সতর্কতার সঙ্গে সেটা পরীক্ষা করলেন অফিসার। বললেন, 'সত্যি খুব দুঃখিত আমি। হঠাৎ করে রাজধানীর কিছু এলাকায় টাইফয়েড দেখা দিয়েছে, তাই কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইঞ্জেকশন না নিয়ে কাউকে প্লেনে উঠতে দেয়া যাবে না।'

ইঞ্জেকশন নিতে বিরক্ত বোধ করে রানা। ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু, দেখুন, এটা-সেটা নানা কারণে এত বেশি ইঞ্জেকশন নিতে হয় যে...' হঠাৎ একটা ব্যাপার লক্ষ করে থেমে গেল ও। প্যান অ্যাম-এর ডিপারচার গেটটা চোখে পড়ার মত খালি। ও জানতে চাইল, 'অন্যান্য প্যাসেঞ্জারদের ব্যাপারটা কী? তারা কোথায়?'

'তাঁরা কেউ আপত্তি করেননি। সবাই ইঞ্জেকশন নিয়েছেন। আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ, এক মিনিটও লাগবে না।'

এরপর আর কথা চলে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহিষ্ণু ভাব প্রকাশ করল রানা, তারপর অফিসারের পিছু নিয়ে ঢুকে পড়ল প্যান অ্যাম স্টেশন ম্যানেজারের অফিস রুমে। সাদা ড্রেস পরা ডাক্তার অপেক্ষা করছিলেন, নাক-মুখ মাস্কে ঢাকা, হাতে ওষুধ ভর্তি হাইপডারমিক সিরিঞ্জ। 'ইনিই শেষ?' প্যান অ্যাম অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, ডাক্তার।'

'ওকে। কোট খুলে বাম আস্তিন গুটান, প্লিজ। লন্ডন ইনসিস্ট করায় সবাইকে এই ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে।'

নাকে অ্যালকোহলের ঝাঁঝ পেল রানা, বাহুতে ঠাণ্ডা। তারপর সুই ঢুকল। 'ধন্যবাদ,' গম্ভীর সুরে বলল ও। আস্তিন নামাল। চেয়ারের পিঠ থেকে কোটটা তুলতে যাচ্ছে। ওর হাত মিস করল

ওটাকে। হাতটা নীচে পড়ে যাচ্ছে, হাতের সঙ্গে বাকি শরীরও।

প্লেনের সব আলো জ্বলছে। ভিতরে মনে হচ্ছে প্রচুর ফাঁকা জায়গা, অসংখ্য সিট, কিন্তু প্যাসেঞ্জার নেই। অবশ্য ওর পাশেই, জানালার ধারে, একজন রয়েছে। কিন্তু দুজনের মাঝখানের আর্মরেস্টটা সে একাই কেন দখল করবে? সিট বদলাবার জন্য দাঁড়াবার চেষ্টা করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে বমি পেল, ঘুরে উঠল মাথাটাও। চোখ বুজে অপেক্ষা করছে। কী আশ্চর্য! জীবনে কখনও এয়ার সিকনেসে ভোগেনি ও। মুখে ঠাণ্ডা ঘাম অনুভব করছে। রুমাল বের করে মুখ মুছল। আবার চোখ খুলে হাতের দিকে তাকাল। চেয়ারের হাতলের সঙ্গে কবজিগুলো বাঁধা। কেন? ইঞ্জেকশন নেওয়ার পর বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কিংবা ওই ধরনের কিছু। ও কি হিংস্র হয়ে উঠেছিল, কিছু ভাঙচুর করেছে? ব্যাপারটা কী আসলে? ডান দিকে তাকাল রানা। চোখে পলক পড়ছে না। হাঁ হয়ে গেছে। ওর পাশের প্যাসেঞ্জার হুনমিন আসান। হুনমিন আসান! প্যান অ্যাম-এর ইউনিফর্ম পরে!

কোনও রকম উৎসাহ না দেখিয়েই রানার দিকে তাকাল কোরিয়ান লোকটা। তারপর হাত বাড়িয়ে স্টুয়ার্ড-এর বেল-এ চাপ দিল। রানা দেখল ওর ঘাড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে। প্যান্ট্রি-র ওদিক থেকে ভেসে এল মিষ্টি আওয়াজটা: ডিং ডং। একটু পর রানার পাশে স্কার্ট-এর খসখসে আওয়াজ শোনা গেল। মুখ তুলে তাকাল ও। মেয়েটি আর কেউ নয়, জেনিফার টোপাজ, নীল ইউনিফর্মে পরিপাটি ও সতেজ লাগছে। 'হাই হ্যান্ডসাম!' বলল সে। তার চোখে আশ্চর্য গভীর, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি।

রানা বলল, 'ফর গড'স সেক, এ-সব কী হচ্ছে? কোত্থেকে এলে তুমি? এখানে কী করছ?'

'কেভিয়ার ও শ্যাম্পেন খাচ্ছি!' বলে হেসে উঠল টোপাজ। 'যাই, আংকেলকে খবর দিই। সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

নিতম্বে ঢেউ তুলে ককপিটের দিকে রওনা হলো টোপাজ।

এরপর কোনও কিছুতেই রানার আর অবাক হওয়া চলে না। সৌবর্ণ গালিবকে প্যান অ্যাম ক্যাপটেনের ইউনিফর্মে দেখছে ও। সেটা সামান্য ঢিলে হলেও, ক্যাপটা আঁটোভাবেই বসেছে মাথায়। নিজের পিছনে ককপিটের দরজা বন্ধ করল সে, আইল ধরে হেঁটে আসছে ওর দিকে। হাতে ছোট্ট একটা পিস্তল, পয়েন্ট টুফাইভ।

কাছে এসে রানার সিটের পাশে, আইলে দাঁড়াল গালিব। গম্ভীর মুখে দেখছে ওকে। 'খেলাটা শেষ করার জন্যে ভাগ্য আবার আমাদেরকে এক জায়গায় টেনে এনেছে। তবে এবার, রানা, আস্তিন থেকে বের করার মত কোনও তাস নেই তোমার। উফ্! বাহাদুরি দেখাতে যাওয়ার কী ফল, হাড়ে হাড়ে অভিজ্ঞতা হলো আমার।' মাথাটা এদিক ওদিক নাড়ল। 'তোমাকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছিলাম কী করতে? কেন ছারপোকার মত টিপে মারিনি? তুমি আর মেয়েটা আমার কাজে লেগেছ। তোমরা যে কাজের লোক, এটা বুঝতে আমার ভুল হয়নি। তবে ঝুঁকি নেয়াটা পাগলামি হয়ে গেছে।' কণ্ঠস্বর হঠাৎ নিচু হলো। 'এখন বলো, রানা, কাজটা তুমি কীভাবে করলে? কীভাবে জানালে ওদেরকে, কীভাবে খবর দিলে? কীভাবে সর্বনাশ করলে আমার?'

রানা বলল, 'তুমি যখন চাইছ, আলোচনা হবে। কিছু কিছু ব্যাপার তোমাকে জানানো যায়। তবে হাতের এই বাঁধন খুলে দেয়ার আগে নয়। তার আগে আরও চাই বরফ দেয়া হুইস্কির গ্লাস ও চুরুট। তারপর আমি কিছু প্রশ্ন করব। সেগুলোর উত্তর পাবার পর সিদ্ধান্ত নেব কতটুকু কী বলা যায় তোমাকে। পরিস্থিতি আমার অনুকূলে নয়, কাজেই আমার হারাবারও কিছু নেই। কিছু যদি চাও, আমার শর্তে পেতে হবে তোমাকে সেটা।'

থমথম করছে গালিবের চেহারা। 'তোমার শর্তে আমার আপত্তি নেই, কারণ এখন কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না। হুনমিন আসান! মিস টোপাজকে ডাকো। তারপর রানার বাঁধন খুলে দাও।

কাজটা সেরে তুমি ওর সামনের সারির সিটে বসো। আরেকজনকে ডেকে নাও, সে প্লেনের পেছনদিকে কোথাও পাহারা দিক। তুমি শুধু লক্ষ রাখবে ককপিটে যেন ঢুকতে না পারে রানা। প্রয়োজন হলে ওকে তুমি সঙ্গে সঙ্গে খুন করতে পারবে। তবে আমি চাই আমার দ্বীপটায় জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাই ওকে। বুঝেছ?'

'ঘঁ-ঘঁ ঘঁ।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্রে-তে করে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে এল টোপাজ। রানার সরাসরি বাম পাশে, আইলের উল্টোদিকের একটা সিটে বসে অপেক্ষা করছে গালিব। ধীরেসুস্থে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে রানা। দু'তিন চুমুক দেয়ার পর চুরুট ধরাল, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল গালিবের দিকে।

ইতিমধ্যে রানার ঠিক সামনের সিটটায় জানালা ঘেঁষে বসেছে হুনমিন আসান। প্যান অ্যাম কাউন্টারের সেই জার্মান লোকটাও ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে প্লেনের পিছন দিকে চলে গেল পাহারা দিতে।

হুইস্কি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় গ্লাসের তলায় লেখাটা দেখতে পেল রানা। গ্লাসের নীচে, পিছন দিকে, একটা কাগজ সাঁটা হয়েছে। চুমুক দেওয়ার ছলে এরপর ভাল করে তাকাল ও। পরিষ্কার পড়তে পারল এবার। 'আমি তোমার সঙ্গে আছি। টি।'

গ্লাসটা সাবধানে ট্রে-র উপর নামিয়ে রেখে সিটে হেলান দিল রানা, অলস দৃষ্টিতে গালিবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রথমে, গালিব, আমার কৌতূহল মেটাও। এই প্লেন তুমি পেলে কোথায়? কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

পায়ের উপর পা তুলল গালিব। হাতের পিস্তলটা রানার দিকে তাক করা। ওর উপর থেকে চোখ নামিয়ে আইল-এর দিকে তাকাল। তারপর শান্ত, ঘরোয়া গল্প করার সুরে শুরু করল।

ট্রেন থেকে নেমে একটা প্রাইভেট কার ও একটা মাইক্রোবাস

চুরি করে তারা। মাইক্রোবাসে ছিল গালিবের ড্রাইভার, স্টাফ ও মাফিয়া লিডাররা। প্রাইভেট কারে ছিল গালিব, টোপাজ আর আসান।

উপকূলে পৌঁছে পরিত্যক্ত একটা জায়গায় চারজন গ্যাঙ লিডারের সঙ্গে মিটিঙে বসেছে গালিব, মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে টোপাজকে বসিয়ে রেখে গেছে কার-এ। চার মাফিয়া লিডারকে গুলি করে গালিব, প্রত্যেকের মাথায় একটা করে বুলেট। কারে ফিরে এসে টোপাজকে জানায়, মাফিয়া লিডাররা মোটা টাকা নিয়ে যে-যার পথে চলে গেছে।

গালিবের সঙ্গে রইল ছয়জন কর্মচারী আর জেনিফার টোপাজ, বাকি স্টাফকে টাকা-পয়সা দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেক আগেই আমেরিকাতেও একটা প্রাইভেট এয়ারলাইন্স কিনেছিল গালিব, ছদ্মনামে। ওই কোম্পানির একটা প্লেনে চড়ে উপকূল থেকে ওয়াশিংটনে চলে এসেছে তারা। এয়ারপোর্ট থেকে একা একটা সেফ হাউসে পৌঁছেছে গালিব, সেখান থেকে কথা বলেছে তার নিজস্ব দ্বীপ কায়ো ক্রুজ আইল্যান্ডের এয়ারস্ট্রিপ কন্ট্রোলারের সঙ্গে।

যাই হোক, সেফ হাউস থেকে আরও দু'এক জায়গায় ফোন করেছে গালিব। তখনই জেনেছে মাসুদ রানা আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট, আবার একই সঙ্গে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের উপদেষ্টাও। তাকে বোকা বানানো হয়েছে, বুঝতে পেরে মাথায় জিদ চেপে যায় তার: যেভাবে হোক ধরতে হবে রানাকে। ওখানে বসেই প্ল্যানটা তৈরি করে ফেলেছে। রানা কোন্ প্লেনের টিকিটি কেটেছে এটা জানতে তেমন বেগ পেতে হয়নি তাকে। তার কর্মচারীদের তিনজন এক সময় প্যান অ্যাম-এ কাজ করত। তারা গালিবকে জানিয়েছে, সবই ম্যানেজ করা যাবে। বাকিটা পানির মত সহজ। ধোঁকা দিয়ে, পরিচয় গোপন করে, কিছুটা শক্তি খাটিয়ে প্যান অ্যাম-এর কাউন্টারটা দখল করে নেওয়া

হয়েছে। অজ্ঞান করা ক্রুদের ইউনিফর্ম পরেছে সবাই। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাদের জ্ঞান ফিরে আসছে। রানাকে প্লেনে তোলা হয় স্ট্রেচারে করে। তারপর আর কী, প্লেন আকাশে উঠেছে। চলছে কিউবার দিকে।

সব কথা শোনার পর মনে মনে স্বীকার করতে হলো রানাকে, সৌবর্ণ গালিব একজন আর্টিস্ট। নিজের ক্ষেত্রে, ক্রাইমে, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতই তার মাথা খোলে।

'বিসিআই এজেন্ট, দুর্ধর্ষ মাসুদ রানা,' বলল গালিব। 'এবার আমার প্রশ্নের জবাব চাই। এই যে আমার এত বড় সর্বনাশটা করলে, আমার পেছনে কে লাগাল তোমাকে?'

'কে আবার, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স আর ব্যাংক অভ ইংল্যান্ড,' বলল রানা। 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ও ইন্টারপোলকে তুমি ফাঁকি দিতে পারলেও, আমাদের ইন্টেলিজেন্স তদন্ত করে ঠিকই বের করে ফেলেছে বাংলাদেশের দুইশো টন সোনা সহ প্লেনটা কে হাইজ্যাক করেছিল।'

'আমার প্ল্যানটার তো একটুও তারিফ করছ না,' কৃত্রিম অনুযোগের সুরে বলল গালিব। 'দুইশো টন ওয়ান থাউজেন্ড ফাইন গোল্ড কেমন গাপ করে দিলাম!'

'হাতে সময় পেয়েছ, সঙ্গে লোকবল ছিল, রাতারাতি ভুয়া এয়ারলাইন্স ও বীমা কোম্পানি দাঁড় করিয়ে ফেলতে কোনও সমস্যা হয়নি। তোমার বুদ্ধির প্রশংশা করি, তবে মুশকিল কী জানো, কেবল বুদ্ধি দিয়ে কিছু হয় না, তার সঙ্গে সততা থাকতে হয়। চোর সব সময় ধরা পড়ে যায়। ওই যে কথায় আছে না, ক্রাইম ডাজ নট পে।'

'ওই প্রবাদ আমি বোধহয় মিথ্যে প্রমাণ করেছি,' হেসে উঠল গালিব। 'কই, চুরি করা সোনা তুমি তো আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারছ না! কিংবা আমাকে কোর্টে দাঁড় করাবার ক্ষমতাও তোমার নেই।'

'শাকিলা ঝামেলা না করলে জেনেভাতেই তোমাকে আমি আটক করতে পারতাম। এই মুহূর্তে সুইস জেলে বসে ঘামতে আর দিনক্ষণ গুণতে কবে ইংল্যান্ডে পাঠানো হবে।'

'কী হতে পারত বাদ দাও,' বলল গালিব। 'কিউবার কোলে ছোট্ট ওই কায়ো ক্রুজ দ্বীপ আমার জন্যে সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারও সাহস হবে না ওখানে কেউ আমার গায়ে হাত দেয়–কারণ দ্বীপটার আসল মালিক তো কিউবা।'

'না, গালিব, এটা তোমার ভুল ধারণা,' বলল রানা। 'পৃথিবীর কোথাও তুমি নিরাপদ নও। আমি হয়তো পারলাম না, তবে অন্য কোনও এজেন্ট এসে ঠিকই একদিন তোমার ব্যবস্থা করবে।'

'আমাকে তুমি অবাকই করলে, রানা। এত তাড়াতাড়ি পরাজয় মেনে নিচ্ছ তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'আমার সব কৌতূহল এখনও কিন্তু মেটেনি।'

'আবার কী জানতে চাও?' ভুরু কোঁচকাল গালিব।

'আমার কানে এরকম একটা খবর এসেছে– তোমার সব সোনা তুমি নাকি আমেরিকা আর কানাডা থেকে সুইস ব্যাঙ্কে সরিয়ে নিয়ে গেছ। সত্যি নাকি?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে রানা।

শুনে হাসল গালিব। 'টপ সিক্রেট বিষয়। তবে তোমার মত মৃত্যুদণ্ড পাওয়া লোকের জন্যে নয়। খানিকটা ঠিকই শুনেছ। তবে আমার সোনা এখন সুইস ব্যাঙ্কেও নেই। তোমাকে যে কায়ো ক্রুজ দ্বীপটার কথা বললাম তখন, ওটার মালিক কিউবা, সেটা নব্বুই বছরের জন্য লিজ নিয়েছি আমি। দ্বীপটাকে আমার মনের মত করে সাজানো চলছে। ওখানে আমি নিজে একটা ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমার সমস্ত সোনা এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে আমার গোপন একটা আস্তানায় থাকলেও, দু'চারদিনের মধ্যে কায়ো ক্রুজে সরিয়ে নেব সব।'

সতেরো

আকাশের অনেক উপরে উঠে এসেছে প্লেনটা। বড় একটা চাঁদ ছাড়া কোথাও আর কিছু দেখার নেই। প্যাসেঞ্জার কেবিনের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকারে জেগে বসে রয়েছে রানা, কী ঘটতে চলেছে ভেবে ঘেমে গোসল হচ্ছে।

এক ঘণ্টা আগে মেয়েটি, টোপাজ, একটা ট্রেতে করে ওর ডিনার নিয়ে এসেছিল। ন্যাপকিনের ভিতর লুকানো ছিল একটা পেনসিল।

রানার সামনের সিটে, জানালার পাশে বসা হুনমিন আসান রিডিং লাইট জ্বেলে রেখেছে, তাই নিজের আলোটা আর জ্বালেনি রানা। তেমন কিছু খেল না ও, তবে দুই আউন্স হুইস্কি খেল আবার। ট্রেতে কয়েকটা চামচ, কাঁটা ও ছুরি রয়েছে, চারদিকে চোখ বুলিয়ে চুপিসারে একটা ছুরি আস্তিনের ভিতর লুকিয়ে ফেলল ও। ভাবছে পাইলটকে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিঙে বাধ্য করা যায় কিনা। যখন আর কিছুই করার থাকবে না, প্লেনে আগুন ধরাতে পারবে ও? কীভাবে?

আইডিয়াটা নিয়ে কাজ চলছে মাথার ভিতর। আগুন লাগালে নিজেকেও মরতে হবে। কিন্তু রানা যদি গায়ের জোরে এন্ট্রান্স হ্যাচ খুলে ফেলে? অবাস্তব চিন্তা, এ-ও আত্মহত্যার সামিল।

হঠাৎ একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। একটু যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে ও। হ্যাঁ, এতে কাজ হতে পারে।

ন্যাপকিনের ভিতর দিকে রানা লিখল, 'সিট বেল্ট ভাল করে বাঁধো। আর।'

ট্রে নিতে ফিরে এল টোপাজ। ট্রের উপর একবার চোখ বুলিয়েই বুঝে ফেলল সে, একটা ছুরি নেই। কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে রানা।

কোনও প্রতিক্রিয়া নেই! এটা কীসের লক্ষণ তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। হাতের ন্যাপকিনটা ফেলে দিল রানা, তারপর সেটা তুলে টোপাজের হাতে গুঁজে দিল। তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখল ওরা। তারপর ফিসফিস করে বলল টোপাজ, 'তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখব, হ্যান্ডসাম।' ঘুরে গ্যালির দিকে চলে গেল সে।

পরম স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা।

ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। কীভাবে কী করতে হবে জানে। ছুরিটা আস্তিন থেকে বের করেছে। এখন সেটা ওর কোটের ভিতর। রানার সিট-বেল্ট খোলা, সেটার শেষ প্রান্তটা মুচড়ে বাম কবজিতে জড়িয়ে নিল ও। এখন অপেক্ষার পালা। শুধু দেখতে চায় হুনমিন আসান জানালার দিকে মুখ করে নেই। আগেই লক্ষ করেছে তার সিট বেল্টও খোলা। রানার জন্য সদা প্রস্তুত।

আসান ঘুমিয়ে পড়বে, এটা খুব বেশি আশা করা হয়ে যায়। তবে অন্তত আরাম করে বসতে পারে, চোখ বুজে। জানালার চৌকো, স্বচ্ছ পারস্পেক্স-এ প্রতিফলিত হচ্ছে তার শরীরটা। প্রতিফলনের কারণ, নিজের রিডিং লাইটটা এখনও জ্বেলে রেখেছে আসান। তার খোলা চোখ সিলিঙের দিকে নিবদ্ধ। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। হাত দুটো প্রস্তুত ও শিথিল ভঙ্গিতে চেয়ারের হাতলে পড়ে আছে।

এক ঘণ্টা পার হলো। দু'ঘণ্টা। ছন্দ বজায় রেখে নাক ডাকছে রানার, যেন ক্রমশ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে ও। আসানের হাত দুটো হাতল ছেড়ে এখন কোলের উপর সরে গেল। মাথাটা এদিক ওদিক

নড়ল, তারপর আরামের খোঁজে ঘুরে গেল আলোর উৎস দেয়ালটার উল্টোদিকে। অর্থাৎ, জানালারও উল্টোদিকে!

নাক ডাকার আওয়াজটা হুবহু একই রকম রাখল রানা। কোরিয়ান লোকটার পাহারা এড়িয়ে সামনে এগোনো পা টিপে ক্ষুধার্ত একটা বাঘকে ফাঁকি দেওয়ার মতই কঠিন। প্রথমে একটু উঁচু হলো ও, তারপর পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে, ধীরে ধীরে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সামনে বাড়ল।

হাতে ছুরি নিয়ে প্রস্তুত হলো রানা। তারপর বিদ্যুৎ-গতিতে ছুরির ডগাটা পারসপেক্স-এর ঠিক মাঝখানে তাক করে যত জোরে পারা যায় আঘাত করল।

জানালার পারসপেক্স ভেঙে ফেললে ঠিক কী ঘটবে পরিষ্কার কোনও ধারণা নেই রানার। একটা ঘটনার কথা খবরের কাগজে পড়েছিল, মনে আছে সেটা। প্রেশারাইজড কেবিন থেকে কাছাকাছি প্যাসেঞ্জারকে জানালা দিয়ে বাইরে টেনে নেবে সাকশান।

পারসপেক্স ভাঙতেই হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ছুরিটা। বিকট হুঙ্কার শোনা গেল, যেন আর্তনাদ করছে বাতাস, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড টান অনুভব করল রানা। বসে পড়ল ও, ওকে বাঁচিয়ে দিল আসানের চেয়ারটা। ওটা বাধা হিসাবে থাকায় জানালার দিকে "সাক" করা যাচ্ছে না ওকে। তারপরও হ্যাঁচকা একটা টান লাগায় আসানের চেয়ারটার পিছনে বাড়ি খেল ও, সেই সঙ্গে হাত থেকে বেরিয়ে গেল সিট বেল্টের শেষ প্রান্ত। সিটের পিছন থেকে দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে রানা। আসানের শরীরটা যেন গর্জনরত কালো ফাঁকটার দিকে ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। মাথাটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় কিছু ভাঙার আওয়াজ হলো, আওয়াজ হলো কাঁধ দুটো ফ্রেমে আঘাত করায়। কাঁধ বেরিয়ে যাচ্ছে– দুই হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দেওয়ায় এক ইঞ্চি দু'ইঞ্চি করে বেরুচ্ছে। তবে হাত দুটো একটু একটু করে সেঁটে আসছে তার শরীরের সঙ্গে। লোকটা যেন টুথপেস্ট, ধীরে ধীরে এক ফুট আধ ফুট করে, কান ফাটানো

হুইসেলের মত শব্দের সঙ্গে ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে লাগল। তারপর জোরাল একটা শব্দ হলো: বুম! সেই সঙ্গে জানালা গলে বেরিয়ে গেল হুনমিন আসানের বাকি শরীর।

এরপর কেয়ামত নেমে এল। গ্যালির ওদিক থেকে ধাতব ও কাঁচের তৈজস-পত্র ভেঙে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল, সেই সঙ্গে বিরাট প্লেন নাকটা নিচু করে ডাইভ দিল জমিনের দিকে। জ্ঞান হাবারার আগে রানা শুনতে পেল খোলা জানালা দিয়ে ইঞ্জিনের গর্জন ভেসে আসছে, তার চোখকে পাশ কাটাচ্ছে তুলো ভরা কুশন, চাদর, কম্বল ও রাজ্যের জঞ্জাল। মরিয়া হয়ে সামনের সিটটাকে আলিঙ্গন করল ও। অক্সিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস করছে। ফুসফুসের তীব্র ব্যথায় জ্ঞান হারাল রানা।

হুঁশ ফিরল পাঁজরে শক্ত লাথি খেয়ে। মুখে রক্তের স্বাদ পেল। গুঙিয়ে উঠল রানা। আবার কষে লাথি মারল কেউ। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে, অনেক কষ্টে সিটগুলোর মাঝখানে হাঁটুর উপর সিধে হলো, চোখ তুলে তাকাল লালচে একটা পাতলা পরদার ভিতর দিয়ে।

প্লেনের সবগুলো আলো জ্বলছে। কেবিনের ভিতর হালকা কুয়াশা। অকস্মাৎ ডিপ্রেশারাইজেশন-এর ফলে কেবিনের বাতাস ডিউ-পয়েন্টের নীচে নেমে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসা ইঞ্জিনের গর্জন কানের পরদা ফাটিয়ে দেবে। হিম বাতাস ছুরির মত ধারাল লাগল। ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে গালিব, হলদেটে আলোয় মূর্তিমান শয়তানের মত দেখাচ্ছে তাকে। ছোট একটা অটোমেটিক রয়েছে তার স্থির হাতে।

আবার লাথি মারল গালিব। প্রচণ্ড রাগে দপ করে যেন জ্বলে উঠল রানার চোখ। দু'হাতে ধরেই মোচড়াল পা-টা, লোকটার গোড়ালি প্রায় ভেঙেই ফেলল।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল গালিব। ধপাস করে পড়ে গেল সে। লাফ

দিয়ে তার উপর পড়ল রানা। একটা হাঁটু তার ঊরুসন্ধিতে গেঁথেছে ও, বাঁ হাত দিয়ে ধরেছে একটা কবজি। এটা গালিবের পিস্তল ধরা হাতের কবজি, কষে মোচড় দিতেই ছেড়ে দিল সে পিস্তলটা।

এরপর রানা যেন উন্মাদ হয়ে গেল। ওর নীচে ডাঙায় তোলা মাছের মত লাফাতে চেষ্টা করছে গালিব। হাঁটুর গুঁতো ও ঘুসি মেরে রানা তাকে অস্থির করে তুলল। এখন গালিবের হাত রানার গলায়, রানার হাত গালিবের গলায়। ক্রমশ আরও গভীরে ডেবে যাচ্ছে রানার আঙুলগুলো। নিজের সমস্ত শক্তি কাজে লাগাচ্ছে ও, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে। শয়তানটা মারা যাওয়ার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে নাকি ও? হায়, তা হলে! গালিবের আঙুলগুলো যেন ইস্পাতের তৈরি, ওর কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলছে। চকচকে চাঁদপানা মুখটা বদলে যেতে দেখছে রানা।

চেঁচাচ্ছে গালিব। কিন্তু তাকে সাহায্য করতে আসছে না কেউ। রোদে পোড়া তামাটে রঙ গাঢ় লাল হয়ে উঠল। চোখ দুটো বড় হচ্ছে আকারে। রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু প্রাণভিক্ষা চাইল না। রানার গলায় হাতের চাপ শিথিল হলো একসময়। তারপর হাত দুটো পড়ে গেল। এবার বেরিয়ে পড়ল জিভটা। ওর নিঃসাড় বুকে বসে রয়েছে রানা, ধীরে ধীরে লাশের গলা থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে নিজের আড়ষ্ট আঙুলগুলো।

দাঁড়াল রানা। একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। চোখ বুলাল প্লেনের চারদিকে। গ্যালির পাশে নিজের সিটে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো জেনিফার টোপাজকে কাপড়ের স্তূপ বলে মনে হচ্ছে। আরও দূরে, আইল-এর মাঝামাঝি জায়গায়, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে জার্মান গার্ড, একটা হাত ও ঘাড় বিদঘুটে ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে। প্লেন ডাইভ দেওয়ার সময় সিট বেল্ট না বাঁধায় নিশ্চয়ই ছাদে ধাক্কা খেয়েছিল শরীরটা।

হাঁটু গাড়ল রানা। পিস্তলটার খোঁজে মেঝে হাতড়াচ্ছে। এটা একটা কোল্ট .২৫ অটোমেটিক। ম্যাগাজিন খুলে দেখল ভিতরে

তিন রাউন্ড গুলি আছে, আর চেম্বারে আছে এক রাউন্ড। আইল ধরে মেয়েটির দিকে এগোল রানা। তার জ্যাকেটের বোতামগুলো খোলার সময় স্তনের উষ্ণতা অনুভব করল হাতে। ওর তালুর নীচে কবুতরের ডানার মত ঝাপটা মারছে হৃৎপিণ্ড। সিট বেল্ট খুলে মেয়েটিকে সাবধানে মেঝেতে নামাল ও, তারপর উপুড় করে শুইয়ে দিল। তার উপরে উঠে বসে একই ছন্দে পাঁচ মিনিট পাম্প করল লাংস। টোপাজ গোঙাতে শুরু করতে থামল ও, তাকে ছেড়ে সোজা এগোল আইল ধরে। যাওয়ার পথে ঝুঁকল একবার, পুরোপুরি লোড করা একটা ল্যুগার টেনে নিল নিহত গার্ডের হোলস্টার থেকে।

দুই হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে ককপিটের সামনে চলে এল রানা। লিভারটা ঝট করে নামিয়ে দরজা খুলল, ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আলোয় নীলচে হয়ে আছে পাঁচটা মুখ। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে ঘুরে গেছে রানার দিকে। খোলা মুখ কালো গর্তের মত লাগছে, চোখগুলো উজ্জ্বল সাদা। এখানে ইঞ্জিনের গর্জন তত বেশি নয়। ঘাম, নার্ভাসনেস ও সিগারেটের গন্ধ ভেসে আছে বাতাসে। দোরগোড়ায় পা বাধিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে রানা, পিস্তল ধরা হাত দুটো স্থির। 'গালিব মারা গেছে। কেউ নড়লে বা নির্দেশ না মানলে তাকে আমি খুন করব। পাইলট, প্লেনের পজিশন, কোর্স, হাইট ও স্পিড জানাও।'

ঢোক গিলল পাইলট। কথা বলার আগে বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সার, কিউবার পথে রয়েছি আমরা। হাইট দশ হাজার ফুট। স্পিড প্রতি ঘণ্টায় আড়াইশো মাইল।'

'ফুয়েলের কী অবস্থা?'

'ট্যাঙ্ক ভর্তি, সার।'

'আশপাশে কী আছে? কোথাও যদি ল্যান্ড করতে চাই?'

'যুক্তরাষ্ট্রের অনেক দ্বীপ আছে এদিকে, সার,' বলল পাইলট, সহযোগিতা করতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাচ্ছে। 'সামনেই বাহামা

পড়বে। নাসাও-ও পড়বে। দুটো দ্বীপেই এয়ারপোর্ট আছে।'

'নাসাও-এ নামতে চাই,' বলল রানা।

'ইয়েস, সার!'

'রেডিও অপারেটর, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মাইকটা আমাকে দাও।'

'ইয়েস, সার!'

'পাইলট, নাসাও এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নাও।'

'ওকে, সার।'

একটু পরেই নাসাও এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলল রানা। প্রথমে নিজের পরিচয় দিল ও। তারপর বলল, 'সিআইএ-র ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে জানান এই প্লেনে ফোর্ট নক্সের ডাকাতরা আছে। আমরা ল্যান্ড করতে চাই।'

তিন মিনিট পর পাওয়া গেল ল্যান্ড করার অনুমতি।

ক্রুদের আরেকবার সাবধান করে ককপিট থেকে বেরিয়ে এল রানা। গ্যালির কাছে এসে দেখল, ফ্রিজ খুলে একটা বোতল বের করেছে টোপাজ, দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে। নিশ্চয়ই কৌতূহল হচ্ছে, গালিবকে বাদ দিয়ে তোমার দলে কেন ভিড়লাম?' জিজ্ঞেস করল সে।

কথা না বলে অপেক্ষা করছে রানা।

'ভয় হচ্ছিল বাকি সবার মত আমাকেও মেরে ফেলবে সে।'

পাশাপাশি সিটে বসে যে যার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ওরা। তিন-চার মিনিট পার হয়ে গেল। কেউ কিছু বলছে না। তারপর টোপাজ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সময়-সুযোগ পেলে জেলখানায় দেখতে যাবে আমাকে, হ্যান্ডসাম?'

'আমাকে এতটা বিবেকহীন মনে করছ কেন?' হাসল রানা। 'তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, আমি বললে বিশ্বাস করবে ওরা। প্রভাবশালী কিছু লোকজনের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার, তুমি যদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দাও, তাঁরা হয়তো

তোমার শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দেবেন। এতটাই যে, জেলখানায় তোমাকে দেখতে যাবার দরকার হবে না আমার।'

'এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে, হ্যান্ডসাম।' টোপাজ হাসছে না। 'স্বাভাবিক দুনিয়ায় তোমার মত মানুষ আরও আছে?' মাথা নাড়ল সে। 'থাক, জবাবটা শুনতে চাই না। আমি নিজে জেনে নেব।'

পরম স্বস্তি বোধ করল রানা টোপাজ মেয়েটি নিজেকে শোধরাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফিরে আসার সুযোগ অবশ্যই তাকে দেওয়া উচিত।

আর বাংলাদেশের সোনা?

কোনও সন্দেহ নাই, গালিবের সব সোনা পাবে ও ফ্যাক্টরিতে, রিকালভারে, সুবর্ণ অ্যালয় রিসার্চ ফ্যাক্টরিতে।

**

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

রাজ্জাকুল হায়দার
০১৯১-০৫১০৫৮

ছোট্ট একটা অভিযোগ। আপনি কী এমন জাদু করেছেন যে, ছোট ভাইটা গোগ্রাসে মাসুদ রানা গিলে যাচ্ছে? সকালে নাস্তার পর জল ভেবে পান করে নিচ্ছে ঢোকের পর ঢোক। দুপুরে লাঞ্চের পরও তাই। আর রাতে? ডিনারটা কোনমতে সেরেই রানার জিন নেবার মত পেগের পর পেগ গিলছে রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত। ভাবতে অবশ্য ভালই লাগে যে, আমাদের এমন পিছিয়ে পড়ার সময়ও একজন মাসুদ রানা ঠিক আগের মতই এগিয়ে যাচ্ছে। ছোট ভাইয়ের কালেকশানটাও বেশ পোক্ত। আর বইগুলোর যত্নেও কোন কমতি নেই। বই পড়ছে, বইয়ের যত্ন নিচ্ছে, মাঝে মাঝে অভিমত পাঠাচ্ছে এবং নতুন বইয়ের পিছনে তা ওর নাম-ঠিকানা ফোন নম্বরসহ ছাপাও হচ্ছে। আর তারপরই আসছে অসংখ্য তরুণীর ফোন। আমি স্তম্ভিত হই তা দেখে। ভাবি, এই 'মানি ক্যান ডু এভরিথিং'-এর যুগেও বঙ্গ ললনারা কত না আবেগ আর উচ্ছ্বাস নিয়ে একজন আত্মকর্মভোলা, বাঁধনহারা, পেনিলেস রানাকে ভালবেসে যাচ্ছে। চুপিচুপি নয়, বেশ জোরেশোরেই বলছে– 'দাঁড়াও রানা, পালিও না আই লাভ ইউ, ম্যান! এসো, হাত ধরো। চলো, হৃদয় সাগরে প্রেমের কনকতরী ভাসিয়ে ওই বুড়োভামটার সকল চক্রান্ত ছিন্ন করে মৃত্যুর হাতছানিকে দূরে ঠেলে রূপসী সোহানাকে শুধু একবার বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাই।' আর এর ফলে হাজার হাজার তরুণ ওই সকল রানা-মোহে-আচ্ছন্ন তরুণীদের ভালবাসা বঞ্চিত হয়ে রাতের অন্ধকারে নয়, দিনের আলোতেই কি সুন্দর সারিবদ্ধ ভাবে বিপথে চলে যাচ্ছে (অর্থাৎ,রানা পড়ায় মগ্ন হচ্ছে)। ব্যাপারটা কতখানি লজিকাল দাদার কাছে খুব জানতে ইচ্ছে করে

এবার আমার কথা বলি। আমি প্রথম রানা পড়ি বাবার সংগ্রহ থেকে দু'একটি চুরি করে। পরবর্তীতে বন্ধুরা ছিল ভরসা। আর এখন যোগান দেয় ছোট ভাই।

কারণ, বর্তমানে আমার ঘরের প্রায় অর্ধেকটাই বলা চলে ছোটখাট রানা লাইব্রেরী। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের যে-বিষয়টি তা হলো–এই মধ্য-বয়সেও বাবার অবসরের সঙ্গী রানা। ভেবে পাই না, কী আশ্চর্য এক দ্যুতিময় চরিত্র ওই স্পাইটা। আশীর্বাদ করি: বেঁচে থাকো চিরদিন, অম্লান।

★ আপনাদের ভালবাসা পেলে মনে হয় আরও বেশ কিছুদিন ওর বাঁচতে ইচ্ছে করবে। ধন্যবাদ।

কবির আহমেদ

চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা নেবেন। সেবার পুরোনো পাঠক হলেও কখনও আলোচনা বিভাগে চিঠি লিখিনি। আপনার অনুরোধে আজ এই চিঠিটি লিখছি সিরাজগঞ্জের তন্ময় ও মাসুদ রানার যারা নতুন পাঠক তাদের উদ্দেশে।

প্রিয় তন্ময় ও যারা মাসুদ রানার নতুন পাঠক, সবাইকে শুভেচ্ছাসহ জানাচ্ছি যে, রানা ও সোহানাকে এই পর্যন্ত ২৩টি কাহিনিতে পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ১০টিতে সোহানার উপস্থিতি আংশিক এবং বাকি ১৩টি রানা ও সোহানার একত্রে কোনও মিশন বা অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি

আংশিকগুলো হচ্ছে: নীল আতঙ্ক (দুজনের প্রথম পরিচয়), মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র, বিদায় রানা, আমিই রানা, সেই উ সেন, আই লাভ ইউ ম্যান, জিম্মি, সন্ন্যাসিনী, মেজর রাহাত এবং নকল রানা।

পূর্ণগুলো হচ্ছে: গুপ্তচক্র (১ম একত্রে মিশন), শয়তানের দূত, এখনও ষড়যন্ত্র, প্রমাণ কই, পিশাচ দ্বীপ, প্রবেশ নিষেধ, হ্যালো সোহানা, হাইজ্যাক, পালাবে কোথায়, অন্ধকারে চিতা, আমি সোহানা, সাক্ষাৎ শয়তান এবং আবার সোহানা।

একটি পরামর্শ: যদি রানা সোহানাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে চান তবে শুধু তাদের পূর্ণ কাহিনিগুলো না পড়ে উল্লিখিত ২৩টি বইয়ের সবগুলো সংগ্রহ করে কাহিনির সিরিয়াল অনুসারে পড়ুন। রানার যে কোন বইতেই রানার বইয়ের তালিকা সিরিয়াল অনুযায়ী পাবেন। তন্ময়কে ধন্যবাদ তার আগ্রহের জন্য।

পরিশেষে, কাজীদাকে একটি প্রশ্ন করে এই চিঠি শেষ করছি।

প্রশ্ন: কাজীদা, তন্ময়ের মত অন্য কারও কাছ থেকে অসংখ্য প্লিজ আশা করছেন নাকি? নইলে আপনার লেখা নতুন কোন কিশোর উপন্যাস প্রকাশ করছেন না কেন? এত প্লিজ বলতে পারব না, তবে অধম পাঠকের অনুরোধ থাকল আপনার স্নেহ যেন আমাদের প্রতি নতুন 'কিশোর উপন্যাস' হিসেবে অবিরত ঝরতে থাকে।

★ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কেবল তন্ময়ের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য নয়–সেজন্য তো বটেই, আরও একটি কারণ আছে। আপনার কাছে আমার অনাদৃত কিশোর উপন্যাসগুলো ভাল লেগেছে জেনে আমি ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছি। আমার নিজেরও ধারণা ছিল, অত খেটেপিটে যে ছয়টি কিশোর উপন্যাস লিখেছিলাম–সবগুলো না হলেও–তার বেশ কয়েকটি মান- সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের কথা কী বলব: যা ছেপেছিলাম, তার পনেরো আনাই গুদামে পড়ে থেকে গুদামরক্ষকের বিরক্তি উৎপাদন করছে; নেয়নি পাঠক। পাঠক না পড়লে লিখে কী লাভ? তাই, এখন ওগুলো ছেড়ে অনুবাদ করছি। অবশ্য সেজন্য খুব যে দমে গেছি, তাও নয়; ভাল কাহিনি পেলে ঠিকই লিখে ফেলব; সেবা চালাতে পারছে না যখন, বাংলাবাজারের অন্য কোনও প্রকাশনা সংস্থাকে দেব–যদি তাঁরা মনে করেন চালাতে পারবেন। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২২/৫/০৬ পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি (তিন গোয়েন্দা ভলিউম-৭৩)
রকিব হাসান/শামসুদ্দীন নওয়াব

২২/৫/০৬ আক্রান্ত শহর+অবরোধ (ওয়েস্টার্ন ভলিউম) শওকত হোসেন

আক্রান্ত শহর: ইয়েলো বাট-এর এলাকা কুক্ষিগত করতে চায় অ্যালটন বারউইক। তাই ক্যাপটেন পল কেড্রিককে ভাড়া করল সে। নৃশংস একদল গানম্যানের নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে। উচ্ছেদ করতে হবে ইয়েলো বাট শহরে বসবাসকারী– বারউইকের ভাষায়– একদল দুর্বৃত্তকে। কিন্তু কাজে নেমেই কেড্রিক দেখল ভুল তথ্য জানানো হয়েছে ওকে। ইয়েলো বাটবাসীরা দুর্বৃত্ত নয়। কী করবে ও?

অবরোধ: ফাঁসির আসামী ল্যাক রেগানকে গ্রেপ্তার করল ডেপুটি শেরিফ ক্লিফ ফ্যারেল। শহরবাসী খেপে উঠল তাকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। এই সময় এসে হাজির হলো আসামীর পাঁচ দাঙ্গাবাজ ভাই। ল্যাকের মুক্তির দাবি করল তারা। কিন্তু ফ্যারেল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ল্যাকের বিচারের ব্যবস্থা করবেই। পারবে ও?

আরও আসছে

২৮/৫/০৬ রহস্যপত্রিকা (২২ বর্ষ ৮ সংখ্যা) জুন, ২০০৬

মাসুদ রানা

স্মাগলার

কাজী আনোয়ার হোসেন

কাঁচা সোনার প্রেমে পাগল এক ভিলেন।
রুপের আগুন নিয়ে পাকিস্তানী দুই তরুণী-
লাস্যময়ী না হলেও রহস্যময়ী তো বটেই।
বিসিআই চিফ রাহাত খানের ঢালাও অর্ডারঃ
যেভাবেই হোক দেশের সম্পদ দেশে ফিরিয়ে
আনো।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাকাতির অভিযানে অংশ
নিচ্ছে মাসুদ রানা। তারপর মিরাকল ঘটে গেল
চোখের সামনে-
জলজ্যান্ত কোরিয়ান লোকটা টুথপেস্ট হয়ে গেল!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০